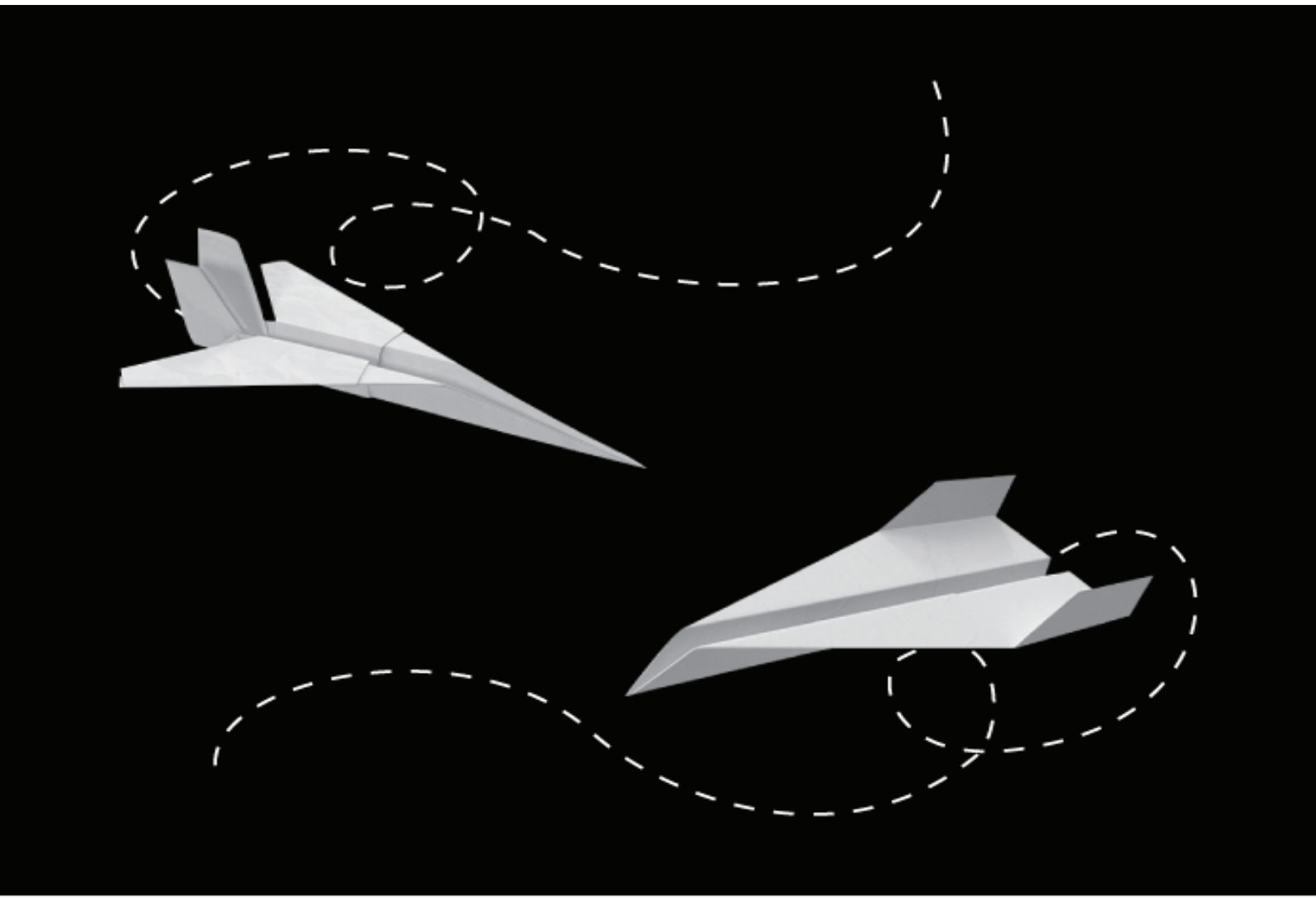

বিশ্বায়নের অন্যরূপ

কেভিড-১৯, আন্তর্জাতিক অভিবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবার

সম্পাদনা
তাসনিম সিদ্দিকী

তাসনিম সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। শ্রম অভিবাসনের কারণ ও প্রভাব, নারী অভিবাসন, ডায়াসপোরা, রেমিটেন্স, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার বিভিন্ন প্রকাশনা রয়েছে। অভিবাসন বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা পরিবর্তনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সম্প্রতি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ক্লাইমেট ইন্ডিউজ্ড ইন্টারনালি ডিসপ্লেস্ড পারসন্স ইন বাংলাদেশ'-এর খসড়া তৈরির কাজে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। 'আন্তর্জাতিক অভিবাসন নীতিমালা ২০০৬' এবং আইন কমিশনের উদ্যোগে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩'-এর খসড়া তৈরিতেও তার ভূমিকা রয়েছে। ২০০৩ সালে বাংলাদেশের নারী অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর তার পরিচালিত গবেষণা এদেশের স্বল্পদক্ষ নারী শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তার সম্প্রতি প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে 'ইমপ্যাক্ট অব মাইগ্রেশন অন পোভার্টি অ্যান্ড গ্রোথ ইন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপটেশন (২০১৯) অন্যতম।

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (আরএমএমআরইউ)

সাত্তার ভবন (৪র্থ তলা)
১৭৯, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
বিজয়নগর, ঢাকা -১০০০
বাংলাদেশ

টেলিফোন: ৮৮০-২-৫৮৩১৬৫২৪

ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৫৮৩১৩৫৬০

ই-মেইল: info@rmmru.org
ওয়েবসাইট: www.rmmru.org
ফেসবুক: www.facebook.com/RMMRU/

প্রথম প্রকাশ ২০২১

কপিরাইট © আরএমএমআরইউ ২০২১

সকল অধিকার সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার কোনো অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো আকারে বা কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রেরণ করা যাবে না। যে কেউ এই প্রকাশনার সাথে সম্পর্কিত কোনো অননুমোদিত কাজ করলে তিনি ফৌজদারি মামলা এবং ক্ষতির জন্য দেওয়ানী মামলা উভয়ের জন্যই দায়ী হতে পারেন।

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৯৯৭৭-৬

সি আর আবরার, রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (আরএমএমআরইউ), ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। আইটি সহায়তা ও প্রচ্ছদেও নকশা তৈরি করেছেন মো. পারভেজ আলম।

নিবেদিত

বিভিন্ন গন্তব্য দেশে কোভিড-১৯ এ জীবন উৎসর্গকারী

বাংলাদেশের সেই দুর্ভাগা অভিবাসী পুত্র-কন্যাদের প্রতি।

সূচিপত্র

আদ্যক্ষরসমূহ

এডিবি	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
এইডস	মানব প্রতিরক্ষা অভাবসৃষ্টিকারী ভাইরাস বা এইডস
আরামকো কোম্পানি	আরাবিয়ান আমেরিকান অয়েল কোম্পানি বা আরব-আমেরিকান তেল
বিসিএসএম	বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেশন
বিডিটি	বাংলাদেশি টাকা
বিএমইটি	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
সিআইডিআরএপি	সংক্রামক রোগ গবেষণা ও নীতি কেন্দ্র
কোভিড-১৯	করোনা ভাইরাস রোগ ১৯
জিবিভি	লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা
জিডিপি	মোট দেশীয় উৎপাদন
জিএফএমডি	ফোরাম অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার
এইচআইভি	হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস বা এইডস
এইচআরডব্লিউ	হিউম্যান রাইটস ওয়াচ
আইএফআরসি	ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ
আইএলও	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
আওএম	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন
এমডিপি	মাইগ্রেশন ডাটা পোর্টাল
এমএফএ	মাইগ্র্যান্ট ফোরাম ইন এশিয়া
এমওইডব্লিউওই	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
এমওএইচএফডব্লিউ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

এমপি	সংসদ সদস্য
এমপিআই	মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউট
এনজিও	বেসরকারি সংস্থা
এনটিএস	অপ্রচলিত নিরাপত্তা
ওইসিডি	অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা
আরএমএমআরইউ	রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট
এসএআরএস	গুরুতর তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সিন্ড্রোম বা সার্স ভাইরাস
এসডিজি	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য
এসজিবিভি	লিঙ্গভিত্তিক যৌন সহিংসতা
এসপিএসএস	সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য পরিসংখ্যান প্যাকেজ
টিবি	যক্ষ্মা
ইউএই	সংযুক্ত আরব আমিরাত
ইউএন	জাতিসংঘ
ইউএনএইডস	এইচআইভি/এইডস বিষয়ক যৌথ জাতিসংঘ কর্মসূচি
ইউএনডিপি	জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
ইউএনও	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ইউএস	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
ইউএসএ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
ডব্লিউএআরবিই	ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য রাইটস অফ বাংলাদেশি ইমিগ্র্যান্টস
ডব্লিউইডব্লিউবি	ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড
ডব্লিউইডব্লিউডি	ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ডেস্ক
ডব্লিউইডব্লিউএফ	ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড
ডব্লিউএইচও	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

অ-ইংরেজি পরিভাষা শব্দকোষ

আমফান	২০২০ সালের সুপার ঘূর্ণিঝড়
ঈদ	মুসলিম সম্প্রদায়ের উদযাপিত বড় উৎসব
ঈদ উল ফিতর উৎসব	রোজা ভাঙার উৎসব/রমজান মাসের সমাপ্তিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বারা উদযাপিত বড়
ফোরান্টাইন	কোয়ারেন্টাইনের একটি ব্যঙ্গাত্মক ও বিদ্রুপাত্মক শব্দ
হুন্ডি	একজন ব্যক্তির দ্বারা অপরব্যক্তিতে লিখিতভাবে নিঃশর্ত আদেশ যা নামযুক্ত ব্যক্তিকে
নির্দিষ্ট পরিমাণ	অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয় (ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংজ্ঞায়িত)
মেম সাহেব	পরিবারের নারী প্রধান
মহাজন	ঋণদাতা/ সুদভোগী
সদর	ছোট শহর
উপজেলা	উপ-জেলা

বিশ্বায়নের অন্যরূপ

কোভিড-১৯, আন্তর্জাতিক অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবার

সম্পাদনা: তাসনিম সিদ্দিকী

প্রস্তাবনা

আমরা ড. তাসনিম সিদ্দিকীর নেতৃত্বে 'বিশ্বায়নেরঅন্যরূপ: কোভিড-১৯, আন্তর্জাতিক অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবার' শীর্ষক প্রকাশনার প্রশংসা করতে পেরে আনন্দিত। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই আন্তর্জাতিক অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা জটিল বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে স্বীকৃত। সংকটকালীন পরিস্থিতি আগে থেকে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ২০২০ সালের মার্চ মাসে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করে। নজিরবিহীন হারে মৃত্যু ঘটিয়ে এটি হয়ে ওঠে গত এক শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য বিপর্যয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে, জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের মধ্যে অভিবাসী শ্রমিকেরাই মহামারীর অভিঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অভিবাসীদের মধ্যে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হারও সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ভার বহন করার পাশাপাশি, বিভিন্ন মহল থেকে অভিবাসীদের সংক্রমণ ছড়ানোর উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। শ্রম গ্রহণকারী অনেক দেশ স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়ার বেলায় অভিবাসীদের তাঁদের নাগরিকদের মতো করেই দেখা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল। কিছু দেশ তাঁদের ভর্তুকি প্যাকেজেও অভিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তা সত্ত্বেও, অন্য কিছু দেশ মহামারী প্রতিরোধের কৌশল থেকে অভিবাসীদের বাদ দেয়। মূলধারার শ্রম গ্রহণকারী দেশগুলি বিপুল সংখ্যক অভিবাসীকে বিতাড়ন করে তাঁদের নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। জাতিসংঘসহ বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলি গন্তব্য দেশগুলিকে এমনটা করতে বিরত রাখার চেষ্টা করলেও, তা সামান্যই ফল দিয়েছে।

বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি অব মাইগ্র্যান্টস (বিসিএসএম) সদস্যরা মনে করেছিলেন যে মহামারী চলাকালে বাংলাদেশি অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। বিসিএসএম এবং আরএমএমআরইউ-এর পক্ষ থেকে তাসনিম সিদ্দিকী এবং তার দল বিভিন্ন গন্তব্য দেশে এবং দেশে ফেরার পর, বাংলাদেশি অভিবাসী নারী-পুরুষদের সংগ্রামের বিস্তারিত চিত্র তুলে এনেছেন। তাঁরা রেমিট্যান্সের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুপস্থিতিতে অভিবাসীদের পরিবারের কঠিনরকম কষ্টের মুখে পড়ার বাস্তবতার ওপরও আলোকপাত করেন। এই গবেষণায় নিরাপত্তায়ন (securitization) প্রক্রিয়া, জাতীয় পর্যায়ে রেমিট্যান্সের বর্ধিত প্রবাহের তথ্যের অসঙ্গতি, গৃহস্থালিতে রেমিট্যান্সের আংশিক বা সম্পূর্ণ স্থগিতকরণ, নারী অভিবাসীদের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার অভিজ্ঞতা এবং অভিবাসী পরিবারের রেখে-যাওয়া নারী সদস্যদের দুর্ভোগের মতো বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করা হয়েছে।

আমরা আশা করি এই প্রকাশনাটি বাংলাদেশের আগ্রহী গবেষক এবং চর্চাকারীদের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী পাঠকদের জন্য রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে। আমরা এও কামনা করি যে, গবেষণাটি বাংলাদেশ সরকারকে আগামী সংকটের সময় অভিবাসী জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানে উপযুক্ত কৌশল প্রণয়নে সহায়তা করবে।

C R Abrar

ড. সি আর আবরার
চেয়ার, বিসিএসএম

সৈয়দ সাইফুল হক
কো-চেয়ার, বিসিএসএম

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

তাসনিম সিদ্দিকী

এই গবেষণা করোনা মহামারীর সময়ে বাংলাদেশি স্বল্পমেয়াদি চুক্তিভিত্তিক অভিবাসী নারী-পুরুষ শ্রমিক এবং তাঁদের রেখে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের ওপর দৃষ্টিপাত করেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রম-উদ্বৃত্ত দেশ এবং শ্রম বাজারে বাংলাদেশের ভূমিকা জোগানদাতা হিসেবে। প্রতি বছর ৭-৮ লাখ বাংলাদেশি বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসী হন। এর ১২ শতাংশই নারী। বাৎসরিকভাবে বাংলাদেশ প্রবাসী আয় হিসেবে ১৮ বিলিয়ন ডলার পায়। দেশের মোট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে রেমিট্যান্সের অবদানই সর্বোচ্চ। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) মধ্যে এর অংশ হলো ৬ শতাংশ। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অভিবাসী প্রেরণকারী পরিবারগুলি বিদেশে কর্মরত তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আয়ের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। গড়ে, এসব পরিবারের (খানা) মোট আয়ের আশি ভাগই আসে প্রবাসী আয় থেকে।

কোভিড-১৯ এইসব অভিবাসীদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ঝুঁকির মুখেও ফেলেছে। প্রবাসী আয়ের নিয়মিত প্রবাহ যখন থাকছে না, তখন অভিবাসী পরিবারগুলি তাঁদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ও জীবনপ্রণালীর অন্যান্য ধরনের খরচ মেটাতে দারুণ অসুবিধায়ও পড়েছে। গন্তব্যের দেশগুলির প্রবাসীরা তো আছেনই, কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কারণে হঠাৎ করে যাঁরা দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন, এই গবেষণা তাঁদের ভোগান্তির স্বরূপ উন্মোচনেও নিয়োজিত। একই সাথে, এটা ফেলে আসা রেমিট্যান্স না-পাওয়া অভিবাসী পরিবারগুলির বাস্তবতার ওপরও আলোকপাত করেছে।

বৈশ্বিক শ্রমবাজার এক হয়ে যাওয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগের দরোজা খুলে গিয়েছে। এর বৈচিত্র্য, সৃষ্টি হওয়া ভৌগোলিক সুযোগ ইত্যাদি বিষয়ে (সিজাইকা ও হাস, ২০১৮) আন্তর্জাতিক অভিবাসনের বিস্তার ভালভাবেই অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বায়ন। তাহলেও এটা মোটামুটি গৃহীত হয়েছে যে, অভিবাসনের সঙ্গে বিশ্বায়নের সম্পর্ক দারুণ জটিল। শ্রমিক গ্রহীতা দেশগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্জনে অবদান রাখার পাশাপাশি যেসব উদ্বৃত্ত শ্রমের দেশগুলি থেকে শ্রমিকেরা যাচ্ছে, সেসব দেশ

তাঁদের আন্তর্জাতিক শ্রমশক্তির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার আকারে পাঠানো প্রবাসী আয়ের কল্যাণে আরো ভাল ভাবে নিজেদের অর্থনীতি চালাতে পারছে। একইসঙ্গে, শ্রমবাজারের বিশ্বায়নের বর্তমান ধরনের মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসীরা সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ পাওয়ার চ্যালেঞ্জের মুখেও পড়ছে। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অধিকারসমূহ, সামাজিক সুরক্ষা এবং দরকষাকষির সামর্থ্য মারাত্মকভাবে কাটা পড়েছে। বিশেষ করে স্বল্প-দক্ষ শ্রমিকের বেলায় এটা ঘটছে। অনিয়মিত শ্রমিকের অবস্থা তো আরো খারাপ।

চলতি ধরনের বিশ্বায়নে, বিশেষ করে স্বল্প-দক্ষ শ্রমিকদের অধিকারের লংঘনের ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। অভিবাসী শ্রমিকেরা গ্রহীতা দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে একই পেশায় কাজ করেও অনেক কম বেতন পান (আইএলও, জুন, ২০২০)[১]। অভিবাসীদের বেশিরভাগই তাঁদের দক্ষতার মাত্রা, অভিবাসনের অবস্থা এবং নিয়োগের ধরন অনুযায়ী অনেক ধরনের সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ থেকে বাদ পড়ে যান (আইএলও, জুন, ২০২০)। শ্রমিক কী অধিকার পাবেন তা তাঁদের জেন্ডার দিয়েও নির্ধারিত হয় (আইএলও, জুন, ২০২০)[২]। তাছাড়াও, সংকটের সময় সম্মানজনক কর্মপরিবেশসহ অন্যান্য অধিকারের লংঘন বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় যায় যে, অনেকে জীবনের জন্য হুমকিজনক পরিস্থিতিতে পড়েন; অনেকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কাজ হারান। অন্য অনেকে যে অর্থ বিনিয়োগ করে অভিবাসী হয়েছিলেন, তা উঠে আসার আগেই দেশে ফিরতে বাধ্য হন। ইতিহাস দেখায়, অভিবাসীরা স্থানীয়দের চেয়ে যে কোনো সংকটের বোঝা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেশি বহন করেন। ১৯৩০ দশকের মহামন্দা, ১৯৭৩-এর তেল-সংকট, ১৯৯৭ ও ১৯৯৯ সালের এশিয় আর্থিক সংকট, এবং ২০০৯-১০ এর বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের সময় দেখা গেছে যে, সংকটের মন্দ দিক সামলাতে অভিবাসীদের নিরাপত্তা-কপাটি বা সেফটি-ভালভের মতো করে ব্যবহার করা হয়েছে (ক্যাসল ও ভেজোলি, ২০১৮)

কোভিড-১৯ এর মুখে ২০২০ এর শুরু থেকে পৃথিবী সাম্প্রতিক সময়ের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসংকট মোকাবিলা করছে। মার্চের দিকে এসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরিস্থিতিকে অতিমারী বলে ঘোষণা করে। শ্রমের অভিবাসনের নিরিখে দেখলে কোভিড-১৯ এর বিস্তার আমাদের আবারো বিশ্বায়নের অন্য চেহারা দেখাচ্ছে। বৈশ্বিক সংকটের সময়ে অভিবাসনের প্রবণতাগুলি আবারো দৃশ্যমান হচ্ছে। আগের পরিস্থিতিতে অভিবাসীরা নিজ দেশে ফিরে এসেছিল, অভিবাসনের হার বিপুল ভাবে কমে গিয়েছিল। এবারও অনেক শ্রমগ্রহীতা দেশে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গন্তব্য দেশ ছাড়ার চাপ, প্রবাসী আয় কমে আসা এবং অভিবাসীদের ওপর সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার ঘটনা দেখা দিয়েছে। আগের সংকটগুলির থেকে কোভিড-১৯ এর অনন্যতা স্বাস্থ্যের জন্য আরো বড় ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়দের চাইতে অভিবাসী জনগোষ্ঠীতে সংক্রমণের হার ছিল অনেক বেশি। সৌদি আরবে যেখানে অভিবাসীরাই জনসংখ্যার ৩৮ শতাংশ, সেখানকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ২০২০ সালের ৫ মে জানিয়েছে, নতুন করে সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়া ব্যক্তিদের ৭৬ শতাংশই বিদেশি (এমপিআই ২০২০, মাইগ্রেশন ডেটা পোর্টাল নভেম্বর ২০২০)। কোভিড-১৯ এ আক্রান্তদের চিকিৎসায় বৈষম্য না-করা দেশগুলির মধ্যে সেরা উদাহরণ তৈরি করেছে সিঙ্গাপুর। দেশটায় নতুন করে সংক্রমণের সংখ্যা নিম্নমুখী হওয়া সত্ত্বেও ডরমেটরিতে বসবাসকারীরা–যাদের সবাই অভিবাসী, তারা ছিল দেশটির মোট আক্রান্তদের ৯৪ শতাংশ।

মাইগ্রেশন ডেটা পোর্টাল নভেম্বর (২০২০) জানাচ্ছে যে, যেখানে ২০টি উন্নত দেশের মোট জনসংখ্যার সাড়ে চার শতাংশই হলো অভিবাসী, সেখানে এইসব দেশের আটটিতে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের ১০ শতাংশই

[1] ILO monitor: COVID 19 and the world of work, 4th edition
[2] ILO (2020) Protection of Migrant Workers During Covid 19 Pandemic Recommendations for Policy Makers and Constituents, ILO Policy Brief, April 2020

অভিবাসী শ্রমিক। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার বেলায়ও পরিষ্কারভাবে বৈষম্য দেখা গেছে। শ্রমগ্রহীতা দেশগুলি কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় প্রণোদনা প্যাকেজ নিয়ে এগিয়ে এলেও অভিবাসী শ্রমিকেরা এ থেকে বাদ পড়েছে। তারা তাঁদের আগের ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশেই আটকা পড়ে থেকেছে। মালয়েশিয় সরকার নিয়োগদাতাঁদের জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছে যাতে করে তারা তাঁদের শ্রমিকদের মজুরি দিতে পারে। কিন্তু যাদের অধীনে বিদেশি শ্রমিকেরা কাজ করে, এই কর্মসূচীর আওতায় সেইসব নিয়োগদাতারা নেই। স্বল্প-দক্ষ শ্রমিক, অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত অভিবাসী শ্রমিক, এবং অনিয়মিত অবস্থায় থাকা অভিবাসীরা এই ধরনের প্যাকেজের আওতার বাইরেই থেকে গেছে।

আগের সংকটের সময়ের মতোই, গন্তব্যের দেশগুলি তাঁদের কোভিড-১৯ মোকাবিলার প্রক্রিয়ায় অভিবাসীদের স্ব-স্ব দেশে ফিরে যাওয়া উৎসাহিত করার ওপর জোর দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল ও শ্রিলংকা বিভিন্ন শ্রমিক গ্রহীতা দেশ থেকে বিরাট সংখ্যায় তাঁদের শ্রমিকদের প্রত্যাবর্তন দেখেছে। ২০২০ সালের মে-র শুরুর দিকে জাপানের গণমাধ্যম নিক্কেই এশিয়া জানাচ্ছে, প্রায় নয় লক্ষ দক্ষিণ এশিয়, যাদের বেশিরভাগই অভিবাসী শ্রমিক, মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেশে ফেরার জন্য অপেক্ষা করছে (নিক্কেই এশিয়া, ২০২০)। এই সংকটের প্রতিক্রিয়ায় বাহরাইন, কুয়েত, মালদ্বীপ, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমীরাতসহ বেশ কিছু গ্রহীতা দেশ শ্রমিক প্রেরণকারী দেশগুলির ওপর তাঁদের শ্রমিকদের ফেরত নেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, ১৫ লক্ষ ভারতীয় অভিবাসী শ্রমিক এবং ৪ লক্ষ নেপালি অভিবাসী শ্রমিক মহামারীর কারণে দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছে।

বানুলেস্কু-বোগদানস প্রমুখ (২০২০) এবং আইএসডি (২০২০) দেখায়, কোভিড-১৯ বিশেষ মহলের অভিবাসী বিরোধী প্রচারণা এবং অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরো কঠোর করার পক্ষে সুযোগ করে দিয়েছে। জাতিবিদ্বেষী অবস্থানগুলি আগে থেকে চালু থাকা বৈষম্যেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অভিবাসীরা দেশে ফেরার পরও কলংকায়নের শিকার হয়েছেন, যা থেকে কখনো কখনো সংঘাত ও সহিংসতাও ঘটেছে।

অভিবাসীরা যখন সংকটে পড়েন, দেশে রেখে-আসা তাঁদের পরিবারগুলিও তখন দুর্ভোগ পোহায়। এ ধরনের রেখে-আসা পরিবারগুলির বড় অংশটাই তাঁদের দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রবাসী আয়ের ওপর নির্ভরশীল। পরিবারের সদস্যদের আয়মূলক অনেক তৎপরতাও পুঁজির জন্য রেমিট্যান্সের মুখাপেক্ষী থাকে। রেমিট্যান্স না এলে শিশুদের শিক্ষা ও প্রবীণদের চিকিৎসাসহ পরিবারের অন্যান্যদের প্রয়োজনও থমকে যায়।

অনেক অনেক গবেষণা প্রকল্প আসতে দেখা যাচ্ছে। তারা দেখাচ্ছে আগের সংকটগুলির সময়ের মতোই কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে নারী অভিবাসীরা ক্রমবর্ধমান হারে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও গার্হ্যস্থ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এমনকি সংক্রমণ ঠেকানোর বিধি-নিষেধ তাঁদের ব্যক্তিগত পরিসরকেও সংকুচিত করে ফেলছে (আইএলও, ২০২০)। তবে এসব গবেষণায় রেমিট্যান্সের অনুপস্থিতিতে দেশে রেখে-আসা পরিবারের নারী সদস্যদের দুর্ভোগের কথা খুব কমই আসে। তা হলেও, দক্ষিণ এশিয় পরিপ্রেক্ষিতে রেখে-আসা পরিবারের নারী সদস্যদের দুর্ভোগের অভিজ্ঞতামূলক বয়ানের ওপর আলোকপাতও খুব কম।

অভিবাসীদের বিষয়ে বৈশ্বিক গবেষণাকর্মে যেসব উদ্বেগের কথা উঠে আসছে, বাংলাদেশকে কেস স্টাডি হিসেবে নিয়ে এই গবেষণা সেসবের বিশদ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা নিয়েছে। এতে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে সার্বিক দুর্ভোগের

তিনটি ধাপের ওপর: কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পরপরই গ্রহীতা দেশগুলিতে শ্রমিকেরা যার সম্মুখীন হয়েছে; যারা দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছে সেইসব শ্রমিকের অবস্থা; এবং যেসব রেখে-আসা পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য বিদেশে অবস্থান করছে কিন্তু তাঁদের থেকে রেমিট্যান্স আকারে কিছুই আসছে না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: গবেষণার যুক্তিকাঠামো

গন্তব্য দেশগুলিতে বাংলাদেশি অভিবাসীদের কষ্ট এবং বিশেষ করে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ইউএই, মালদ্বীপ ইত্যাদি দেশগুলি থেকে অসংগতভাবে তাঁদের একাংশের প্রত্যাবর্তনের খবর ক্রমান্বয়ে সংবাদ মাধ্যমে এসেছে। কোভিড-১৯ এর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ২ হাজার তিন শত তিরিশ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু নথিবদ্ধ হয়েছে সৌদি আরবে (৯৫৯)। চার লক্ষ শ্রমিক দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছে। বেশিরভাগই উপসাগরীয় দেশ এবং অন্য অন্য আরব দেশ থেকে। বাংলাদেশ সরকারও বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন কোভিড-১৯ এর বিস্তারের শুরুর দিকে বিভিন্ন গন্তব্যের দেশে অভিবাসীদের জরুরি সহায়তা দেওয়া, ভাড়া করা বিমান পাঠিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনা, নিম্ন হারের সুদে ঋণ দিয়ে ফিরে আসা শ্রমিকদের পুনঃকর্মসংস্থান ইত্যাদি। তাহলেও, কোভিড-১৯ এর মুখে দেশে ও বিদেশে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের অবস্থা এবং এর অভিঘাতে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অভিজ্ঞতার প্রামাণিক বিবরণ নথিবদ্ধকারী গবেষণাকর্মের নজির কম। এই সমীক্ষা অভিবাসী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জড়ো করার প্রয়াস নিয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩: লক্ষ্য

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো, নীতি-নির্ধারদের কাছে প্রমাণসহ বিবরণ হাজির করা, যাতে করে সরকার এর ভিত্তিতে ভবিষ্যতের সংকট পরিস্থিতিতে অভিবাসীদের সুরক্ষা ও সহায়তার জন্য পদ্ধতিগত নীতি তৈরি করতে পারে। অধিকতর লক্ষ্য হলো, দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি ফোরাম যেমন গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (জিএফএমডি), গ্লোবাল কমপ্যাক্ট ফর মাইগ্রেশন (জিসিএম) ইত্যাদির মাধ্যমে নারী ও পুরুষ অভিবাসী শ্রমিকের কণ্ঠ আরো জোরদার করায় তৎপর, তাঁদের জন্য দেশ-ভিত্তিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরা। এই বিবেচনায় আমাদের লক্ষ্য হলো, ওইসব বহুপক্ষীয় ফোরাম যাতে গবেষণা দলিলের অভিজ্ঞতার নিরিখে সংকটের সময়ে অভিবাসীদের সুরক্ষার চ্যালেঞ্জ বিষয়ে বিদ্যমান মানদণ্ডলি পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে। অন্য বিশেষ লক্ষ্য হলো, সংকটকালে অভিবাসীদের বিষয়ে বৈশ্বিক গবেষণা ভাণ্ডারে অবদান রাখা।

অনুচ্ছেদ ৪: প্রধান প্রধান গবেষণা প্রশ্নাবলী

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ কীভাবে গন্তব্য দেশে তাঁদের সুষ্ঠু কর্মপরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলেছে? মোট অভিবাসী জনসংখ্যার তুলনায় কত ভাগ অভিবাসী কাজ-সম্পর্কিত সমস্যায় ভুগছেন? এমন কোনো বিশেষ ধরনের কাজ আছে যা অভিবাসীদের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়? কোন গোষ্ঠীর অভিবাসীরা কর্মচুক্তি বাতিলের শিকার হয়েছেন? কোভিড-১৯ এর সময়ে কর্মচুক্তিগুলি অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার বেলায় কতটা কার্যকর ছিল? অভিবাসীর স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া কি ভিসার ধরনের ওপর নির্ভরশীল ছিল? যেসকল অভিবাসীদের চুক্তি বাতিল কিংবা স্থগিত হয়েছে, তাঁরা কীভাবে খাদ্যের সংস্থান করেছেন? অভিবাসীরা কীভাবে তাঁদের চাপ সামলেছেন?

অভিবাসী কি তাঁর উৎস দেশে ফেরত এসেছেন? এইসব প্রত্যাবর্তন কি স্বেচ্ছায় নাকি জোরপূর্বক ছিল? কারা তাঁদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে এবং কে সেসবের খরচ জুগিয়েছে? অভিবাসীদের ফিরিয়ে আনা সুগম করতে বাংলাদেশ সরকার কী করেছে? অভিবাসীরা কি গন্তব্য দেশে নিরাপত্তামূলক বিধিনিষেধের শিকার হয়েছেন? কারা এই বিধিনিষেধ আরোপের ক্রিয়াশক্তি ছিল? বাংলাদেশে ফিরে আসবার পর অভিবাসীরা কোন ধরনের নিরাপত্তা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন? তাঁদের কি কোয়ারান্টাইন করা হয়েছিল? কেন স্থানীয় সমাজের সদস্যদের চোখে তাঁদের নিরাপত্তা হুমকি বলে মনে হয়েছিল? এই সব ফেরত পাঠানো অভিবাসীরা কীভাবে টিকে থাকছেন? তাঁরা কি সরকার বা অন্য কোনো উৎস থেকে কোনোরকমের সহায়তা পেয়েছেন?

দেশে রয়ে-যাওয়া পরিবারের সদস্যরা কোভিড-১৯ দ্বারা কীভাবে ভুগেছেন? গন্তব্য দেশে থেকে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁরা কি নিয়মিতভাবে যোগাযোগ বজায় রাখতে পেরেছিলেন? অভিবাসী আত্মীয় বিষয়ে পরিবারের সদস্যরা কোন ধরনের উদ্বেগে বেশি ভুগেছেন? তাঁরা কি তাঁদের অভিবাসী সন্তান/স্বামী/স্ত্রী'র সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখতে পেরেছেন? গন্তব্য দেশে তাঁদের অভিবাসী আত্মীয়দের কাজ ও মজুরির অবস্থা বিষয়ে কি তাঁদের কাছে তথ্য ছিল?

কোভিড-১৯ এর আগে বার্ষিক রেমিট্যান্স প্রবাহ কী ছিল? কোভিড-১৯ এর কারণে সেই প্রবাহের কতটা ক্ষতি হয়েছে? অভিবাসী সংসারগুলি প্রবাসী আয়ের ওপর কী মাত্রায় নির্ভরশীল ছিল? পারিবারিক আয়ের কত শতাংশ রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল? পরিবারের রেখে-আসা মানুষেরা রেমিট্যান্সের অনুপস্থিতিতে কীভাবে মানিয়ে নিয়েছেন? কীভাবে তাঁরা দৈনন্দিন খরচের ব্যবস্থা করেছেন? পরিবারগুলি কীভাবে তাঁদের ভবিষ্যতের খরচ জোগাবে বলে পরিকল্পনা করেছে? সহায়তা পাওয়ার কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা আছে কি? অভিবাসী পরিবারগুলি কি কোনো রকমের সামাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্কের আওতায় পড়ে?

কোভিড-১৯ কি গন্তব্য দেশে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা বাড়ানোয় ভূমিকা রেখেছে? রেখে-আসা পরিবারের নারী সদস্যদের অভিজ্ঞতাগুলি কী? তারা কি অনিচ্ছায় প্রত্যাবর্তিত অভিবাসীদের দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন? নারীদের দ্বারা পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপর সহিংসতার কোনো প্রমাণ রয়েছে কি?

অনুচ্ছেদ ৫: গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণাটি মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। প্রাথমিক তথ্যের মধ্যে রয়েছে জরিপ (বাংলাদেশের ২১ জেলার ২০০টি পরিবার), বিশদ সাক্ষাৎকার (জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তিত ২৫ জন অভিবাসী), এবং কেস স্টাডি (২০২০ সালের মে থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৫ টি জেলায় ৪২ টি জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা)। পরোক্ষসূত্রে পাওয়া তথ্যগুলি নেওয়া হয়েছে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) এবং সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্র্যান্টস (বিসিএসএম) অন কোভিড-১৯ অ্যান্ড মাইগ্রেশন, এবং ফোরাম এশিয়া, দি ইন্দিরা গান্ধি ইউনিভার্সিটি অব দিল্লি ও মাইগ্র্যান্ট ফোরাম এশিয়া কর্তৃক আয়োজিত ওয়েবিনার থেকে। বিশেষ করে নীতি-নির্ধারকগণ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বৈশ্বিক বিশেষজ্ঞদের মতামত জানায় ওয়েবিনারগুলি খুব কার্যকর ছিল।

প্রত্যাবর্তিত ২০০ অভিবাসীর পরিবারের পাশাপাশি রেখে-আসা অভিবাসী পরিবারগুলির ওপর জরিপ পরিচালনা করেছে বিসিএসএম-এর নয়টি সদস্য সংগঠন। সাক্ষাৎকার গ্রহীতাঁদের নিয়ে একটি কর্মশালা দিবসের আয়োজন করা হয়েছিল। সাক্ষাৎকারগুলি নেওয়া হয় অনলাইনে, কোবো টুল প্রোগ্রাম ব্যবহার করে। সঙ্গত কারণেই

জরিপটি দুর্দান্ত কোনো পদ্ধতিগত প্রণালী ব্যবহার করে পরিচালিত হয়নি। সেরকম কোনো জোরালো পদ্ধতিগত প্রণালী ব্যবহার করার জন্য দরকার ছিল যৌক্তিক সময় ও তহবিল। বরং গবেষণাটি অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে কর্মরত সংগঠনগুলির উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে চালানো হয়। এটা করা হয় জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তিত অভিবাসী এবং অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারগুলির জাজ্বল্যমান বাস্তবতা বোঝার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল নীতি-নির্ধারকদের বোঝানোর জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ সৃষ্টি করা। যাতে করে অভিবাসী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের স্বার্থগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা উদ্যোগ নেওয়া হয়। সুতরাং, এই গবেষণার ফল হয়তো জাতীয় পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করে না। তাছাড়া, ওপরে উল্লেখিত কিছু প্রশ্নের উত্তরও মেলেনি।

অনুচ্ছেদ ৬: ধারণাকাঠামো

গবেষণাটির ধারণাকাঠামো দুটি ধারার চিন্তার ভিত্তিতে তৈরি করা: বিশ্বায়ন ও শ্রম অভিবাসন (সিজাইকা ও হা'স, ২০১৮, ক্যাসলস অ্যান্ড মিলার, ২০০৩, ২০০৯, আরাঙ্গো ২০০০, ফাইস্ট, ২০০০, হেল্ড প্রমুখ, ১৯৯৯)। পাশাপাশি বিভিন্ন বৈশ্বিক সংকটে অভিবাসনের উৎস ও গন্তব্য দেশে যেসব সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার আলোচনা (ক্যাসলস অ্যান্ড ভেজ্জোই ২০০৯)। এই কাঠামো শুরু হয়েছে এই ভাবনা থেকে যে, বিশ্বায়ন শ্রম অভিবাসনে একইসঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বায়ন বিভিন্ন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে বিশ্বের শ্রম বাজারে প্রবেশের সুযোগ অনেক বাড়িয়েছে, সব ধরনের তথা দক্ষ ও স্বল্প-দক্ষ শ্রমিকের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। অনেক গন্তব্য দেশে শ্রম মান বাস্তবায়নের অভাবে অভিবাসীদের নিম্নতম মজুরির অধিকার, সর্বোচ্চ কর্মঘন্টা, ওভারটাইম, ছুটির দিন, ক্ষতিপূরণ ও অবসরভাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক বিচ্যুতি দেখা যায়। বড় সংখ্যক অভিবাসী শ্রমিক বদলি চুক্তি, নাজুক কর্মপরিবেশ, শোষণ, প্রতারণা, নির্যাতন, দলন ইত্যাদি অভিজ্ঞতার শিকার। নারী অভিবাসীরা এইসব অসুবিধায় তো ভোগেই, তাঁদের বাড়তি অভিজ্ঞতা হলো যৌন নির্যাতন। যে কোনো সংকটকালে এইসব বিপন্নতা আরো বেড়ে যায়। তবে কিছু সূচকের কারণে সংকটে টিকে থাকার অভিজ্ঞতা একেকজনের বেলায় একেকরকম হয়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো অভিবাসনের অবস্থা, অভিবাসীদের কাজের ধরন, কর্মদক্ষতা ও লিঙ্গ-পরিচয়। সাধারণ স্তরে অভিবাসনের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তাঁদের নিয়মিত ও অনিয়মিত হিসাবে ভাগ করা হয়। অনিয়মিত পর্যায়ের অভিবাসীদের নিয়মিত পর্যায়ের অভিবাসীদের চাইতে বেশি দুর্ভোগের সামনে পড়তে হয়। আবারো, দক্ষতার ভিত্তিতেও শ্রমিকদের উচ্চদক্ষ থেকে অদক্ষ; এরকম বিভিন্ন তালিকায় ফেলা হয়। অদক্ষ শ্রমিকেরাও প্রায়শই স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য অধিকার পাওয়ার বেলায় বঞ্চনার শিকার হন। অভিবাসীরা যেসব খাতে নিয়োজিত হন, সংকটের সময় সেসব খাতের আচরণও বদলে যায়। যারা অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত তারা সংগঠিত খাতের শ্রমিকদের চাইতে সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ কম পান। সংকটের সময়ে নারী-পুরুষ উভয়ই সমস্যার মুখে পড়লেও, লিঙ্গ-পরিচয়ের ভিত্তিতে তাঁদের হুমকির অভিজ্ঞতা ভিন্ন হয়ে থাকে।

এই গবেষণায় অভিবাসী এবং তাঁদের পরিবারের অনিশ্চয়তাকে তিনটি বিস্তৃত শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে: গন্তব্য দেশগুলিতে অভিবাসীদের অনিশ্চয়তা, দেশে ফেরার পরের অনিশ্চয়তা এবং চূড়ান্তভাবে, রেখে-আসা পরিবারের অনিশ্চয়তা। অভিবাসীদের অনিশ্চয়তার প্রশ্নে গন্তব্য দেশে তাঁদের অনিশ্চয়তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের এলাকা ছিল: সংক্রমণের ঝুঁকির মুখে উন্মুক্ত থাকা, চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া, কাজ ও আয়ের অবস্থা, সামাজিক সুরক্ষার ধরন, সুরক্ষা দৃষ্টিভঙ্গি এবং সরকারি প্রণোদনার প্রাপ্যতা।

জোরপূর্বক ভাবে ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের অবস্থার বেলায় যেসব সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি হলো: ফিরে আসার পরে তাঁদের কাজ ও আয়ের অবস্থা, স্বাস্থ্যঝুঁকি বিষয়ে তাঁদের ধারণা, সরকারি পুনর্ভুক্তিকরণ নীতি ও সিভিল সমাজ। রেখে-আসা পরিবারের সদস্যদের অবস্থার বেলায় মূল্যায়নের বিষয় হলো, আয়ের উৎস, প্রবাসী আয়ের প্রাপ্যতা, প্রবাসী আয়ের অনুপস্থিতিতে সামলে নেওয়ার প্রক্রিয়া, সরকারি প্রণোদনা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং সিভিল সমাজের ভূমিকা। এই ধারণাকাঠামো ব্যবহার করে প্রতিটি অধ্যায়ে ওপরের সূচকগুলোর একটি করে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ সাত: গ্রন্থের কাঠামো

বইটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে প্রধান প্রধান গবেষণা সমস্যার সীমারেখা দেওয়া, গবেষণার লক্ষ্য চিহ্নিত করা, ধারণাকাঠামো বিকশিত করা এবং ব্যবহৃত পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাধারণ শ্রম অভিবাসন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অভিবাসী ও তাঁদের রেখে-আসা পরিবারের সামাজিক-জনতাত্ত্বিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় হলো, কোভিড-১৯ এর সময়ে গন্তব্য দেশে বাংলাদেশি অভিবাসীদের উদ্বেগের বিষয়গুলি। পঞ্চম অধ্যায়ে ফিরে আসা শ্রমিকদের অভিজ্ঞতাকে নিরাপত্তায়নের (securitization) ধারণাকাঠামো দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কোভিড-১৯ এর সময়ে রেমিট্যান্সের প্রবাহ এবং গৃহস্থালি পর্যায়ে পাওয়া রেমিট্যান্সের সঙ্গে জাতীয়ভাবে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের পরিমাণের পার্থক্যের ব্যাখ্যার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে দেখা হয়েছে যে, রেমিট্যান্সের অনুপস্থিতিতে অথবা পরিবারের কোনো সদস্যদের জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তনের ঘটনায় কীভাবে রেখে-আসা পরিবারগুলি সামলে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কোভিড-১৯ এর কঠিন পরিস্থিতিতে অভিবাসী পরিবারগুলিতে কোন মাত্রায় জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা ঘটেছে, তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে। নবম অধ্যায়ের বিষয় হলো, প্রধান প্রধান উপসংহার এবং কিছু বিনীত সুপারিশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোভিড-১৯ চলাকালীন বাংলদেশের অভিবাসন-চিত্র

তাসনিম সিদ্দিকী, মেরিনা সুলতানা, হোসেন মোহাম্মদ ফজলে জাহিদ, নুসরাত মাহমুদ এবং মোহাম্মদ ইনজামুল হক

এই অধ্যায়ে কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বৃহত্তর অভিবাসন-চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই সময়ে দেশ থেকে নারী ও পুরুষ অভিবাসন কোন মাত্রায় হয়েছে তা যাচাই করা হয়েছে এখানে। কোভিড-১৯ এর ফল হলো অকাল প্রত্যাবর্তন। অধ্যায়টিতে সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে ফেরত আসার প্রবাহের তথ্যও দেওয়া হয়। এর পর দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এটি মহামারী কালে অভিবাসন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ওপর দৃষ্টি দেয়। এর মধ্যে রয়েছে কোভিড-১৯ এর পর্যালোচনা, অভিবাসীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও নিরাপত্তা-হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা, ফিরে আসার পর অভিবাসীদের একটি অংশকে গ্রেপ্তার করা, এ সময়ে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত সরকারী পদক্ষেপ এবং মানব চোরাচালান ও পাচারের মাত্রা।

এই অধ্যায় সাতটি ভাগে বিভক্ত। এই সংক্ষিপ্ত সূচনার পর, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক অভিবাসনের মাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে কোভিড-১৯ এর সময়ে বিভিন্ন গন্তব্য দেশে বাংলাদেশি অভিবাসীদের নিয়ে মূল মূল দুশ্চিন্তাগুলি তুলে ধরে। চতুর্থ অনুচ্ছেদ তুলে ধরেছে কীভাবে অভিবাসীদের নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। পঞ্চম অনুচ্ছেদ দেশে ও বিদেশে অভিবাসীদের দুর্দশার প্রতিকার করায় বাংলাদেশের সরকারী উদ্যোগের বিবরণ দেয়। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের পর থেকে অভিবাসীদের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দেয়। প্রধান প্রধান উপসংহার উপস্থাপন করা হয় সপ্তম অনুচ্ছেদে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ ২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক অভিবাসন

২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে মোট ২,১৭,৬৬৯ অভিবাসী শ্রমিক উপসাগরীয় ও আরব দেশগুলি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ১৮১,২১৮ জন গিয়েছেন ওই বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত। লকডাউনের কারণে, ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত অভিবাসন স্থবির হয়ে পড়েছিল। জুলাই থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত কেবল ৩৬,৪১৩ জন অভিবাসী বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য যেতে সক্ষম হয়েছিল। এই বছর, কোভিড-১৯ এর ফলে আগের বছরের তুলনায় সামগ্রিক অভিবাসন প্রবাহ প্রায় ৬৯ শতাংশ কমে যায়। যদি ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসের মতো অভিবাসন চলতো, তাহলে ওই বছরে অভিবাসনের হার ৩.৫২ শতাংশ বাড়ার সম্ভাবনা ছিল। কোভিড-১৯ এর আগেই অভিবাসনের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সত্ত্বেও প্রায় ১০,০০০০ শ্রমিক মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিদেশে যেতে পারেননি ।

২০২০ সালে মোট ২১,৯৩৪ জন নারী শ্রমিক বাংলাদেশ থেকে কাজের জন্য বিদেশে যান, বিপরীতে ২০১৯ সালে অভিবাসী হওয়া নারীদের মোট সংখ্যা ছিল ১০৪,৭৮৬ জন। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত নারী অভিবাসনও বন্ধ ছিল এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৩,১২১ নারী শ্রমিক অভিবাসী হতে পেরেছিলেন। সুতরাং বাংলাদেশ থেকে নারী অভিবাসন আগের বছরের তুলনায় ৭৯ শতাংশ কমেছে।

ফিরে আসা অভিবাসীদের সংখ্যাঃ কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে বহির্গামী অভিবাসনের বদলে মনোযোগ ছিল প্রত্যাবর্তনের দিকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে ২০২০ সালে মোট ৪০৮,০০০ অভিবাসী শ্রমিক দেশে ফিরে আসেন। ওই বছরের শেষ ৪ মাসে (সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর) চাকরি হারানো এবং বাড়ি ফেরার হার বেড়েছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুই হাজার শ্রমিক ফিরেছেন। মন্ত্রণালয় থেকে ২৭ আগস্ট, ২০২০ তারিখে জানানো হয়েছিল যে, ১ এপ্রিল থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত চাকরি হারানোসহ বিভিন্ন কারণে ২৬টি দেশ থেকে প্রায় ৮৫,৭৯০ জন অভিবাসী কর্মী ফিরে এসেছে। এর অর্থ ২০২০ সালের শেষ ৪ মাসে তার আগের ৫ মাসের তুলনায় প্রত্যাবর্তনের হার বেড়েছিল চার গুণ। আগের বছরগুলোতে গড়ে প্রায় ৫০,০০০ শ্রমিক বাংলাদেশে ফিরে এসেছিল। সুতরাং ২০২০ সালে ফিরতি অভিবাসনের হার ছিল আগের বছরের তুলনায় আট গুণ বেশি।

২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৬,০০০-এরও বেশি নারী অভিবাসী ফিরে এসেছেন। সৌদি আরব থেকে ২০২৩৮ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ১০,৪৬১ জন, কাতার থেকে ৪,৩২৮ জন, ওমান থেকে ২,৯১৬ জন, লেবানন থেকে ২,৮০৩ জন, জর্ডান থেকে ১,৮৭৬ জন এই সময়ের মধ্যে ফিরে এসেছেন। নারী অভিবাসীদের ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ প্রত্যাবর্তন ঘটে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

বাংলাদেশে আটকে-পরাঃ কোভিড-১৯ এর কারণে ছুটিতে আসা বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অভিবাসী ফিরে যেতে এবং বিভিন্ন গন্তব্য দেশে তাঁদের কাজে পুনরায় যোগ দিতে পারেনি। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের প্রথম মাসগুলিতে শুধুমাত্র সৌদি আরবেরই দেড় লাখ অভিবাসী দেশে আটকা পড়েছিল। ২০২০ সালের অক্টোবরের শুরু থেকে, আটকে-পড়া অভিবাসীরা বিদেশে ফিরে যেতে শুরু করে। ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ ২৮৪,০০০ বাংলাদেশি অভিবাসী গন্তব্য দেশে ফিরে গিয়ে চাকরিতে যোগদান করে।

গন্তব্যের দেশঃ স্পষ্টতই কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাথমিক মাসগুলিতে খুব কম জনই অভিবাসন করতে পেরেছেন। ২০২০ এর জুলাই থেকে ডিসেম্বরে বেশ নিচু মাত্রায় অভিবাসন শুরু হয়। ওপরের আলোচনায় দেখা

গেছে, ২০২০ সালে মোট ২১৭,৬৬৯ জন পুরুষ ও নারী শ্রমিক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশ থেকে অভিবাসিত হয়েছেন। যাঁরা কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ঠিক আগে এবং বছরের শেষ কয়েক মাসে চলে গিয়েছিলেন, এর মধ্যে উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। তবে এর মধ্যে তারা অন্তর্ভুক্ত নয় যারা আটকে পড়েছিল এবং পরে পরিস্থিতি ভাল হয়ে গেলে কর্মস্থলে ফিরে গেছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিক (১৬১,৭২৬ জন এবং এটা অভিবাসীদের মোট প্রবাহের প্রায় ৭৪.৩০ শতাংশ) সৌদি আরবে পাড়ি জমান। দ্বিতীয় বৃহত্তম অভিবাসন চলে ওমানে (২১,০৭১ জন, যা মোট প্রবাহের ৯.৬৮ শতাংশ)। সিঙ্গাপুর বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য তৃতীয় বৃহত্তম গন্তব্য দেশ, যেখানে ১০,০৮৫ (৪.৬৩ শতাংশ) অভিবাসী এসেছে। জর্ডান রয়েছে চতুর্থ অবস্থানে, নিয়েছে ৩,৭৬৯ জন অভিবাসী (১.৭৩ শতাংশ)। মোট ৩,০৬০ জন অভিবাসী (১.৬৫ শতাংশ) নিয়ে কাতার রয়েছে পঞ্চম স্থানে। অন্য যেকোনো বছরের মতো কোভিড-১৯ এর সময়ও সৌদি আরব ছিল নারী অভিবাসীদের প্রধান গন্তব্যস্থল। এই সময়ে প্রায় ৫৮ শতাংশ নারী (১২,৭৩৫) সৌদি আরবে গিয়েছে, ৩,৬৬১ জন নারী অভিবাসীর গন্তব্য ছিল জর্ডান আর ৩,৩৫৮ জন যান ওমানে। বছরের শেষের দিকে বেশ কিছু বাংলাদেশি উজবেকিস্তান ও আলবেনিয়ার মতো কিছু অপ্রচলিত দেশে যান।

উৎস এলাকা: ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের সবচেয়ে বড় প্রবাহ এসেছিল কুমিল্লা জেলা থেকে। তা ছিল মোট প্রবাহের ১১.১৮ শতাংশ (২৪,৩৩৮ জন)। ৬.৬৫ শতাংশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১৪,৪৭৬ জন) থেকে অভিবাসী হন। তৃতীয় বৃহত্তম অভিবাসী প্রেরণকারী জেলা চট্টগ্রাম থেকে আসে মোট প্রবাহের ৫.২৬ শতাংশ (১১,৪৬০ জন)। ৪.২৮ শতাংশ শ্রমিক চাঁদপুর (৯,৩৩৩ জন) থেকে অভিবাসিত হয়েছে।

রেমিট্যান্স: বিশ্ব ব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছিল যে ২০২০ সালে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স ১,৪০০ কোটি মার্কিন ডলারে নেমে আসতে পারে। এর অর্থ এই বছরের রেমিট্যান্স প্রবাহ গত বছরের তুলনায় ২৫ শতাংশ কম হবে। অথচ এ বছর প্রাপ্ত রেমিট্যান্স গত বছর বা তার আগের বছরের চেয়েও বেশি। বাংলাদেশি অভিবাসীরা ২০২০ সালে ২১.৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রেরণ করেছে যা ২০১৯ এর তুলনায় ১৮.৬০ শতাংশ বেশি (১৮.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক থাকায় বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় বাধার মুখে পড়েনি। ২০২০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট রিজার্ভ দাঁড়ায় ৪৩.৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা গত বছরে ছিল ৩৮.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিভিন্ন গন্তব্য দেশ থেকে বাংলাদেশে আসা রেমিট্যান্সের শতকরা ভাগের তথ্য যা পাওয়া যায় তা ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। আগের বছরগুলোর মতো, সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে। এই দেশটি থেকে বাংলাদেশ ৪.১৮৬ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে যা মোট প্রবাহের ২১.২৬ শতাংশ। এর পরে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ১৩.২২ শতাংশ (২.৬০৩ বিলিয়ন ডলার) এসেছে এই দেশ থেকে। এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত। ১০.৯১ শতাংশ (২.১৪৭ বিলিয়ন ডলার) রেমিট্যান্স সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এসেছে। ৭.০৬ শতাংশ (১.৩৮৯ বিলিয়ন ডলার) রেমিট্যান্স এসেছে মালয়েশিয়া থেকে, ৬.৯৮ শতাংশ (১.৩৭৪ বিলিয়ন ডলার) যুক্তরাজ্য থেকে এবং ৬.৪৩ শতাংশ (১.২৬৬ বিলিয়ন ডলার) ওমান থেকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, রেমিট্যান্সের সবচেয়ে বড় অংশ (২৬.২৫ শতাংশ) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে এসেছে, এরপর অগ্রণী ব্যাংক (১১.৩০ শতাংশ), ডাচ বাংলা ব্যাংক (৮.৯৯ শতাংশ), সোনালী ব্যাংক (৬.৬২ শতাংশ) এবং জনতা ব্যাংক (৪.৪২ শতাংশ)।

রেমিট্যান্স প্রবাহ ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কমে আসে, কিন্তু তারপর থেকে তা দ্রুত বাড়তে থাকে। রেমিট্যান্স বৃদ্ধির পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমত, ১ জুলাই ২০১৯ থেকে সরকার অভিবাসীদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত করতে ২ শতাংশ প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছে। অভিবাসীরা ১০০ টাকা রেমিট্যান্সের বিপরীতে বাড়তি ২ টাকা করে পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে এই উদ্দেশ্যে সরকারি বরাদ্দ ছিল ৩,০৬০ কোটি টাকা। এছাড়াও, কিছু ব্যাঙ্ক তাঁদের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণ আকৃষ্ট করতে সরকারী প্রণোদনার ওপর বাড়তি আরো ১ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

দ্বিতীয়ত, আদর্শ পরিস্থিতিতে শ্রমিক অভিবাসীদের জন্য ওয়ার্ক পারমিট বিনা মূল্যে হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে, নিয়োগকর্তারা দীর্ঘমেয়াদি কাজের ভিসা বিক্রি করেন এবং নিয়োগকারী সংস্থাগুলি উচ্চ মূল্যে সেসব কিনে নেয়। শর্মা এবং জামান (২০০৯) দেখেছেন যে, ২০০৯ সালের দিকে প্রতিটি ভিসার গড় মূল্য ছিল ২,৩০০ মার্কিন ডলার। তারপর রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো সেই ভিসাগুলো আরো বেশি দামে অভিবাসী শ্রমিকদের কাছে বিক্রি করে। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলিকে অবশ্যই এসব ভিসা নিয়মবহির্ভূত পথে কিনতে হবে; কারণ ভিসা কেনার জন্য রেমিট্যান্স পাঠানো বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়। অতএব, বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সি এবং গন্তব্যের দেশগুলিতে তাঁদের সহযোগীরা হুন্ডি ব্যবস্থার সাহায্য নেয়। বিদেশে ভিসা কেনার টাকা তারা হুন্ডি কারবারিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। অন্যদিকে হুন্ডি কারবারিরা গন্তব্য দেশে অভিবাসীদের রেমিট্যান্স সংগ্রহ করে এবং অভিবাসী পরিবারগুলিকে বাংলাদেশের স্থানীয় মুদ্রায় তা প্রদান করে। সাধারণ বছরে ৭০০,০০০ ভিসা কেনা-বেচা হয়। বিবিএস-এর সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বর্তমানে অভিবাসীরা বিদেশে অভিবাসনের জন্য প্রতিটি ভিসার জন্য প্রায় ৫০০০ মার্কিন ডলার করে দিয়েছে। প্রতিটি ভিসার জন্য রিক্রুটিং এজেন্সি এবং গন্তব্য দেশে তাঁদের মধ্যস্থতাকারীদের গড়ে প্রায় ৩,০০০ মার্কিন ডলার করে দিতে হয় এবং বাকি টাকা রিক্রুটিং এজেন্সি এবং অন্যান্য মধ্যস্থতাকারীরা ভাগ করে নেয়। ২০২০ সালে প্রায় ২১৭,৬৬৯ শ্রমিক অভিবাসী হয়েছে। অতএব, প্রায় ৪৮২,৩৩১ ভিসা কেনার প্রয়োজন হয়নি। তার মানে ভিসা কেনার জন্য প্রতি বছর যত টাকা হুন্ডির মাধ্যমে পাঠাতে হয়, ওই বছর তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ বেশিরভাগ ভিসা কেনার প্রয়োজন ছিল না। অতএব, হুন্ডি কারবারিদের ১,৪৪৬,৯৯৩,০০০ টাকার প্রয়োজন হয়নি। বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সি এবং গন্তব্য দেশে তাঁদের বাংলাদেশি সাব-এজেন্টদের ওয়ার্ক পারমিট কেনার জন্য ওই পরিমাণ টাকার দরকার হয়নি।

এ বছর ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিক বছরের তুলনায় অনেক কম ছিল। একটি নিয়মিত বছরে, কর পরিশোধ এড়ানোর জন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বড় অংশ তাঁদের আমদানিতে আন্ডার-ইনভয়েস করে থাকে। তারা যেসব দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে, সেসব দেশে তাঁদের পাওনা তারা পরিশোধ করে হুন্ডি কারবারিদের মধ্যেম্যে। ২০২০ সালে আমদানি কম হওয়ায় হুন্ডি কারবারিদের কাছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির চাহিদাও কম ছিল। বাংলাদেশে বেশিরভাগ সোনা পাচার হয়ে আসে। স্বর্ণ পাচারকারীরা তাঁদের অর্থ প্রদানের জন্য হুন্ডি কারবারিদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ২০২০ সালে সোনার গহনার চাহিদা খুব কম ছিল। তাই, স্বর্ণ ব্যবসায়দেরও হুন্ডি কারবারিদের সাহায্য নেওয়ার দরকার হয়নি। এই সকল অর্থ তাই রেমিট্যান্স পাঠানোর বৈধ উৎসগুলির কাছে সুলভ ছিল।

দেখা গেছে যে কোভিড-১৯ এর কারণে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীকে বাংলাদেশে ফিরে আসতে হয়েছিল। যারা ফিরে এসেছিল বা যাদের ফেরার সম্ভাবনা ছিল, তারা তাঁদের সঞ্চয় দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল, কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি অর্থ নিজের সঙ্গে বহন করার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অভিবাসীদের একটি অংশ, যাদের

হয়তো ফিরতে হবে না, কিন্তু নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে তারাও তাঁদের সঞ্চয় বাংলাদেশে স্থানান্তর করেছে। অভিবাসীরা কোভিড-১৯ সংকট, ঘূর্ণিঝড় আমফান এবং বর্ষার ভয়াবহ বন্যার সময় পরিবারকে সাহায্য করার জন্যও অর্থ পাঠিয়েছিল।

ওপরের আলোচনাটি আবারো এটাই তুলে ধরে যে, রেমিট্যান্সের প্রবাহ বেড়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে অভিবাসীরা উন্নতি করছে। বরং এটি হয়েছে অনেকগুলি জটিল কারণের ফলে। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে রেমিট্যান্স সবসময় ক্রমবর্ধমান থাকে। যারা এই বছর অভিবাসন করেছে, খুব কম ক্ষেত্রেই তারা পরের বছর থেকে নিয়মিত টাকা পাঠানো শুরু করে। যেহেতু এই বছর অভিবাসন প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল, তাই পরের বছরের জন্য রেমিট্যান্স প্রবাহ কম হতে পারে। তারপরও, এটা তেমন গুরুতর না-ও হতে পারে, কারণ বিদেশে বাংলাদেশি অভিবাসীদের মজুত অনেক বেশি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ কোভিড-১৯ এবং গন্তব্য দেশের অভিবাসীরা

অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিঃ মহামারীর প্রথম চার মাসে ১৮৬টি দেশে ৭০ হাজার বাংলাদেশি অভিবাসী কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। শুধুমাত্র সিঙ্গাপুরেই ২০২০-এর নভেম্বরের শেষের দিকে ২৩ হাজার বাংলাদেশি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন। ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২,৩৩০-এরও বেশি বাংলাদেশি প্রবাসকালে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। শুধু সৌদি আরবেই মারা গেছেন ৯৭৯ জন। অন্যান্য দেশের অভিবাসীদের তুলনায় বাংলাদেশি অভিবাসীদের কোভিড-মৃত্যুহার অনেক বেশি ছিল। ২০২০ সালের জুলাই মাস নাগাদ সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৩২৭ জন অভিবাসী মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে ১২২ জন বাংলাদেশি নাগরিক। কুয়েতে ৩৮২ জন অভিবাসী মারা গেছেন। এদের মধ্যে ৭০ জন বাংলাদেশি। তবে সিঙ্গাপুরে মৃত্যুর হার বেশ কম। সময়মত চিকিৎসা এবং অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে মাত্র দুজন বাংলাদেশি অভিবাসীর মৃত্যু হয় সেখানে। মালদ্বীপে পর্যটন খাতে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী রয়েছে, যাদের অধিকাংশই অনিয়মিত। সেখানে এক হাজার বাংলাদেশি অভিবাসী সংক্রমিত হলেও কেউ প্রাণ হারান নি।

স্বাস্থ্যসেবা-প্রাপ্যতাঃ যে কোনো আন্তর্জাতিক শ্রমমান বা শালীন কাজের শর্তাবলী বোঝায় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, যে কোনো সংকটের সময় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব গন্তব্য দেশগুলির ওপরই বর্তায়। সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও সিঙ্গাপুর সরকার কোভিড-১৯ পরীক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়ার বেলায় অভিবাসী শ্রমিক ও নিজস্ব নাগরিকদের জন্য সমান সুযোগের ঘোষণা দিয়েছিল। এই সুযোগ অভিবাসীদের ভিসার আইনি অবস্থা নির্বিশেষে সবার জন্য নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু সিঙ্গাপুর ছাড়া এই ধরনের পরিষেবায় অভিবাসীদের সরাসরি প্রবেশাধিকার ছিল না। আরএমএমআরইউ-এর (২০২০) গবেষণায় দেখা গেছে, যারা কোভিড-১৯ কালে জোরপূর্বক ফেরত এসেছিল, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৪৬ শতাংশকে বাংলাদেশে আসার আগে গন্তব্য দেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছিল। বাকিরা কোনোরকম পরীক্ষা ছাড়াই ফিরেছে। কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রমিত অভিবাসীদের চিকিৎসা দেওয়ার বেলায় সিঙ্গাপুরকে সেরা উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সেখানে আক্রান্ত অভিবাসীদের ক্যাম্প থেকে হোটেল বা আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে চিকিৎসা ও কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ জোরপূর্বক ফেরত-পাঠানো অভিবাসীদের নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা

নিরাপত্তায়নঃ যে কোনো দুর্যোগকালে, অভিবাসীদের মূল ও গন্তব্য দেশ উভয় স্থানেই নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা যায়। গন্তব্য দেশগুলির একটা অংশ সাধারণত অভিবাসীদের তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানোর মাধ্যমে অভিবাসনকে নিরাপত্তায়িত করে। দুর্ভাগ্যবশত, নিজ দেশে ফিরে আসার পরেও বাংলাদেশি অভিবাসীদের এই নিরাপত্তায়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী, যার মধ্যে রয়েছে গণমাধ্যম, সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সমাজসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিরা এটা করেছেন। অভিবাসীদের প্রতিবেশিদের জন্য স্বাস্থ্য-সুরক্ষা হুমকি হিসাবে দেখা ও দেখানো হয়েছিল। কোভিড-১৯ এর প্রথম দিকে, মহামারীর বিস্তার নিয়ন্ত্রণে সরকারী ঘোষণার অনিচ্ছাকৃত ফল হলো, অভিবাসীদের সংক্রমণের উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা। বাসভবনে লাল পতাকা লাগিয়ে দিয়ে তাঁদের কঠোরভাবে বিচ্ছিন্ন রাখার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছিল সরকার। এতে করে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে অভিবাসী-বিরোধী মানসিকতা তৈরি হয়ে যায়।

জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের গ্রেপ্তারঃ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তিত অভিবাসীদের গ্রেপ্তার ও আটক রাখাকে মূল দেশের নীতিনির্ধারকদের দ্বারা নিরাপত্তায়নের পদক্ষেপের অনন্য উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ২০২০ সালের ১৬ আগস্ট ভিয়েতনাম থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসা ১০৭ জন অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন সম্পন্ন করার পর তাঁদের মধ্যে ৬১ জনকে বাংলাদেশের ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারার অধীনে গ্রেফতার করা হয়। এই অভিবাসীরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি অনুসরণ করে চাকরির জন্য ভিয়েতনামে গিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ তথা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো থেকে প্রস্থানের ছাড়পত্রও তাঁরা পেয়েছিলেন। ভিয়েতনামে আসার পর এই অভিবাসীরা নিজেদের দাস-সুলভ কর্মপরিবেশে দেখতে পান। তাঁদের অনেককেই চাকরি দেওয়া হয় নি বা দিলেও দেওয়া হয়েছে কালেভদ্রে। ভিয়েতনামে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে সহায়তা পাওয়ার জন্য তাঁরা দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করেছেন। দীর্ঘদিন বেকার থাকার পর তাঁরা প্রত্যাবাসনের দাবি জানান। তাঁদের প্রত্যাবাসন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এর পরপরই তাঁদের এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যে তাঁরা 'সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে', 'জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করেছে' এবং 'দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে'। যারা ভিয়েতনাম থেকে ফিরেছিল তাঁদের সাথে উপসাগর এবং অন্যান্য আরব দেশ থেকে আসা বেশ কয়েকজন অভিবাসীকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে গ্রেপ্তারকৃত অভিবাসীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৯ জন। সুশীল সমাজের সংস্থাগুলিই নিয়মতান্ত্রিক মামলা পরিচালনার মাধ্যমে তাঁদের কারাগার থেকে বের করে এনেছে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ সরকারি উদ্যোগসমূহ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড (ডব্লিউইডব্লিউএফ) জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের জন্য ২০০ কোটি টাকার (২৩,৫২৯,৪১২ মার্কিন ডলার) বিশেষ প্রকল্প চালু করে। এর আওতায় ফেরত পাঠানো অভিবাসী বা তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অভিবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন। অভিবাসীরা সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ সুদে ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। প্রত্যাবর্তিত অভিবাসীদের তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি বিদেশে তাঁদের চাকরির অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের জন্য একটি অনলাইন

নিবন্ধন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দুস্থ অভিবাসীদের পুনর্ভুক্তি কর্মসূচিতে সহায়তার জন্য আরো ৫০০ কোটি টাকার (৫৮,৮২৩,৫২৯ মার্কিন ডলার) বাজেটও বরাদ্দ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক এমন একটি উদ্যোগ নিয়েছে যার অধীনে এটি এমন অভিবাসীদের ঋণ দেবে, যারা কোভিড-১৯ এর কারণে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। নিয়মতান্ত্রিক চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর কোনো প্রমাণ ছাড়াই ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে। ঋণের বেশি পরিমাণটা পেতে হলে ফিরে আসা অভিবাসীদের দেখাতে হবে যে তাঁরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন কিংবা বিভিন্ন ওয়েজ আর্নার্স স্কিমে বিনিয়োগ করেছেন।

ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের একটি চলমান কর্মসূচি রয়েছে, যেখানে প্রবাসে কাজ করার সময় মারা যাওয়া অভিবাসীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ৩০০,০০০ (৩,৫৩০ মার্কিন ডলার) টাকা দেওয়া হবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, এই সহায়তা কেবল তাঁদের জন্য প্রদান করা হত যারা নিয়মতান্ত্রিক চ্যানেল দিয়ে বিদেশে গেছে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের পর বোর্ড অনিয়মিত অবস্থায় মারা যাওয়া অভিবাসীদের জন্যও এই সুযোগ প্রসারিত করে।

২০২০ সালের ২৯ এপ্রিল থেকে ৩১ মে সময়ের মধ্যে দেশে ফিরে আসা প্রায় ৬,০০০ শ্রমিক প্রত্যেকে বিমানবন্দর থেকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য আশু সহায়তা হিসেবে ৫,০০০ টাকা করে পেয়েছেন। এছাড়াও, এই তহবিলের মাধ্যমে ২০৭ জন নারী শ্রমিকের দেশে ফেরার বিমান ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে। তাঁরা এসেছেন সৌদি আরবের প্রত্যাবাসন কেন্দ্র থেকে, যেমন এসেছেন লেবাননের ৯৫ জন এবং ভিয়েতনামে আটকা পড়া ১০৫ জন শ্রমিক। এই তহবিল থেকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মালদ্বীপ সরকারকে শুভেচ্ছা সহায়তা হিসাবে ৪২২,৮৭৩ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

প্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ-সেবা জোরদার করতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ফেরত আসা অভিবাসীদের পুনভুক্তির জন্য ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড (ডব্লিউইডব্লিউএফ) একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ শাখার মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য প্রায় ১১ কোটি টাকার ওষুধ, ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করেছে। এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে বোর্ডের এই তহবিল মূলত অভিবাসী শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক চাঁদা দ্বারাই গঠিত।

জুলাই ২০২০ পর্যন্ত, বিএমইটি মোট ১১,৭৩৬ জন কর্মীকে প্রস্থান-পূর্ব ব্রিফিং দিয়েছে। ২০২০ সালে মোট ২,৮৮৪ টি মৃতদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে কোভিড-১৯ এর মৃতরা নেই, যেহেতু তাঁদের মৃত্যুর পরপরই গন্তব্য দেশে কবর দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার নির্যাতন, হয়রানি, নিরাপত্তাহীনতা এবং অন্যান্য অনুরূপ সমস্যার মুখোমুখি হওয়া নারী অভিবাসী শ্রমিকদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য ৩টি দেশে সেইফ হাউস বা আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে (এর মধ্যে ৩ টি সৌদি আরবে এবং ওমান ও লেবাননে একটি করে)। এই সমস্ত কার্যক্রম ডব্লিউইডব্লিউএফ এর তহবিল থেকে চালানো হয়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ কোভিড-১৯ ও সিভিল সোসাইটি

কোভিড-১৯ সংকটের সময় বাংলাদেশি অভিবাসীদের অধিকার সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা মহামারীজনিত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে অভিবাসীদের এবং তাঁদের পরিবারগুলিকে সাহায্য করার জন্য সরকারের কাছে বাজেট বরাদ্দের জোরালো দাবি জানিয়েছিল। প্রতিটি

সংস্থা অভিবাসীদের সাহায্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে একই সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে এবং বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্র্যান্টস (বিসিএসএম) এর ছাতার নিচে তারা একসঙ্গে সক্রিয় রয়েছে।

বিসিএসএম প্রধানমন্ত্রীর কাছে দুস্থ অভিবাসী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করার আবেদন জানায়। এটি রেমিট্যান্স প্রবাহকে স্থিতিশীল রাখতে অনুদান বাড়ানো এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে মানব পাচারের সুযোগ কমাতে প্রশাসনকে সক্রিয় করার অনুরোধ করেছে। বিসিএসএম সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ফোরামে অভিবাসীদের সমস্যা জোরের সঙ্গে তুলে ধরার এবং অভিবাসীদের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করায় ইতিবাচক মানসিকতা তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। এই আবেদনের ২০ দিন পর, প্রধানমন্ত্রী ৫০০ কোটি টাকার (৫৮,৮২৩,৫৩০ মার্কিন ডলার) একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন।

বিসিএসএম কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে বাংলাদেশি অভিবাসীদের দুর্দশা তুলে ধরে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দিয়েছে। এটি বিদেশে অভিবাসীদের যথাযথ বাসস্থান নিশ্চিত করার জন্য মহাসচিবের কাছে আবেদন করেছিল, যাতে তারা সেখানে ডব্লিউএইচও নির্দেশিকা অনুযায়ী নিরাপদে বাস করতে পারে। এতে মহাসচিবকে অনুরোধ করা হয় যে, তাঁর দপ্তরের সুনাম ব্যবহার করে গন্তব্য দেশগুলোকে অভিবাসীদের নির্বিচারে ফেরত পাঠানো থেকে বিরত রাখা হয় এবং যাতে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানোর সময় তারা যাতে যথাযথভাবে মজুরি পরিশোধ করে। পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রেরণকে অপরিহার্য পরিষেবা হিসেবে ঘোষণার জন্যও দাবি জানানো হয়।

বিসিএসএম, মাইগ্রেন্ট ফোরাম এশিয়া, রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (আরএমএমআরইউ) যৌথভাবে কোভিড-১৯ এ মৃত্যুবরণকারী অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য এক মিনিটের নীরবতা পালনেরও আয়োজন করেছে। বিসিএসএম প্রত্যাবর্তনের পর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হওয়া ২১৯ জন জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তিত বাংলাদেশি অভিবাসীদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছিল।

অধ্যায় উপসংহার

এই অধ্যায়টি কোভিড-১৯ সংকটের সময় বাংলাদেশের অভিবাসন পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। এটি দেখায় যে মহামারীর কারণে তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে অভিবাসন আগের বছরের তুলনায় ৬৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। দেশটি অভিবাসীদের ব্যাপক প্রত্যাবর্তন প্রবাহ অনুভব করেছে। প্রায় ৪০০,০০০ অভিবাসী বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ফিরে এসেছে। অবশ্যই, তাঁদের অধিকাংশই এসেছে উপসাগর এবং অন্যান্য আরব দেশ থেকে। বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাসের বিপরীতে রেমিট্যান্স প্রবাহের ১৮.৬০ শতাংশ বৃদ্ধির ঘটনা থেকে আজকের দিনে অভিবাসনের জটিলতাই উন্মোচিত হয়। এই মহামারীটি আবারো প্রমাণ করেছে যে, অভিবাসী শ্রমিকেরা বিশ্বের সবচেয়ে অসুরক্ষিত কর্মশক্তি। ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ২,৩৩০ জন বাংলাদেশি অভিবাসী কোভিড-১৯ মারা গেছেন। বাংলাদেশি অভিবাসীদের মধ্যে সংক্রমণের বিস্তারও খুব বেশি হয়েছে। অধ্যায়টি আরও দেখায় যে, অভিবাসীরা কেবল গন্তব্যের বিভিন্ন দেশেই নিরপত্তায়নের শিকার হননি, নিজ মাতৃভূমিতেও তাঁদের একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, অভিবাসীরা ফিরে আসার সময় তাঁদের নিজ দেশে বেআইনিভাবে গ্রেফতারের সম্মুখীন হন।

বাংলাদেশ সরকার অভিবাসীদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। গন্তব্য দেশে তাঁদের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে এর মধ্যে ছিল ঋণ-সহায়তার মাধ্যমে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের সুযোগদান। বিসিএসএম নামক পাটাতনের আওতায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সংগঠনগুলি তৃণমূল পর্যায়ে অভিবাসীদের সহায়তা করার পাশাপাশি, তাঁদের মর্যাদা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি একশ জন জোরপূর্বক ফেরত-পাঠানো অভিবাসী এবং বর্তমান অভিবাসীদের রেখে-যাওয়া একশটি পরিবারের সদস্যদের কোভিড-১৯ এর অভিজ্ঞতার একটি বিশদ বিবরণ দেবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিলেখ এবং অভিবাসনের পথরেখা

ফরিদা ইয়াসমিন, আব্দুস সবুর, ফারিয়া ইফ্‌ফাত মিম, পারভেজ আলম ও আশরাকা সলীম

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে এই অধ্যায়ে। জরিপে সরাসরি ১০০ জন জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং গন্তব্য দেশে এখনো অবস্থানকারী আরো ১০০ জনের অবস্থা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে উভয় ধরনের অভিবাসীদের (যারা জোরপূর্বক প্রত্যাবাসিত হয়েছেন এবং যাঁরা এখনো গন্তব্য দেশে অবস্থান করছেন) সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিলেখ হাজির করা হয়েছে। তাঁদের লিঙ্গ পরিচয়, বয়স, পরিবারের আকার এবং জেলাগত উৎস পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে তাঁদের অভিবাসী হওয়ার অভিজ্ঞতার ওপরও কিছুটা আলো ফেলা হয়েছে। যে দেশগুলিতে তাঁরা অভিবাসী হয়েছেন, গন্তব্য দেশে যে পেশায় তাঁরা নিয়োজিত, কোভিড-১৯ এর আগে সাধারণত যে পরিমাণ অর্থ তাঁরা পাঠাতেন এবং কত সময় তাঁরা বিদেশে কাটিয়েছেন; সেসব সম্পর্কেও কিছু ধারণা এখান থেকে পাওয়া যায়।

লিঙ্গ পরিচয়: ছক ৩.১ নারী ও পুরুষ অভিবাসীদের সংখ্যা জানায়। জরিপের অধীন ২০০ খানা/পরিবারের মধ্যে ১০০টিতে এক বা একাধিক জোরপূর্বক ফেরত-পাঠানো ব্যক্তি রয়েছেন এবং জরিপকারী দল সরাসরি তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। আরো যে ১০০ রেখে-আসা পরিবারের কেউ না কেউ গন্তব্য দেশগুলিতে সাক্ষাৎকারের সময় অবস্থান করছিলেন, সেসব ক্ষেত্রে খানা প্রধানের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। মোট ২০০ খানার মধ্যে ১৪ শতাংশ হলো নারী-অভিবাসীর পরিবার আর বাকি ৮৬ শতাংশ হলো পুরুষ অভিবাসীর পরিবার। জোরপূর্বক প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের ৯৮ শতাংশ হলো পুরুষ, মাত্র ২ শতাংশ হলো নারী। এ থেকে বোঝা যায় যে, জোরপূর্বক প্রত্যাবাসিতরা ছিলেন মূলত পুরুষ অভিবাসী। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় গন্তব্য দেশে অবস্থানকারী ৭৪ শতাংশ অভিবাসী শ্রমিক হলেন পুরুষ আর ২৬ শতাংশ হলেন নারী।

ছক ৩.১ অভিবাসনের অবস্থা অনুযায়ী সাক্ষাৎকারকৃতদের সংখ্যার নারী-পুরুষ অনুপাত

ধরন	পুরুষ %	নারী %	মোট %
জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসী	৯৮.০০	২.০০	১০০.০০
গন্তব্য দেশে থাকা অভিবাসী	৭৪.০০	২৬.০০	১০০.০০
মোট	**৮৬ (১৭২)**	**১৪ (২৮)**	**১০০ (২০০)**

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০
দ্রষ্টব্য: বন্ধনীর সংখ্যাগুলি উত্তরদাতাঁদের মোট সংখ্যা নির্দেশ করে

অভিবাসীদের বয়স-ভিত্তিক বর্গ: ৩.২ নং টেবিল অভিবাসীদের বয়সের বর্গ দেখায়। ৮৩ শতাংশ অভিবাসীর বয়স ৪৫ এর নিচে। এটা দেখায় যে অভিবাসীরা তাঁদের জীবনের সেরা সময়টা বিভিন্ন মালিকের অধীনে বিদেশেই কাটান। তথ্যগুলি দুটি উপভাগে বিভক্ত (জোরপূর্বক প্রত্যাবাসিত এবং যাঁরা গন্তব্য দেশে অবস্থান করছিলেন)। অবাক করা ব্যাপার হলো, ৪৫ বছর বয়সীদের নিচের থেকেই বেশি জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিতদের পাওয়া গেছে (৮৯ শতাংশ), যেখানে বর্তমানে অভিবাসী পরিবারগুলির ৭৭ শতাংশই এই বয়সীদের পরিবার। জোরপূর্বক প্রত্যাবাসিতদের মাত্র ১১ শতাংশের বয়স ৪৫ এর ওপরে। বর্তমানে অভিবাসীদের ২৩ শতাংশের বয়স ৪৫ এর ওপরে। জোরপূর্বক প্রত্যাবাসিতদের গড় বয়স ৩৪ বছর আর বর্তমানে অভিবাসীদের গড় বয়স ৩৬। সুতরাং পুরুষ অভিবাসীদের গড় বয়স যেখানে ৩৬ বছর, সেখানে নারী অভিবাসীদের গড় বয়স হলো ৩২।

ছক ৩.২: জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত এবং বর্তমান অভিবাসীদের গড় বয়সের বর্গ

বয়সের বর্গ	জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসী %			বর্তমানে গন্তব্য দেশে থাকা অভিবাসী %			মোট অনুপাত %
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	
২০-২৪	৫.১০	০	৫.০০	১৭.৫৭	৭.৬৯	১৫.০০	১০.০০
২৫-২৯	২৮.৫৭	০	২৮.০০	১৬.২২	৩৮.৪৬	২২.০০	২৫.০০
৩০-৩৪	২২.৪৫	০	২২.০০	১৬.২২	১১.৫৪	১৫.০০	১৮.৫০
৩৫-৩৯	২০.৪১	১০০.০০	২২.০০	৯.৪৬	১১.৫৪	১০.০০	১৬.০০
৪০-৪৪	১২.২৪	০	১২.০০	১০.৮১	২৬.৯২	১৫.০০	১৩.৫০
৪৫-৪৯	৬.১২	০	৬.০০	১৩.৫১	৩.৮৫	১১.০০	৮.৫০
৫০-৫৫	৫.১০	০	৫.০০	১৩.৫১	০	১০.০০	৭.৫০
৫৬-৬০				২.৭০	০	২.০০	১.০০
মোট সংখ্যা	৯৮	২	১০০	৭৪	২৬	১০০	২০০

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

ছক ৩.৩: জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিতদের দেশ-ভিত্তিক গড় বয়স

দেশ	নিম্নতম মজুরি	সর্বোচ্চ মজুরি	গড় বয়স
সংযুক্ত আরব আমিরাত	২৪	৫৫	৩৬
লেবানন	৩৬	৪৮	৪২.০
মালয়েশিয়া	২০	৪৫	৩১
ওমান	২৫	৫৪	৩৪
ইরাক	২৮	২৮	২৮.০

কেএসএ	২১	৫০	৩২
কাতার	৩০	৪২	৩৬.০
কুয়েত	২৭	৫৫	৪১
বাহরাইন	৩২	৩২	৩২.০
সিঙ্গাপুর	৩৪	৩৬	৩৫.০
অন্যান্য	৩০	৫৪	৪১

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

পরিবারের আকার: এই সমীক্ষায় পরিবার বলতে বোঝানো হয়েছে খানার সদস্যদের, যাঁরা একসঙ্গে খান, এক রান্নাঘরে যাঁদের রান্না হয়। একটি খানা হয়তো একের অধিক পরিবার বা নিউক্লিয়াস পরিবার দিয়ে গঠিত এবং তাঁদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেন এমন কর্মচারি যাঁরা একই রান্নাঘরের খাবার খান। ৩.৪ নং ছক দেখায় যে জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিতদের পরিবারের গড় সদস্যসংখ্যা হলো ৫.৫ আর বর্তমানে অভিবাসী আছেন এমন ব্যক্তিদের পরিবারের গড় সদস্যসংখ্যা হলো ৫.৬। গড়ে ৬৬ শতাংশ খানার সদস্য সংখ্যা ২ থেকে ৫ এর মধ্যে। এবং অল্প কিছু খানার সদস্য সংখ্যা (মাত্র ৩.৫ শতাংশের) ১০ এর বেশি।

ছক ৩.৪ খানার আকার

পরিবারের সদস্যসংখ্যা	জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিতদের পরিবারের সদস্যসংখ্যার অনুপাত %	বর্তমান অভিবাসী পরিবারের সদস্যসংখ্যার অনুপাত %	মোট %
২-৫ সদস্য	৬৯.০০	৬৩.০০	৬৬.০০
৬-৯ সদস্য	২৭.০০	২৮.০০	২৭.৫০
১০-১২ সদস্য	২.০০	৪.০০	৩.০০
১৩+ সদস্য	২.০০	৫.০০	৩.৫০
মোট সংখ্যা	১০০	১০০	২০০
গড়পরতা পরিবারের আকার	**৫.৫০**	**৫.৬০**	**৫.৫৫**

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

খানার আয় ও প্রবাসী আয়: উভয় ধরনের খানার গড় আয় হলো ১৭,৯০০ টাকা। খানার আয়ের বিচারে জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত এবং বর্তমান অভিবাসীদের তেমন কোনো পার্থক্য করা যায় না। ৫৬ শতাংশ খানার একমাত্র আয়ের উৎস হলো রেমিট্যান্স (ছক ৩.৫)। অন্যদিকে ২৫ শতাংশ খানার আয়ের চার ভাগের তিন ভাগ আসে রেমিট্যান্স থেকে যেখানে ১৩ শতাংশ খানার আয়ের অর্ধেকের উৎস হলো রেমিট্যান্স।

ছক ৩.৫ সম্প্রতি অভিবাসী ও জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসী খানার খরচে প্রবাসী আয়ের ওপর নির্ভরশীলতা

রেমিট্যান্সের ভাগ	জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসী %			বর্তমান অভিবাসী %			মোট %
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	
সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল	০.০০	৫৪.৬০	৫৩.৫০	৮০.৮০	৫০.০০	৫৮.০০	৫৫.৭৫
খরচের তিন-চতুর্থাংশ	১০০.০০	২৬.৮০	২৮.৩০	১১.৫০	২১.৬০	১৯.০০	২৩.৬৫
খরচের অর্ধেক	০.০০	১১.৩০	১১.১০	০.০০	১৮.৯০	১৪.০০	১২.৫৫

খরচের এক-চতুর্থাংশ	০.০০	৫.২০	৫.১০	৭.৭০	৬.৮০	৭.০০	৬.০৫
খরচের এক-চতুর্থাংশের কম	০.০০	২.১০	২.০০	০.০০	২.৭০	২.০০	২.০০
মোট সংখ্যা	**২**	**৯৮**	**১০০**	**২৬**	**৭৪**	**১০০**	**২০০**

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

৩.৬ নং ছকে কোভিড-১৯ বিস্তারের আগের তিন মাসে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ দেখা যায়। কোভিড-১৯ বিস্তারের আগে সকল অভিবাসীই টাকা পাঠাতেন। গড়ে জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসীরা পাঠাতেন গড়ে ৫৪ হাজার টাকা (৬৩৫ ইউএস ডলার), আর রেখে-আসা পরিবারগুলি কোভিড-১৯ বিস্তারের ঠিক আগের তিন মাসে পেতেন ৪৫ হাজার টাকা করে (৫২৯ ইউএস ডলার)। সর্বোচ্চ গ্রহীতা হলো একটি জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসীর পরিবার, যার পরিমাণ ২ লাখ ১০ হাজার টাকা (২৪৭১ ইউএস ডলার)।

ছক ৩.৬ কোভিড-১৯ বিস্তারের আগের তিন মাসে অভিবাসী অবস্থানের শ্রমিকের পাঠানো টাকার পরিমাণ

পরিমাণ	জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসী	বর্তমান অভিবাসী	সকল বর্গ
সর্বোচ্চ	২১০,০০০	১৫০,০০০	১৮০,০০০
নিম্নতম	৫০০০	২৫,০০০	১৫,০০০
গড়	৫৪,২৮৪	৪৫,০৫০	৪৯,৬৬৭

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত খানার পরিবারগুলির কোভিড-১৯ এর আগে ও সমসময়ে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ দেখাচ্ছে ৩.৭ নং ছক। এখানে ২০১৯ সালের নভেম্বর থেকে ২০২০ সালের জানুয়ারি মেয়াদের সঙ্গে ২০২০ সালের মে থেকে জুলাই মাসে রেমিট্যান্স হিসেবে আসা অর্থের তথ্য জড়ো করে দেখানো হয়েছে। এটা দেখাচ্ছে যে, কোভিডকালে খানাগুলি এর ঠিক আগের সময়ে চাইতে ৩৮ শতাংশ টাকা পেয়েছে।

ছক ৩.৭ বর্তমানে অভিবাসী থাকা খানাগুলির প্রাপ্ত হ্রাসকৃত রেমিট্যান্স

পরিমাণ	বর্তমান অভিবাসী		হ্রাসকৃত প্রবাহ %
	কোভিডের আগে	কোভিডের পরে	
সর্বোচ্চ	১৫০,০০০	১০০,০০০	৩৩.৩৩
নিম্নতম	২৫,০০০	৩,০০০	৮৮.০০
গড়	৪৫,০৫০	২৭,৮৯৫	৩৮.০৮

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

অধ্যায় ৩: অভিবাসনের পথরেখা

জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত ও বর্তমানে অভিবাসিতদের জেলা নিবাস: জরিপে সাক্ষাৎকার নেওয়া প্রত্যাবাসিত অভিবাসীরা এসেছেন মূলত ২১ টি জেলা থেকে। তা দেখানো হয়েছে ৩.৮ নং ছকে। জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের নিবাস ছিল ঢাকা। ১৪ শতাংশ এসেছেন যশোর থেকে, টাঙ্গাইল ও চট্টগ্রাম থেকে যথাক্রমে ১০ শতাংশ করে। এর বাইরে নড়াইলের ৬ শতাংশ, ঝিনাইদহের ৫ শতাংশ, কুমিল্লা ও নরসিংদী যথাক্রমে ৪ শতাংশ

করে, নাটোর ও কিশোরগঞ্জ যথাক্রমে ৪ শতাংশ করে, ২ শতাংশ বরিশালের এবং রাজশাহী ও শরীয়তপুর ১ শতাংশ করে। অন্যান্য জেলার মধ্যে ছিল ঝালকাঠি, পিরোজপুর, চাঁদপুর, মাদারিপুর, মেহেরপুর ও ফেনীর অভিবাসীরা।

ছক ৩.৮ : অভিবাসীদের উৎস জেলাগুলি

জেলার নাম	জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসী %	বর্তমান অভিবাসী %	মোট %
ঢাকা	২৬.০০	২৫.০০	২৫.৫০
যশোর	১৪.০০	৯.০০	১১.৫০
টাঙ্গাইল	১০.০০	১৬.০০	১৩.০০
চট্টগ্রাম	১০.০০	২৩.০০	১৬.৫০
নড়াইল	৬.০০	৫.০০	৫.৫০
ঝিনাইদহ	৫.০০	৫.০০	৫.০০
কুমিল্লা	৫.০০	৬.০০	৫.৫০
নরসিংদী	৫.০০	১.০০	৩.০০
নাটোর	৪.০০	-	২.০০
কিশোরগঞ্জ	৪.০০	-	২.০০
বরিশাল	২.০০	-	১.০০
রাজশাহী	১.০০	১.০০	১.০০
শরীয়তপুর	১.০০	৪.০০	২.৫০
কক্সবাজার	-	৫.০০	২.৫০
অন্যান্য	৭.০০	-	৩.৫০
মোট নং	১০০	১০০	২০০

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

অভিবাসনের মেয়াদ: ৩.৯ নং ছকে জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত ও বর্তমানে অভিবাসীদের অভিবাসনকালের মেয়াদ দেখানো হয়েছে। এদের অর্ধেক ৫ বছর ধরে অভিবাসী শ্রমিক ছিলেন। ২২ শতাংশের অভিবাসনের অভিজ্ঞতা ছয় থেকে ১০ বছরের মধ্যে। ১৭ শতাংশের রয়েছে ১৫ বছর যাবত অভিবাসী থাকার অভিজ্ঞতা। একজন অভিবাসীকে পাওয়া গেছে যিনি ৩০ বছর ধরে বিদেশে। দুজন জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসী নারী মোটামুটি ছয় বছর যাবত বিদেশে ছিলেন। গড়ে জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত পুরুষ অভিবাসীরা বিদেশে কাটিয়েছেন ৭.৩০ বছর, যেখানে বর্তমানে অভিবাসীদের গড়ে নয় বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

ছক ৩.৯: লিঙ্গ-ভিত্তিতে অভিবাসনের মেয়াদকাল

মেয়াদকালের দৈর্ঘ্য	জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসী %			বর্তমান অভিবাসী %			মোট %
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	
এক বছরের কম	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৮৫	০	১.০	০.৫০
১-৫	৫০.০০	৪৭.৯৬	৪৮.০০	৫৭.৬৯	৪৮.৬৫	৫১.০০	৪৯.৫০
৬-১০	০.০০	৩০.৬১	৩০.০০	১১.৫৪	১৬.২২	১৫.০০	২২.৫০
১১-১৫	৫০.০০	১৭.৩৫	১৮.০০	১৯.২৩	১৬.২২	১৭.০০	১৭.৫০
১৬-১৯	০.০০	০.০০	০.০০	৭.৬৯	৯.৪৬	৯.০০	৪.৫০
২০-২৫	০.০০	৪.০৮	৪.০০	০.০০	৫.৪১	৪.০০	৪.০০

২৬-৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.৭০	২.০০	১.০০
৩১-৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৩৫	১.০০	০.৫০
মোট	০২	৯৮	১০০	২৬	৭৪	১০০	২০০
বছরের গড় সংখ্যা	৯.৫	৭.৩০	৭.৩৪	৫.৮১	৯.০৭	৮.২২	৭.৭৮

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

গন্তব্য দেশসমূহ: জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত ও চলতি অভিবাসীরা মূলত ১৭ টি দেশে কর্মরত ছিলেন। ৭২ শতাংশ গিয়েছেন উপসাগরীয় ও অন্যান্য আরব দেশে (ছক নং ৩.১০)। এর মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ গিয়েছেন সৌদি আরবে এবং অন্য চার ভাগের এক ভাগ ছিলেন উপসাগরীয় দেশগুলিতে। অবশ্য বেশিরভাগই গিয়েছেন মালয়েশিয়ায়। ইতালি ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যাবাসনের দুটি ঘটনা বাদ দিলে, সোমালিয়া, উজবেকিস্তান ও ইউক্রেইন বাংলাদেশি শ্রমিকদের নিয়মিত গন্তব্য ছিল না। খুব সম্ভব এসকল অভিবাসীরা ইওরোপে অভিবাসনের চেষ্টার পরিণতিতে ব্যর্থ হয়ে এইসব অনিয়মিত গন্তব্যে পৌঁছান।

ছক ৩.১০: অভিবাসন অবস্থা অনুযায়ী গন্তব্যের দেশগুলি

গন্তব্য দেশ	জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসী %	বর্তমান অভিবাসী %	মোট %
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৩০.০০	২৩.০০	২৬.৫০
মালয়েশিয়া	২৭.০০	১৯.০০	২৩.০০
সৌদি আরব	১৯.০০	৩৬.০০	২৭.৫০
ওমান	৮.০০	৮.০০	৮.০০
কুয়েত	৩.০০	৪.০০	৩.৫০
কাতার	২.০০	৩.০০	২.৫০
সিঙ্গাপুর	২.০০	৩.০০	২.৫০
লেবানন	২.০০	১.০০	১.৫০
ইরাক	১.০০	-	০.৫০
বাহরাইন	১.০০	২.০০	১.৫০
জর্ডান	-	১.০০	০.৫০
অন্যান্য	৫	-	২.৫০
মোট সংখ্যা	**১০০**	**১০০**	**২০০**

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

অধ্যায়ের উপসংহার

এই অধ্যায়ে মূলত উভয় ধরনের অভিবাসীদের (যারা জোরপূর্বক প্রত্যাবাসিত হয়েছেন এবং যাঁরা এখনো গন্তব্য দেশে অবস্থান করছেন) সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিলেখ এবং অভিবাসন গন্তব্যের পথরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এই সমীক্ষায় সাড়া দেওয়া ব্যক্তিদের ৮৬ শতাংশ হলেন পুরষ এবং ১৪ শতাংশ নারী। অভিবাসীরা তাঁদের জীবনের সেরা কর্মসময় তাঁদের গন্তব্যের দেশের সেবায় নিবেদন করেছেন। তাঁদের ৮৩ শতাংশের বয়স ছিল ৪৫ বছরের নিচে। এইসব অভিবাসীদের খানার সদস্য সংখ্যা ছিল গড়ে ৫.৫। কোভিড-১৯ বিস্তারের ঠিক আগে আগে তাঁদের খানার মাসিক আয় ছিল প্রায় ১৮ হাজার টাকা (২১২ ইউএস ডলার)। সাক্ষাতকার দাতারা এসেছেন বাংলাদেশের ২১টি জেলা থেকে। তবে ঢাকা ও চট্রগ্রামের প্রাধান্য ছিল বেশি। এটা চমকপ্রদ ঘটনা যে

নারী অভিবাসীরা গড়ে ছয় বছর বিদেশে কাটিয়েছেন, বিপরীতে পুরুষ অভিবাসীদের বিদেশকালীন অভিজ্ঞতা নয় বছরের। সৌদি আরব ছিল অনেকের প্রধান গন্তব্য। বর্তমান ও জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিতদের গন্তব্যের অর্ধেকটা জুড়েই ছিল সৌদি আরব ও উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি। এটাও উল্লেখ করার মতো যে, কিছু অভিবাসী যাঁরা মূলত কোভিড-১৯ বিস্তারের সময়ে ফিরেছেন তাঁরা ছিলেন অ-প্রচলিত গন্তব্যের দেশের শ্রমিক: যেমন ইউক্রেইন, উজবেকিস্তান ও সোমালিয়া। এই দেশগুলি বাংলাদেশি শ্রমিকদের নিয়মিত গন্তব্য ছিল না।

.

অধ্যায় ৪

গন্তব্য দেশে কোভিড-১৯ মোকাবিলা: স্বাস্থ্য অভিঘাত, আয়-ঝুঁকি, আটকাবস্থা, প্রত্যাবাসন এবং বেতন তছরূপ

সৈয়দা রোজানা রশীদ, হোসাইন মোহাম্মদ ফজলে জাহিদ ও রাবেয়া নাসরিন

এই অধ্যায়ে কোভিড-১৯ বিস্তারের সময়ে গন্তব্য দেশে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের দুরবস্থার অনুসন্ধান করা হয়েছে। এখানে নির্দিষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে অতিমারির পরে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের জীবন্ত অভিজ্ঞতার ওপর। প্রত্যক্ষ ও ক্ষুদ্র স্তরের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং নেওয়া হয়েছে অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই অধ্যায়ে অতিমারীর সময়ে অভিবাসীরা যে অবস্থায় পড়েছেন তা উন্মোচন করা হয়েছে। এখানে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, আগে থেকে বিদ্যমান কাঠামোগত ঘাটতি, যেমন স্বাস্থ্যসেবায় সীমিত সুযোগ, বাজে আবাসন পরিস্থিতি ও নিম্ন মজুরির সঙ্গে গন্তব্য দেশগুলির অপ্রস্তুতি এবং অভিবাসীদের তাঁদের নাগরিকের সমান করে দেখার ক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাব যুক্ত হয়ে অভিবাসীদের অতিমারী-সম্পর্কিত সমস্যা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

গবেষণার জন্য প্রধান প্রধান যেসব প্রশ্নের উত্তর এখানে খোঁজা হয়েছে সেগুলি হলো: বিভিন্ন গন্তব্য দেশে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকেরা কোভিড-১৯ দ্বারা কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন? কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার পর অভিবাসীদের কী কী ধরনের ঝুঁকি ও নাজুকতার মধ্যে পড়েছেন? কোভিড-১৯ সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও মানসিক ধাক্কা তাঁরা কীভাবে সামাল দিয়েছেন? কোভিড-১৯ এর সময়ে বাংলাদেশি অভিবাসীরা কি আটক ও গ্রেফতারের মুখোমুখি হয়েছেন? গন্তব্য দেশগুলি কি বাংলাদেশি অভিবাসীদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিল? যদি তা হয়, তাহলে গন্তব্য দেশগুলি কীভাবে তাঁদের প্রত্যাবর্তনে সহায়তা করেছিল? নারী ও পুরুষ উভয় ধরনের অভিবাসীদের ফিরে আসার সময়ের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? জোরপূর্বক প্রত্যাবাসনের সময় নিয়োগদাতারা কি তাঁদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেছিল?

জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত ১০০ জন অভিবাসী এবং বর্তমানে অভিবাসী থাকা ১০০ জনের প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে এই অধ্যায়ে অভিবাসীদের স্বাস্থ্য, আয় ও কাজের ঝুঁকির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে পাওয়া তথ্য জড়ো

করা হয়েছে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ভাবে পাওয়া লেখালেখি থেকে। তাছাড়া ছিল সাংবাদপত্রের বাছাই করা খবর এবং ২০২০ সালের মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারের আলোচনা।

এই অধ্যায়ে রয়েছে আটটি অনুচ্ছেদ। প্রথম অনুচ্ছেদে পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে অভিবাসীরা যেসব চালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন সেগুলো ব্যাখ্যার ধারণাগত যৌক্তিকতা। তৃতীয় অনুচ্ছেদে রয়েছে বাংলাদেশি অভিবাসীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও অভিঘাত বিষয়ে আলোকপাত। চতুর্থ অনুচ্ছেদে কোভিড-১৯ এর সময়ে অভিবাসীদের আয় ও কর্মসংস্থানের বিষয়টি অনুসন্ধান করা হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে আটককরণ ও বিতাড়নের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে। অভিবাসীরা তাঁদের ছেড়ে আসা গন্তব্য দেশে মজুরি ও অন্যান্য যেসব বকেয়া রেখে এসেছেন, তার পর্যালোচনা করা হয়েছে সপ্তম অনুচ্ছেদে। উপসংহারে এসে মূল সিদ্ধান্তগুলির সারাংশ তুলে ধরে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২: ধারণাগত বোঝাপড়া

বেশ কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, জনস্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থায় দেশের নাগরিকদের তুলনায় অভিবাসীরা বেশি দুর্ভোগে পড়েন। উইক্রামাগে ও আগামপোদি (২০১৩) দেখান, কীভাবে ২০০৫ এর এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণের সময়ে হাঁস-মুরগী ও পশু খামারে কর্মরত এশিয় অভিবাসীদের ওপর তীব্র অভিঘাত ফেলেছিল। পশ্চিম আফ্রিকার মৌসুমী অভিবাসীদের একইসঙ্গে ইবোলা ভাইরাসের (সিরডাপ, ২০১৪) জন্য দায়ি ও শিকার হিসেবে ভাবা হয়েছিল। অভিবাসীদের ওপরে কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রভাব নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বেশ কিছু গবেষণা কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে (বিচ, ২০২০; গুয়াদাগনো, ২০২০, আইএলও ২০২০এ)। কোভিড-১৯ অতিমারীর মধ্যে আন্তর্জাতিক অভিবাসীরা যে বিভিন্ন রকমের বিপন্নতার মুখে পড়েছে, এসব গবেষণায় সেসবের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও মানসিক অভিঘাত: প্রায় সব সাম্প্রতিক গবেষণার উপসংহার হলো এই যে, স্থানীয় নাগরিকদের অর্থনৈতিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন, কোভিড-১৯ গন্তব্য দেশের নাগরিকদের তুলনায় অভিবাসীদের মধ্যেই বেশি ছড়িয়েছে। যে ২০টি দেশে সবচেয়ে বেশি কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঘটনা দেখা গেছে, সেসব দেশের অভিবাসীরা পৃথিবীর মোট অভিবাসীদের প্রায় ৩২ শতাংশের মতো (এমডিপি, ২০২০)। সৌদি আরব ও সিঙ্গাপুরের সরকারি তথ্য দেখায়, কোভিড-১৯ পরীক্ষায় স্থানীয়দের চাইতে অভিবাসীদের মধ্যে সংক্রমণের হার বেশি ছিল। কাতারে, প্রতি চার জনের একজনের পরীক্ষায় পজেটিভ এসেছে, আর এদের বেশিরভাগই ছিল অভিবাসী। ২০২০-এর মে মাস পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে কর্মরত দেড় লক্ষ বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকের মধ্যে পরীক্ষায় পজিটিভ পাওয়া গিয়েছিল ২৫ হাজার জনের। অথচ ওই সময় পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে জাতীয়ভাবে মোট কোভিড-১৯ এ সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ৯৬৯ জন।

অধিকাংশ গন্তব্য দেশের নাগরিকেরা যেসব স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা পান, অভিবাসীরা তা পান না। অতএব, তাঁরা আপনাআপনিই কোভিড-১৯ এর চিকিৎসা পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হন (ভিয়েণ্ডে ও প্রমুখ ২০২০)। গুদাগনো (২০২০) অনুসন্ধানে দেখেন যে, এমনকি যখন অভিবাসীরা সংশ্লিষ্ট সেবা পাওয়ার অধিকারীও থাকেন তখনো ভাষাগত সমস্যা এবং গ্রহীতা দেশের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকা, অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের পন্থায় বেশি আস্থাশীল কিংবা নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে অনেক অভিবাসী সেসব সেবা নিতে পারেননি। বাউওমি (২০২০) এটাও দেখেন যে, ভুয়া সংবাদ ছড়িয়ে পড়া, ভুল তথ্য প্রচার এবং

রাজনৈতিকীকরণের কারণেও অভিবাসীদের জন্য সেবা-প্রাপ্যতা আরো কঠিন হয়ে পড়ে।

সিদ্দিকী (২০২০) দেখান, কেবল মাত্র কাজের ধরনের কারণে কী মাত্রায় অভিবাসীরা কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের ঝুঁকির মুখে পড়েন। কৃষি, নির্মাণ খাত, মেশিন চালানো ও পরিবহন, ব্যক্তিগত সেবা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিচ্ছন্নতা কাজে জড়িত অভিবাসীরা অন্যদের চাইতে বেশি মাত্রায় কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়েন। ঘরে থেকে কাজ করার সুযোগের অভাব, ব্যক্তিগত পরিবহনের সীমিত সুযোগ, সহকর্মী ও গ্রাহকদের সঙ্গে মেশামেশি এবং সুরক্ষা সরঞ্জাম ও পরিচ্ছন্নতার উপায়ের অভাবেও এইসব পেশার অভিবাসীদের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায় (গেলাট, ২০২০)। জরুরি সেবা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এইসকল অভিবাসীদের প্রশংসা করা হলেও যা হওয়া উচিত ছিল সেভাবে এটা তাঁদের বিপদ কমাতে পারেনি। কোভিডজনিত সংকট যেসব খাতকে বেশি আক্রান্ত করেছে, সেসব খাতেই অভিবাসীদের সংখ্যা অনেক বেশি। এ ব্যাপারে খাদ্য সরবরাহ ও গৃহকর্মে নিয়োজিতরা হলেন ভাল উদাহরণ। নেতিবাচক স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও মোকাবিলার ব্যর্থতার পরিণতিতে নিয়মিতদের চাইতে অনিয়মিত বা অবৈধভাবে অবস্থানরত শ্রমিকেরা বেশি আক্রান্ত হয়েছেন (আইএলও, ২০১৬, ২০২০এ)। স্বাস্থ্যসেবা চাওয়ার বেলায় তাঁদের ভয় ছিল যে, অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে খবর চলে যাবে এবং তাঁদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এ কারণেও কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ কমে যায় (জর্ডান, ২০২০)।

বসবাসের ব্যবস্থা: কোভিড-১৯ বিস্তার রোধের জন্য সবকিছু বন্ধ করা, কোয়ারান্টাইন, চলাচলে বিধিনিষেধ আসে। দেশে-বিদেশে অভিবাসীদের চিহ্নিত করা ও আটকে রাখা হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ ঘটনা (পূর্বোক্ত)। সংক্রমণের ঝুঁকি সামলাতে যেসব লকডাউন ও স্থানান্তর করা হয় তার কারণে যাতায়াত, খাবার ও মৌলিক সেবাগুলি পাওয়া এবং রোজগার করা কঠিন হয়ে যায় (প্যাটিসন, ২০২০)। দি বিজনেস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস রিসোর্স সেন্টার (বিএইচআরসি) জানায়, মালয়েশিয়ায় কর্মরত অভিবাসীদের জন্য কোভিড-১৯ এর চেয়ে বেশি বিপদ বয়ে আনে খাদ্যাভাব। বিএইচআরসি আরো জানায়, গাদাগাদি করে থাকার পরিবেশ এবং পানি ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রীর অভাবে ভোগা অভিবাসীরা সামাজিক দূরত্ব ও অন্যান্য মৌলিক স্বাস্থ্যবিধির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে এমনকি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিয়মানুগভাবে পরীক্ষা ও সংক্রমণ অনুসন্ধানের অভাবে অভিবাসী-প্রধান এলাকায় সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকিও অনেক বেড়ে যায়। আইওএম (২০২০) দেখেছে যে, অভিবাসীরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন বোধ করেছে এবং চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ও সীমান্ত বন্ধ থাকায় ভবিষ্যতের করণীয় বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ হয়েছে।

আয় ও কাজ: কোভিড-১৯ তুলনামূলকভাবে অরক্ষিত শ্রমিকদের কাজে ব্যাঘাত ও কর্মহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এসবের অভিঘাতে একের পর এক বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যেমন, হঠাৎ করে আয় হারানো, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও পণ্য ভোগ কমে আসা, এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি (আইএলও, ২০২০; ক্রফোর্ড প্রমুখ ২০২০; খানও হ্যারোফ-ট্রাভেল, ২০১১) কোভিড-১৯ এর কারণে অভিবাসীরা অনেকগুলি খাতে কাজ হারিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে বিমান পরিবহন, পর্যটন, পরিবহন, মনোহারি দোকান, সেবা, বিনোদন এবং রাস্তার ফেরি করা দোকান (সরকার, ২০২০)। আইনী অবস্থা যা-ই হোক না কেন, অভিবাসীদের একটা অংশকে তাঁদের কোম্পানি ছাঁটাই করে দেয়।

নারী অভিবাসী কর্মীরা নিম্নপদস্থ চাকরিতে নিযুক্ত হন। এসব কাজকে সাধারণত সাংস্কৃতিকভাবে নিচু চোখে দেখা হয় এবং এসবের সামাজিক-আইনি স্বীকৃতি (পিপার, ২০১১) অতি নগণ্য। শোষণমূলক কাজের বাস্তবতা তাঁদের স্বাস্থ্য এবং ভাল-থাকাকে প্রভাবিত করে। ইউএন উইমেন (২০০০ এ) জোর দিয়ে বলে যে, সাধারণত নারী অভিবাসীরা চাকরি খোয়ানো এবং অর্থনৈতিক মন্দা থেকে কম সুরক্ষিত। কর্মক্ষেত্রে সহিংসতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা তাঁদেরই বেশি (হেনেব্রি এবং পেট্রোজিলো, ২০১৯; আউন, ২০২০)। এবং তারা অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকেন (অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ২০২০)। আইএলও (২০১৬) জানায়, গার্হস্থ্য কাজে ব্যাপকভাবে শারীরিক সহিংসতা, যৌন শোষণ এবং মৌলিক অধিকার অস্বীকারের অভিযোগ আসে। আর এসব আচরণ তাঁদের মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতাকে প্রভাবিত করে।

আটক, নির্বাসন এবং মজুরি তছরুপ: অনেক গ্রহীতা দেশ শ্রমিকদের তাঁদের নিজ দেশে ফেরত পাঠায়। এমনকি বহু বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীরাও কাজের পারমিট বাতিলের মুখোমুখি হয়েছিল। ফলস্বরূপ বিপুল সংখ্যক অভিবাসী দেশে ফিরে এসেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা গন্তব্য দেশে তাঁদের নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে কোনও রকম আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা সহায়তা না পেয়েই ফিরে আসে।

অনিয়মিত অভিবাসীদের জন্য, 'প্রত্যাবর্তনের' সিদ্ধান্ত নেওয়া আরও কঠিন। কেননা আন্তসীমান্ত চলাচলে কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে ভ্রমণ করার জন্য সুযোগ, উপায় ও যে সামর্থ্যের দরকার হয়, (আইকদ্যুয়ুগু, ২০২০) তা তাঁদের থাকার কথা নয়। তাঁদের জন্য, 'কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য ফিরে আসা'র অর্থ তাঁদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা, বিদেশে তাঁদের জীবিকা উপার্জন এবং তাঁদের রেখে-আসা পরিবারের প্রতিদিনের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ হারিয়ে ফেলা।

দক্ষিণ এশিয়ার নারী শ্রমিকদের একটি অংশও দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছিল (ইউএন উইমেন, ২০২০ বি)। নারী অভিবাসীরা নিয়মিত খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার বেলায়ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্য দিয়ে গিয়েছিল এবং মুখোমুখি হয়েছিল লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার। ফিরে আসার পর, নারী অভিবাসীরা সামাজিক কলংকায়নেরও শিকার হয়।

কোভিড-১৯ এর সময় অভিবাসীদের অনিচ্ছাকৃত প্রত্যাবর্তনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত মজুরি তছরুপের বিষয়টি। মজুরি তছরুপের চ্যালেঞ্জ সবসময়ই বহাল থাকলেও, বর্তমান সংকটের (এমএফএ, ২০২০) কারণে এটি আরও বেড়েছে। অভিবাসীদের ন্যায়বিচারের সুযোগ সংকুচিত হয় যখন তারা তাঁদের দাবি উত্থাপন করতে সক্ষম হওয়ার আগেই অন্যায়ভাবে প্রত্যাবর্তিত হয়। এমএফএ (২০২০) যুক্তি তোলে যে, মহামারীতে মজুরি চুরির কারণে রেমিট্যান্স আকারে লক্ষ লক্ষ ডলার হারিয়ে গেছে। এটা শুধু অভিবাসীদের মানবাধিকার লংঘনই নয় বরং এর জন্য তারা ঋণের শেকলে আবদ্ধ হওয়ার দিকে পতিত হয়।

স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং মানসিক ধাক্কা, আয় ও চাকরি হারানো, আটক এবং প্রত্যাবাসন এবং মজুরি চুরির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত চারটি ভাগে বাংলাদেশি অভিবাসীদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর সূত্রপাত করা হয়েছে কোভিড-১৯ এর পরে স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং অভিবাসীদের মানসিক ধাক্কার আলোচনা দিয়ে।

অনুচ্ছেদ ৩: বাংলাদেশি অভিবাসীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও মানসিক ধাক্কা

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ: ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের ১৯ টি দেশে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণে ২,৩৩০ জনেরও বেশি বাংলাদেশি মারা গেছে। জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো এবং বর্তমানে অভিবাসী ২০০ পরিবারের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, কোভিড-১৯ এর সময়ে ২টি পরিবারের অভিবাসীদের মৃত্যুর ঘটনা জানানো হয়েছে। একজন অভিবাসী কোভিড-১৯ ভাইরাসে এবং অন্যজন (আবদুল ৩৮) মস্তিষ্কে পক্ষাঘাতের কারণে মারা যান। মারা যাওয়ার আগে আব্দুল তাঁর পরিবারকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর ঠান্ডা লেগেছে কিন্তু অনিয়মিত অভিবাসী অবস্থার কারণে তিনি নিরাপদ চিকিৎসার জন্য বাইরে যেতে পারেননি। তাঁর সহকর্মীরা পরিবারকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর কোভিড-১৯ এর সমস্ত লক্ষণ রয়েছে। আবদুল হয়তো কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রমিত হননি কিন্তু গ্রেফতার ও প্রত্যাবাসিত হওয়ার ভয়ে তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা যান।
জোরপূর্বক

সারণী ৪.১ অভিবাসী এবং তাঁদের সহকর্মীদের মধ্যে কোভিড-১৯ এর বিস্তার (প্রতিটি কলাম প্রতিক্রিয়াটির শতভাগ নির্দেশ করে)

অভিবাসীদের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ				সহকর্মীদের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ		
ধরন	সংক্রমিত	অসংক্রমিত	মোট	সংক্রমিত	অসংক্রমিত	মোট
বর্তমান অভিবাসী	১.০০	৯৯.০০	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০
জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তিত অভিবাসী	১.০০	৯৯.০০	১০০.০০	৭.০০	৯৩.০০	১০০.০০
মোট	**২ (১%)**	**১৯৮ (৯৯%)**	২০০	৭ (৩.৫%)	**১৯৩ (৯৬.৫%)**	২০০

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

৪.১ নং সারণি দেখাচ্ছে যে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের মধ্যে ৭ শতাংশ জানিয়েছিল যে তাঁদের সহকর্মীরা কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছে। আরো বিস্তারিত সাক্ষাৎকারের সময় অভিবাসীরা জানিয়েছেন, যখন আবাসস্থলে কেউ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়, তখন পুরো ভবনটিই কঠোর কোয়ারান্টিনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। ফলে অন্যান্য অভিবাসীদের কাজের জন্য বাইরে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি খাবার আনার জন্য বাইরে যাওয়াও কঠিন হয়ে যায়। ভাগাভাগি করে থাকা জনবহুল আবাসনে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখাও ছিল কঠিন। যাইহোক, এর মধ্যে ভাল উদাহরণও ছিল। সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ কোনো অভিবাসীর কোভিড-১৯ পজিটিভ হলে তাকে সরিয়ে নেয়। সিঙ্গাপুর ফেরত ফজলুর রহমান নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে সেখানে সাত বছর ধরে কর্মরত ছিলেন। তিনি বলেন, 'সিঙ্গাপুর কোভিড-১৯ এ আক্রান্তদের ভালো যত্ন নিয়েছিল। কোনো অভিবাসীর কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়লে তাকে আবাসন থেকে সরিয়ে সাধারণত কোনো হোটেলে রেখে দেওয়া হয়'।

সারণী ৪.২: বর্তমান এবং জোরপূর্বক প্রত্যাবাসিত অভিবাসীর কোভিড-১৯ পরীক্ষার অভিজ্ঞতা

প্রতিক্রিয়া	জোরপূর্বক-প্রত্যাবাসিত অভিবাসী %			বর্তমান অভিবাসী %		
	পুরুষ	নারী	মোট %	পুরুষ	নারী	মোট %
হ্যাঁ	৪৫.৯২	৫০.০০	৪৬.০০	১.৩৬	০.০০	১.০০
না	৫৪.০৮	৫০.০০	৫৪.০০	৯৮.৬৫	১০০.০০	৯৯.০০
মোট সংখ্যা	৯৮	২	১০০	৭৪	২৬	১০০

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

স্বাস্থ্য-পরিষেবার প্রাপ্যতা: উপসাগরীয় এবং আরব দেশগুলিতে অভিবাসীদের নিয়োগকর্তাদের দ্বারা স্বাস্থ্যবীমা পাওয়ার কথা। বাস্তবে মালিকেরা বীমার টাকা মজুরি থেকে কেটে নেওয়ার মাধ্যমে প্রবাসীদের কাঁধে সেই বোঝা চাপিয়ে দেয়। নিম্ন-দক্ষ কর্মীদের এই ধরনের অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা বা জ্ঞান নেই (ইয়ারা, ২০২০)। তথাকথিত বিনামূল্যের ভিসায় যাওয়া অভিবাসী এবং অনিয়মিত অভিবাসীরা স্বাস্থ্যসেবার আওতাধীন নয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাস্থ্য সুরক্ষার বেলায় আগে থেকে বিদ্যমান অনিশ্চয়তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বর্তমান অভিবাসীদের মধ্যে একটি মাত্র পরিবার জানিয়েছে যে, এই সাক্ষাৎকারের সময় সৌদি আরবে অবস্থানকারী তাঁদের পরিবারের অভিবাসী সদস্য পরীক্ষায় কোভিড-১৯ পজিটিভ বলে সনাক্ত হয়েছিলেন। বিদেশে বসবাসরত অভিবাসী সদস্যরা কোনোরকম কোভিড-১৯ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাননি বলে জানিয়েছিল অভিবাসীদের অন্য পরিবারগুলি। অথবা এ বিষয়ে পরিবারের কাছে কোনো তথ্য ছিল না। এটা বোঝা যায়, যেসব অভিবাসীরা তথাকথিত 'ফ্রি ভিসা' নিয়ে গিয়েছিলেন কিংবা যাঁরা অনিয়মিত অবস্থায় বিদেশে গিয়েছিলেন, তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়লেও ধরা পড়ে ফেরত পাঠানোর ভয়ে স্বেচ্ছায় কোভিড-১৯ পরীক্ষা দিতে যাবেন না। বেশ কিছু জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসী অবশ্য পরীক্ষায় কোভিড-১৯ এ পজিটিভ বলে চিহ্নিত হয়েছেন। সারণি ৪.২ দেখায়, ফেরত আসা অভিবাসীদের মধ্যে ৪৬ শতাংশকে বিতাড়নের আগে কোভিড-১৯ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের কারোরই পজিটিভ আসেনি।

যেখানে অর্ধেকেরও বেশি প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়নি, সেখানে মনে করার কারণ রয়েছে যে, গন্তব্য দেশে বসবাসরত অভিবাসীদেরও সাধারণ পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয় নি। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ফিরে আসা মোহন আলী বলেন, যাঁরা ফিরে আসার জন্য ভ্রমণ করছিলেন, তাঁদের একটি সাধারণ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল এই বলে যে তাঁদের কোভিড-১৯ নেই।

নারী কর্মীরা যাঁরা আবাসিক অর্থাৎ নিয়োগকর্তার সাথে থাকেন তাঁদের তুলনায় যারা বাইরে থাকেন তাঁদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ ছিল কম, যেহেতু আবাসিক কর্মীরা বাড়িতে গৃহকর্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদক্ষেপের অধীনে ছিলেন এবং তাঁরা বাইরে যেতে পারতেন না। কয়েকজন আবাসিক গৃহকর্মীকে অবশ্য কোভিড-১৯ এর সময় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল। যেমন বলা যায় সৌদি আরবের বাসিন্দা গৃহকর্মী শাহনাজের (৩২) কথা। তাঁর হাত ভেঙে গেলে নিয়োগকর্তা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। যাইহোক, শাহনাজের মন খারাপ ছিল। তিনি তাঁর পরিবারকে জানান, নিয়োগকর্তা বলেছেন যে শাহনাজের বেতন থেকে চিকিৎসার খরচ কাটা হবে। অন্যদিকে অনাবাসিক নারী অভিবাসীদের কোভিড-১৯ পরীক্ষার খরচ নিজেদেরই বহন করতে হয়।

মানসিক চাপ ও উদ্বেগ: বর্তমানে অভিবাসীদের মধ্যে নারী-পুরুষ মিলিয়ে ৮৭ শতাংশ (সারণি ৪.৩) দেশে-থাকা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগে ভোগার কথা বলেছেন। ভয়ের কিছু কিছু উৎস নারী-পুরুষ উভয়ের বেলায় একই ছিল, কিছু আবার ছিল লিঙ্গ পরিচয়ভিত্তিক। পুরুষ অভিবাসীরা যেসব মানসিক চাপের কথা বলেছেন, ধরন অনুযায়ী সেসবকে তিন পদে ফেলা যায়: স্বাস্থ্য, মনস্তাত্ত্বিক এবং আর্থিক। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চাপের মধ্যে রয়েছে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ব্যাপারে অক্ষমতা। মানসিক চাপ দেখা দেয় মার্চ মাস থেকে একই ঘরে বন্দি থাকা এবং বিচ্ছিন্নতা ও দমবন্ধকর অনুভূতি থেকে।

নাফিজ বলেছেন যে, 'যদি কোনো শিবিরের একজনের করোনা পজিটিভ সনাক্ত হয়, তাহলে পুরো শিবিরকেই বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। এর পরে আমাদের মধ্যে অনেকেই কাজ, মজুরি, এবং খাবারের অভাবের মুখোমুখি হই। সুতরাং, আপনি কল্পনা করতে পারেন যে আমরা কোন ধরনের চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি'। সম্প্রতি স্থানান্তরিত হওয়া বেশিরভাগ শ্রমিক তাঁদের অভিবাসন খরচ মেটাতে অর্থ ধার করেছেন। তাঁরা এসব ঋণ কীভাবে পরিশোধ করবেন তা নিয়ে উদ্বেগে আছেন। প্রায় সবাই গন্তব্য দেশে অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত ছিল। কারও কারও ভিসার মেয়াদ শিগগিরই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। স্বাভাবিক পরিস্থিতি হলে তাঁরা এসব নবায়ন করে নিতে পারতেন। অনিয়মিত অভিবাসীদের প্রধান উদ্বেগ ছিল আটক কিংবা গ্রেফতারের সম্ভাবনা সম্পর্কিত। তারা কঠিন এক সময় পার করছিল। কারণ তারা বুঝতে পারছিল যে পুলিশ যে কোনও সময় তাঁদের ধরতে পারে এবং দেশেষ ফেরত পাঠাতে পারে। আর্থিক উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে আয়ের বর্তমান অভাব বা চাকরি হারানোর সম্ভাবনা। অনিয়মিত অবস্থার কারণে, তাঁদের একটি অংশ কাজের সন্ধানে বাইরে যেতে পারেনি। যাদের বেতন কাটা পড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে, কোভিড-১৯ এর বাকি সময়ে তারা গন্তব্য দেশে কীভাবে তারা খাদ্য নিশ্চিত করবে তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ সহকর্মীদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বেঁচে ছিলেন। কীভাবে তারা টাকা ফেরত দেবে, সেটাই ছিল তাঁদের দুশ্চিন্তা। যারা মুদি ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল তাঁদের বড় ক্ষতি হচ্ছিল। তাঁদের অনেক পণ্য আর বিক্রি করা যায়নি, কারণ সেগুলোর মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পার হয়ে গিয়েছিল।

সারণি ৪.৩ উদ্বেগ প্রকাশকারী অভিবাসী পরিবারের শতকরা হার

চাপ	অনিচ্ছুকভাবে-প্রত্যাবাসিত অভিবাসী %			বর্তমান অভিবাসী %		
	পুরুষ	নারী	মোট %	পুরুষ	নারী	মোট %
হ্যাঁ	১০০.০০	৯৩.৮৮	৯৪.০০	৮০.৮০	৮৯.২০	৮৭.০০
না	০.০০	৬.১২	৬.০০	১৯.২০	১০.৮০	১৩.০০
মোট সংখ্যা	**২**	**৯৮**	**১০০**	**২৬**	**৭৪**	**১০০**

সূত্র: বিসিএসএম ও আরএমএমআরইউ জরিপ ২০২০

নারী শ্রমিকেরাও তাঁদের পরিবারের কাছে কোভিড-১৯ এ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা, বেতন না দেওয়া ইত্যাদি (৮১%) নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবুও কিছু চাপ রয়েছে যা কেবল নারীরাই অনুভব করেন। নারী কর্মীদের মানসিক চাপও তাঁদের চাকরির ধরন বা বসবাসের জায়গা অনুযায়ী বদলে যায়।

আবাসিক গৃহকর্মীরা মজুরি বিলম্বিত হওয়া বা পরিশোধ না করা, কাজের চাপ বৃদ্ধি এবং পরিবারের সাথে যোগাযোগের মাত্রা কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এর পাশাপাশি, গৃহকর্মী এবং অন্যান্য নারী কর্মীরা তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদের মতো চাকরি হারানোর অভিজ্ঞতারে শিকার হন। শাহনাজ (সৌদি আরব) একজন আবাসিক গৃহকর্মী। নিয়োগকর্তা তাঁকে বেতন দিচ্ছিলেন না। কীভাবে দেশে রেখে-আসা মা ও দুই সন্তানকে খাওয়াবেন তা নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। তাঁর মায়ের আয়ের অন্য কোনো উৎস ছিল না। তাঁর বাচ্চারা তাঁদের মায়ের সাথে ঘন ঘন কথা বলতে না পারায় মানসিক কষ্টে ছিল। আগে তিনি প্রতিদিন ফোন করতেন, কিন্তু কোভিড-১৯ এর সময় তিনি সপ্তাহে মাত্র একবার কল করতে পেরেছিলেন। আগের মতো বারবার মোবাইল রিচার্জ করার জন্য তাঁকে বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। তাছাড়া মোবাইলের টক-টাইম ব্যালান্স রিচার্জ করার মতো টাকাও তাঁর থাকতো না। অভিবাসীরা পেছনে রেখে-আসা পরিবারের সদস্যরাও বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে গেছেন। অংশত এর কারণ তাঁদের পরিবারের অভিবাসী সদস্যদের দুর্ভোগ এবং রেমিট্যান্সের অর্থ ছাড়াই পরিবারের খরচ চালানোর প্রতিকূলতা।

অনুচ্ছেদ ৪: আয় ও চাকরি হারানো

কোভিড-১৯ বিভিন্নভাবে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। কিছু অংশ (৩৪ শতাংশ পুরুষ ও ৮ শতাংশ নারী) সম্পূর্ণভাবে চাকরি হারিয়েছে, এবং একটা অংশ আংশিকভাবে (২৬ শতাংশ পুরুষ ও ২৭ শতাংশ নারী) কাজ খুইয়েছেন। চল্লিশ শতাংশ পুরুষ এবং ৬৫ শতাংশ নারী অভিবাসী তাঁদের চাকরি ধরে রাখতে পারলেও অবশ্যই তাঁদের একটি অংশকে বেতন কম দেওয়া হয়েছে বা দেরিতে বেতন পেতে হয়েছে (সারণি ৪.৪)। তারা বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করত এবং কেউ কেউ ছিল তথাকথিত ফ্রি-ভিসায় গমনকারী। পরিচ্ছন্নতা কোম্পানি এবং নির্মাণ সংস্থাগুলির কাজ বৈশিষ্ট্যগতভাবে আনুষ্ঠানিক শোনালেও বেশিরভাগই শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদারি সংস্থার মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছিল। তারা চাকরিও হারায়। এই শ্রমিকেরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যেহেতু তারা প্রায়ই স্বল্পমেয়াদী বা নৈমিত্তিক কাজের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কোনো নিয়মিত নিয়োগকর্তা তাঁদের ছিল না যে তাঁদের খাদ্য ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে দেবে। এ জন্য করোনাকালে এই অভিবাসীরা তাঁদের জমানো টাকা খরচ করে জীবনধারণ করেছে এবং/অথবা জীবিকা নির্বাহ ও বাড়ি ভাড়া পরিশোধের জন্য বন্ধু কিংবা আত্মীয়দের কাছ থেকে অর্থ ধার করতে হয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, এই পরিস্থিতিতে নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে অভিবাসীরা ভালো এবং খারাপ উভয় ধরনের আচরণই পেয়েছে। যদিও সরকার প্রণোদনা প্যাকেজ বরাদ্দ করে যাতে নিয়োগকর্তারা শ্রমিকদের খাবার এবং বাসস্থানের বন্দোবস্ত জারি রাখে। কিছু নিয়োগকর্তা অভিবাসীদের সেই সুরক্ষাজালের বাইরে রাখেন। অনিচ্ছুকভাবে প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের নিম্নলিখিত বিবৃতিতে এটি আরও স্পষ্ট হয়।

সারণি ৪.৪ : কোভিড-১৯ এর সময়ে গন্তব্য দেশে কর্মসংস্থানের অবস্থা

কাজের অবস্থা	নারী (%)	পুরুষ (%)	মোট সংখ্যা
নিযুক্ত	৬৫.০০	৪০.০০	৪৭
আংশিক নিযুক্ত	২৭.০০	২৬.০০	২৬
বেকার	৮.০০	৩৪.০০	২৭
মোট	**২৬**	**৭৪**	**১০০**

সূত্র: বিসিএসএম ও আরএমএমআরইউ জরিপ ২০২০

কোভিড-১৯ দুনিয়াকে আঘাত করার মাত্র এক বছর আগে কাতারে অভিবাসন করেছিলেন বাইশ বছর বয়সী শওকত। তিনি একটি নির্মাণ সংস্থায় কাজ করতেন। যখন সব নির্মাণ কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল তখন তার কোনো আয় ছিল না এবং তিনি গভীর সমস্যায় পড়ে গেলেন। তাঁর নিজের কথায়, 'আমি মরিয়া হয়ে সবখানে কাজ খুঁজছিলাম কারণ আমার নির্মাণ সংস্থা বন্ধ ছিল। আমি আমার ক্যাম্পের কাছে একটি সবজির দোকানে কাজ নিলাম। দিন শেষে কিছু উপার্জন পেতাম; কিন্তু তা দিয়ে আমার একার খাবারও কিনতে পারতাম না'।

বত্রিশ বছর বয়সী আশরাফকে জোরপূর্বক সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। তিনি তার কাজ চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভুল আচরণের শিকার হন। তাঁকে অন্যায়ভাবে ফেরত পাঠানো হয়। তিনি দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'আমার মালিক ভালো ছিলেন। কোভিড-১৯ এর সময় আমি অর্ধেক সময় কাজ করছিলাম এবং অর্ধেক মজুরি পাচ্ছিলাম। আমার অফিস মাস্ক পরা এবং হাত পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম জারি করে রেখেছিল।

কোভিড-১৯ এর সময়ও নাজিম কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তিনি বলেন, 'আমি একটি সরবরাহ কোম্পানিতে কাজ করতাম। লকডাউনের সময়ও আমার কাজ চলতে থাকে। সেসময় কোম্পানি চত্বর পরিষ্কার করা জরুরি কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। আমি এই আশ্বাসে আংশিক মজুরি পাচ্ছিলাম যে পরিস্থিতির উন্নতি হলে পুরো পাওনা পরিশোধ করা হবে।

ছক ৪.৫: কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের পর বেতন প্রদান

জেন্ডার	পূর্ণবেতনপ্রাপ্ত %)	আংশিক বেতনপ্রাপ্ত %)	বেতন অপ্রাপ্ত (%)	মোট সংখ্যা
পুরুষ	২৪.০০	৩৬.০০	৪০.০০	৭৪
হীরী	৫৮.০০	৩৪.০০	৮.০০	২৬
উত্তরদাতাদের মোট সংখ্যা	৩৩	৩৫	৩২	১০০

সূত্র: বিসিএসএম ও আরএমএমআরইউ জরিপ ২০২০

রেখে-আসা পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন যে, ৪০ শতাংশ পুরুষ এবং ৮ শতাংশ নারী অভিবাসী মহামারীর শুরুর সময় থেকে আর বেতন পাননি (সারণী ৪.৫)। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অভিবাসীদের মধ্যে ৩৪ থেকে ৩৬ শতাংশ আংশিক মজুরি পেয়েছেন। নারীদের ৫৮ শতাংশ এবং পুরুষদের ২৪ শতাংশ হয় তাঁদের বেতন পেয়েছিল অথবা পরিস্থিতির উন্নতির পরে পুরো বেতন পাওয়ার আশ্বাসে কাজ চালিয়ে গিয়েছিল।

অনিয়মিত অবস্থায় থাকা কিছু অভিবাসী কাজের খোঁজে বাইরে যেতে পারেনি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সজল (৩৮) জানিয়েছিলেন, 'আমার কাজ ছিল না এবং আমি কোভিড-১৯ পরিস্থিতির সময় জান-প্রাণ দিয়ে কাজ খুঁজছিলাম। আমি একটি মামুলি দৈনন্দিন কাজ পেয়েছি এবং দিনের শেষে সামান্য ইফতার করতে পেরেছি। আমি যে কাজ করেছি তার জন্য আমার মজুরি বাকি আছে। আমি এত খারাপ অবস্থায় ছিলাম যে বাসা ভাড়া দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে আমার পরিবারকে আমাকে টাকা পাঠাতে হয়েছিল।

ওপরের ঘটনাগুলি ইঙ্গিত করে যে চাকরি হারানো, চাকরির মেয়াদ কমে যাওয়া, বেতন না পাওয়া ইত্যাদি ছিল আর্থিক ভোগান্তির মূল কারণ। বাংলাদেশি নারী অভিবাসীরা মূলত গার্হস্থ্যকর্মী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবাসিক গৃহকর্মীরা কোভিড-১৯ এর কারণে চাকরি হারানোর অভিজ্ঞতার মুখে পড়েননি। তাঁরা মজুরি না পাওয়া, কাজের চাপ বৃদ্ধি এবং পরিবারের সাথে যোগাযোগ হ্রাসের অসুবিধায় ভোগেন। নাজনীন আক্তার (সৌদি আরব) তাঁর পরিবারকে জানান যে, মহামারী শুরুর পর থেকে তাঁর কাজের চাপ বহুগুণ বেড়ে গেছে। অনেক সময় তাঁর ওপর ধোয়াধুয়ির চাপ বেড়ে যায়। সব সময় সাবান স্পর্শ করতে থাকায় তিনি চর্মরোগে আক্রান্ত হন। নিয়োগকর্তারা যদিও সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁর জন্য ওষুধ কিনে দিয়েছেন। আরেকজন আবাসিক কর্মী শাহনাজের মালিক চিকিৎসার খরচ বহন করার বিনিময়ে তাঁর বেতন কেটে রাখেন।

অনাবাসিক নারী গৃহকর্মীরা চাকরি হারানোর শিকার হয়েছেন। নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য, অনাবাসিক গৃহকর্মীদের নিয়োগকর্তারা তাঁদের পরিষেবা নেওয়া বন্ধ করে দেন। যেকোনো শোভন কাজের শর্ত থাকবে যে, নিয়োগকর্তা নারী অভিবাসীদের বাড়ির ভেতরে আসার অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও তাঁদের বেতন দেওয়া অব্যাহত রাখা হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়নি।

অনাবাসিক গৃহকর্মীরা সাধারণত একাধিক বাড়িতে কাজ করেন। সৌদি আরবে যেসব অনাবাসিক গৃহকর্মীদের সব বাড়িতেই চাকরি হারাতে হয়েছিল, সায়মা (২৮) তাঁদের একজন। কোম্পানি তাঁকে একটি কাগজে স্বাক্ষর

করতে বাধ্য করেছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে কোম্পানি আর তার বেতন দিতে সক্ষম নয়। বাস্তবে সায়মার কোনো সহায় ছিল না এবং তিনি পড়ে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য-সেবার আওতার বাইরে। আবার লকডাউনের কারণে তিনি দেশেও ফিরতে পারছিলেন না। ৩৫ বছর বয়সী সুমি খাতুন দুবাইতে একজন অনাবাসিক গৃহকর্মী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দুবাইয়ের তিনটি আলাদা বাড়িতে কাজ করতেন। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে দু'জন নিয়োগকর্তা তাঁর সেবা নেওয়া বন্ধ করে দেন। উপার্জন কমে যাওয়ায় এমনকি তাঁর খাবার ও থাকার ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁর পরিবার জানিয়েছিল যে তিনি কষ্টে ছিলেন। মহামারীর আগে তিনি যখন-তখন বাড়িতে ফোন করতেন, কিন্তু এখন দশ দিনে মাত্র একবার ফোন করতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ৫: আটকাবস্থা

আটকের অভিজ্ঞতা: অতীতে, কোনো সংকটের মুখোমুখি হলে গন্তব্য দেশগুলি অভিবাসীদের নিরাপত্তা কপাটি বা সেফটি ভালভ হিসাবে ব্যবহার করেছিল। জনগণের কষ্টকর অভিজ্ঞতা লাঘবে সরকার সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে, নিজেদের নাগরিকদের এটা বোঝাতে সেসব দেশের নীতিনির্ধারকেরা সাধারণত অভিবাসীদের 'অপর' হিসেবে দাগিয়ে দেয়। অভিবাসী শ্রমিকদের তাঁদের আদি দেশে ফেরত পাঠানো তাঁদের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যবস্থা হয়ে ওঠে (এশিয় আর্থিক সংকট ১৯৯৭ এবং ১৯৯৯, বৈশ্বিক আর্থিক সংকট ২০০৯-১০)। একই পদ্ধতি বাংলাদেশের শ্রমিক গ্রহণকারী অনেক দেশ ব্যবহার করেছে। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের শুরু থেকে, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত এবং মালদ্বীপের সরকার অনিয়মিত অবস্থানে থাকা বাংলাদেশি শ্রমিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা শুরু করে। বাংলাদেশ যদি তাঁদের ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে সেইসব অভিবাসীদের ক্ষমা করার বিকল্প প্রস্তাবও তারা করেছিল। লকডাউনের কঠোর প্রয়োগের অজুহাতে অভিবাসীদের আটক করা এবং অনিয়মিত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। গন্তব্য দেশগুলির আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে অভিবাসীদের এক জায়গায় জড়ো করা ছিল তাঁদের মূল দেশে বিতাড়নের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

৪.৬ নং সারণি দেখায় যে, ৫৫ শতাংশ অভিবাসী জেলভোগ করেছে। তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন আগে থেকেই জেল খাটছিল। দ্বিতীয় অধ্যায় দেখিয়েছে যে, কোভিড-১৯ এর সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪৬,০০০ নারী অভিবাসী ফিরে এসেছিলেন। তবে, নারীদের বেলায় আটকে রাখার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় নি। এছাড়া জুন-জুলাই মাসে সাক্ষাৎকার দেওয়া নারী অভিবাসীরা জানিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যাবর্তন বেশিরভাগই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়। সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া ফেরত আসা দুই নারীর কেউই আটক হন নি এবং তাঁদের কাছে অন্য নারী অভিবাসীদের আটক করার তথ্যও ছিল না। সবচেয়ে বেশি সাক্ষাৎকারদানকারী ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রত্যাগত। তাঁদের মধ্যে ৬৭ শতাংশ আটকের শিকার হয়েছেন। জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের মধ্যে ২৭ জন এসেছিলেন মালয়েশিয়া থেকে। তাঁদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ আটকা পড়েছিলেন। সাক্ষাৎকারদানকারীদের মধ্যে ১৯ জন সৌদি আরব থেকে ফিরেছেন। তাঁদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ আটকের শিকার হন।

ছক ৪.৬: জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তনের আগে আটকের অভিজ্ঞতা

দেশ	না (%)	হ্যাঁ (%)	সিএলএম %	মোট সংখ্যা
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	১০০.০০	৩০
লেবানন	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	২

মালয়েশিয়া	৬৬.৬৭	৩৩.৩৩	১০০.০০	২৭
ওমান	৫০.০০	৫০.০০	১০০.০০	৮
ইরাক	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	১
সৌদি আরব	৪৩.৩৩	৫৬.৬৭	১০০.০০	১৯
কাতার	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	২
কুয়েত	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৩
বাহরাইন	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১
সিঙ্গাপুর	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	২
অন্যান্য	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	৫
মোট	**৪৫**	**৫৫**	**১০০.০০**	**১০০**

সূত্র: বিসিএসএম ও আরএমএমআরইউ জরিপ ২০২০

কোভিড-১৯ এর সময় বিভিন্ন দেশে যেসকল অভিবাসী আটক হয়েছিলেন, তাঁদের বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, যেমন দোকান, রাস্তার পাশ কিংবা তাঁদের বাসার বাইরে থেকে। সৌদি আরবে অভিবাসী বাইশ বছর বয়সী তোতা মিয়ার কথায়, 'আমি কাজের পালা শেষ করে ফিরছিলাম। সাদা কাপড় পরা পুলিশ আমাকে থামায়। আমি আমার সমস্ত কাগজপত্র দেখালাম, তবুও তারা আমাকে আটক করে'। ৪৩ বছর বয়সী মোহন আলী কাতারে অভিবাসী হিসেবে কর্মরত থাকার অভিজ্ঞতা জানান, 'চাকরির আয় দিয়ে না চলায় আমি সিগারেটও বিক্রি করতাম। একজন গ্রাহক কয়েক প্যাকেট সিগারেটের অর্ডার দিয়েছিলেন এবং আমি রাস্তার পাশে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ পুলিশ এসে আমাকে গাড়িতে তুলে নিল। আমি তাঁদের বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যে, আমার ভিসা বৈধ। তবুও তারা আমাকে জেলে পুরে দিল'। মোহাম্মদ আশরাফের কাহিনী আরও করুণ। তিনি বলেন, 'কয়েকদিন ধরে আমি খাদ্যহীন ছিলাম। সেটা ছিল ঈদের দিন। যদিও লকডাউন চলছিল, আমি স্থানীয় এলাকায় বের হয়ে একটি চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম এই আশা নিয়ে যে, কেউ হয়তো আমাকে কিছু খেতে দেবে। কিন্তু পুলিশ এলে সবাই পালিয়ে যায়। তারা আমাকে চায়ের দোকানের মালিক ভেবে গ্রেফতার করে'।

কুয়েত থেকে ফেরত পাঠানো দুই অভিবাসী স্বেচ্ছায় কারাবরণের অভিজ্ঞতা নিয়েছেন। কুয়েত সরকার ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। সরকার জানিয়ে দেয় যে তারা অভিবাসীদের বাড়তি সময় থাকার জন্য শাস্তি দেবে না বরং নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তাঁদের সহায়তা দেওয়া হবে। কুয়েত-ফেরতেরা ব্যাখ্যা করে বলেন যে, যেহেতু কোনো কাজ নেই এবং সঞ্চয়ও ফুরিয়ে যাচ্ছে, সেহেতু দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনো বিকল্প ছিল না। সালাম বলেন, 'কয়েক মাস ধরে আমার কোনো কাজ ছিল না। প্রতি বছর ভিসা নবায়নের জন্য আমাদের কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে হয়। যেহেতু আমার কাজ ছিল না, সেহেতু সঞ্চয় থেকে প্রতিদিনের খরচ চালাচ্ছিলাম। সেই সঞ্চয়ও শেষ হতে চলেছে। এরপর কুয়েত সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। কুয়েত সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, আমরা আমাদের দূতাবাসে গিয়েছিলাম এবং তারপর ফিরে আসার জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছিলাম। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে প্রমাণের নথি জারি করলে, আমরা কুয়েতি কর্তৃপক্ষের কাছে তা জমা দিয়েছিলাম এবং তারা আমাদের আটককেন্দ্রে রেখেছিল।

আটককেন্দ্রের অবস্থা: বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে নেওয়ার পর অভিবাসীদের ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল। কুয়েতের ক্ষেত্রে, কোনো অভিবাসী একবার সাধারণ ক্ষমার পথ বেছে নিলে, তাঁদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। কুয়েতের ডিটেনশন ক্যাম্পের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। প্রায় ২০০ অভিবাসীদের জন্য ছিল

একটি মাত্র টয়লেট। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হয়েছিল। বিদেশে আটক হওয়া অভিবাসীদের অধিকাংশই অমানবিক আচরণের কথা বলেছেন। শুধুমাত্র তাঁদের একটি অংশ মনে করেছিল যে তারা ভাল আচরণ পেয়েছে। কেউ কেউ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। টয়লেট ও গোসলের ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। স্বাস্থ্যের বিষয়গুলি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। দুই থেকে তিনজনকে একটি বিছানা ভাগাভাগি করে শুতে হতো। আর খাবারের মানও ছিল খুবই খারাপ।

কাজলকে ডিটেনশন ক্যাম্পে খাবার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে খুব বেশি অভিযোগ করতে হয় নি। তিনি বলেন, 'আমি কারাগারে বড় সমস্যার মুখোমুখি হইনি। খাবার পাওয়া যেত। এর বেশি আপনি আর কী আশা করবেন? আপনি তো সেখানে মেহমান নন, তাই খাবারের মান খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবুও, আমি সকালে এক টুকরা রুটি পেয়েছিলাম; রাত ও দুপুরের জন্য ছিল ভাত ও মসুর ডাল। আমি বিচলিত ছিলাম কারণ কারাগারে ঢোকানোর সময় তারা আমার টাকা ও মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়েছিল। পরে আর সেসব ফেরত দেওয়া হয়নি'।

কিছু অভিবাসী বলেন যে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির কোনো বালাইই ছিল না। আটত্রিশ বছর বয়সী রশিদকে দুবাইয়ে আটক করা হয়েছিল। গ্রেপ্তারের আগে, 'আমার অফিস থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু জেলে আমি এক কাপড়ে ২৮ দিন থাকলাম। গোসলের সময় আমি একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ পরতাম। নিজেদের বেলায় তাঁদের এক নিয়ম আর আমাদের জন্য আরেকটা'।

বন্দি থাকার অভিজ্ঞতা ঊনচল্লিশ বছর বয়সী ইকবালকে এখনো আতংকগ্রস্থ করে রেখেছে। তিনি জানান, 'চার ঘণ্টা পুলিশ আমাকে এক গ্লাস পানিও দেয়নি। আমার সাথে ১৮০ দিরহাম (৪২০০ টাকা) ছিল। পুলিশ সেই টাকা নিয়ে নিয়েছে। এরপর আমাকে একটি ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। এটা সেই অর্থে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প ছিল না। আমি অন্যদের সাথে দিনের বেলায় প্রচণ্ড রোদে এবং রাতে কাঁপানো ঠান্ডায় খোলা আকাশের নিচে ছিলাম। তারা এমনকি একটা কম্বল দেওয়ারও দরকার মনে করেনি। পরে আমাকে অন্য কারাগারে পাঠানো হয়। সব মিলিয়ে আমি এক পোশাকে ২২ দিন ছিলাম। কিছু জিজ্ঞেস করলে নিরাপত্তারক্ষীরা মারধর করতো। বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও আমাকে এসব সহ্য করতে হয়েছে। আমাকে বাঁচানোর বদলে আমার নিয়োগকর্তা আমার পাসপোর্ট পুলিশের হাতে তুলে দিলেন, তারপর দেশে ফেরত পাঠালেন।'

অনুচ্ছেদ ছয়: জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন

এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে জানানো হয়েছে যে, ২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় চার লক্ষ বাংলাদেশি শ্রমিক দেশে ফিরেছেন (এমওইডব্লিউওই, ২০২০)। নভেম্বরের শুরুতে মন্ত্রণালয় থেকে সারা দেশের মোট প্রত্যাগতের সংখ্যা জানানো হয়। সেই সময় পর্যন্ত মোট প্রত্যাবর্তনকারীর সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ ২৭ হাজার জন। সবচেয়ে বেশি, ৭৬ হাজার ৯২২ জন এসেছে সৌদি আরব থেকে। এর পরে ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত (৭১,৯০৩ জন)।

এই গবেষণায় সাক্ষাৎকার দেওয়া জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীরা এসেছে মোট সতেরটি দেশ থেকে। সারণি ৪.৭ দেখায় যে দুই নারী লকডাউনের ঠিক আগে ফিরে আসেন। বাকিদের মধ্যে ৯৮ জন পুরুষ অভিবাসীকে (৬৭.৩৪ শতাংশ) ফিরতে বাধ্য করা হয়েছিল। লকডাউনের ঠিক আগে ৯.১৮ শতাংশ ছুটিতে

বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং ২৫.৫১ শতাংশ অভিবাসী নিজ সিদ্ধান্তে অথবা তাঁদের নিয়োগকর্তাদের চাপে ফিরে আসেন। একটা অংশ এই আশ্বাসে ফিরেছিলেন যে পরিস্থিতি ভাল হলে তাঁদের আবার ফিরিয়ে নেওয়া হবে। প্রত্যাবাসিত অভিবাসীরা চার ধরনের। একটি অংশকে বিভিন্ন স্থান থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, আটক করা হয়েছিল এবং তারপর প্রত্যাবাসিত করা হয়েছিল এবং অন্য গ্রুপটি তাঁদের নিয়ে গঠিত, যারা সাধারণ ক্ষমার সুযোগ বেছে নিয়েছিল। আরেকটি অংশ জেল খেটেছে এবং 'আউট পাস' নিয়ে ফিরে এসেছে। এবং অন্য একটি অংশ (২৫.৫১ শতাংশ) স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র, উজবেকিস্তান, ইউক্রেইন এবং সোমালিয়া থেকে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়।

সারণি ৪.৭: ৯৮ জন পুরুষ অভিবাসীর প্রত্যাবর্তনের ধরন

প্রত্যাবর্তনের ধরন	পুরুষ %
অনিচ্ছাকৃত প্রত্যাবর্তন	৬৭.৩৪
লকডাউনের ঠিক আগে প্রত্যাবর্তন বেছে নেওয়া	৭.১৪
প্রত্যাবর্তন বেছে নেওয়া	২৫.৫১
শতাংশ এবং মোট সংখ্যা	১০০.০০ (৯৮)

সূত্র: বিসিএসএম ও আরএমএমআরইউ জরিপ ২০২০

গন্তব্যের দেশগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তনের অভিজ্ঞতাগুলি একই রকম। তোতা মিয়া এবং মোহন আলীকে সৌদি আরব ও কাতার থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ওয়াসিমকে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বিতাড়ন করা হয়। তাঁর গল্প তোতা মিয়া এবং মোহন আলীর মতোই। তিনি বলেছিলেন, '১০ জুন ২০২০, প্রতিদিনের কাজ শেষে আমি আমার বাসার কাছে হাঁটছিলাম। হঠাৎ পুলিশ এসে আমাকে গ্রেফতার করে। আমি তাঁদের বলেছিলাম যে আমার কাছে প্রয়োজনীয় সব বৈধ কাগজপত্র আছে কিন্তু তারা কিছুই শোনেনি। আমাকে গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে পুলিশ নীরব ছিল এবং পরে আমাকে মারধরের হুমকি দিয়েছিল, কারণ আমি তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। আমাকে জেলে পোরা হয়েছিল। সেখানে আমি তিন দিন ছিলাম। কোভিড-১৯ পরীক্ষায় নেগেটিভ আসার পর আমাকে বিমানের একটি টিকিট দেওয়া হয়েছিল। এভাবেই আমি ফিরলাম।'

সারণী ৪.৮ দেখায় যে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীকে নির্বিচারে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের দাবি মোতাবেক তাঁদের ভিসার মেয়াদ বাকি ছিল (এই সংখ্যাটা ৬৮ শতাংশের মতো বেশি)। অনেকেরই ভিসার মেয়াদ আরো কয়েক মাস বাকি ছিল এবং তাঁরা জানতেন যে স্বাভাবিক অবস্থায় ওই মেয়াদ আরো বাড়িয়ে নেওয়া যেত। সেলিম কুয়েত থেকে ফিরেছেন। তাঁর ঘটনা পরিস্থিতি ভালই ব্যাখ্যা করে। সেলিম জানান, তিনি গত পাঁচ বছর ধরে কুয়েতে অবস্থান করছিলেন। প্রতি বছর তাঁর ভিসা নবায়ন করার প্রয়োজন হতো। সাধারণত কুয়েতের সকল অভিবাসী তাঁদের আয়ের একটি অংশ জমিয়ে জমিয়ে ভিসা নবায়নের জন্য দরকারি অর্থ জোগাড় করে। লকডাউন জারি করা হলে তিনি আর কাজে যেতে পারেননি। তখন ভিসা নবায়ন ফি পরিশোধের জন্য সঞ্চিত অর্থ দিয়ে খাদ্য ও বাসস্থানের খরচ মিটিয়েছেন। তাঁর সঞ্চয়ও প্রায় শেষ অবস্থায় ছিল। এই অবস্থায় যে মুহূর্তে কুয়েত সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করামাত্রই তিনি তা বেছে নেন। তাঁর কথায়, 'যদিও আমি সাধারণ ক্ষমার সুবিধা নিতে স্বেচ্ছায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তো আমি স্বাভাবিক অবস্থায় নিতে পারিনি। তাই, আমি বলব আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়নি। সরকার নবায়ন করবে না জেনেও আমাকে ফিরতে বাধ্য করা হয়েছিল'।

সারণি ৪.৮: প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের ভিসার অবস্থা

জেন্ডার	মেয়াদোত্তীর্ণ	মেয়াদোত্তীর্ণ নয়	মোট সংখ্যা
পুরুষ	৩১.৬৩	৬৮.৩৭	৯৮
নারী	০.০০	১০০.০০	২
মোট সংখ্যা	৩১	৬৯	১০০

সূত্র: বিসিএসএম ও আরএমএমআরইউ জরিপ ২০২০

অনুচ্ছেদ ৭: বকেয়া বেতন ও অন্যান্য পাওনা

এশিয় অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা বলে যে, কোভিড-১৯ এর সময় যারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল তাঁদের বড় অংশই গন্তব্য দেশে আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদ ফেলে আসেন। এই অভিবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য বড় অংশ কেবল বেতনের টাকাই পাওনা ছিলেন না, এঁদের অনেকে দালালদের কাছে ভিসা নবায়নের জন্যও টাকা দিয়ে রেখেছিলেন। অভিবাসীদের মধ্যে সাধারণ অভ্যাস হলো, কষ্টের সময় এই আশ্বাসের ভিত্তিতে একে অপরকে ঋণ দিয়ে রাখা যে ঋণদাতাও প্রয়োজনের সময় একই ধরনের সহায়তা পাবেন। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অন্য দেশীয় সহকর্মীদের টাকা ধার দিয়েছিল এবং তারা ফিরে আসার আগে সেই টাকা ফেরত নিতে পারেনি। প্রায় সবাই-ই গন্তব্য দেশে জিনিসপত্র রেখে আসেন।

সারণি ৪.৯: অবৈতনিক মজুরি এবং জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের অন্যান্য পাওনা (প্রতিটি কলাম অভিবাসীদের ১০০ ভাগ উত্তর তুলে ধরছে)

সম্পদহানি	সম্পদ রেখে আসার হার (%)	কোনো কিছু রেখে না-আসার হার (%)	মোট
বকেয় বেতন	৬৭.০০	৩৩.০০	১০০
সম্পদ	৬২.০০	৩৮.০০	১০০
ভিসা নবায়নের জন্য প্রদত্ত অর্থ	৭.০০	৯৩.০০	১০০
বন্ধুদের দেওয়া ঋণ	৫.০০	৯৫.০০	১০০
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক জব্দ করা	১৯.০০	৮১.০০	১০০

সূত্র: বিসিএসএম ও আরএমএমআরইউ জরিপ ২০২০

সারণি ৪.৯ দেখায় যে, জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের ৬৭ শতাংশ তাঁদের কষ্টার্জিত উপার্জনের একটি অংশ বকেয়া বেতন/মজুরি আকারে গন্তব্য দেশে রেখে এসেছেন। বাষট্টি শতাংশ সম্পদ/জিনিসপত্র রেখে এসেছেন। উনিশ শতাংশ অভিবাসী আটক হওয়ার সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা অর্থ বাজেয়াপ্ত করার শিকার হয়েছেন। ভিসা নবায়নের জন্য খরচ করা অর্থ খুইয়েছেন সাত শতাংশ এবং পাঁচ শতাংশ সহকর্মীদের দেওয়া ধারের অর্থ হারিয়েছেন।

পঞ্চাশ বছর বয়সী আতিককে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ফিরতে বাধ্য করা হয়েছিল। উপসাগরীয় অনেক দেশেই নির্দিষ্ট ধরনের কিছু চাকরিতে নিয়মিতভাবে সম্পূর্ণ বেতন দেওয়া হয় না। জীবনধারণের জন্য তাঁদের সামান্য কিছু অর্থ দেওয়া হয়। পরে বছরের শেষে বা ছুটিতে যাওয়ার আগে বাকি পাওনা পরিশোধ করা হয়। তাঁর কথায়, 'আমি ১৪ বছর ধরে একটি ইস্পাত কারখানায় কাজ করছিলাম। মজুরি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে প্রতি মাসে আমি অল্প পরিমাণ টাকা পেতাম এবং বছরের শেষে মালিক আমার বকেয়া পরিশোধ করতেন। আমি

বাংলাদেশে আসার পরিকল্পনা করছিলাম। দেশে ফেরত আসার আগে আমার সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমি গ্রেফতার হয়ে বিতাড়িত হয়েছি। শেষ দুই মাসের বেতনসহ আমার এখনও প্রায় ৫ লাখ টাকা পাওনা রয়েছে।'

একচল্লিশ বছর বয়সী বেলাল সৌদি আরবে বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করছিলেন। তিনি একজন অভিবাসী পাকিস্তানিকে চিনতেন ভিসা নবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যার যোগাযোগ ছিল। বেলাল তার ভিসা নবায়ন করতে ওই পাকিস্তানি বন্ধুর সাহায্য নেন। তাঁর কথায়, 'আমার ভিসা ২০২০ সালের জুনে শেষ হয়ে যেত। কোভিড-১৯-এর ঠিক আগে, ভিসা নবায়নের জন্য এক পাকিস্তানি বন্ধুকে আমি ৩ হাজার দিরহাম (৮২৪ ডলার) দিলাম। হঠাৎ গ্রেফতার হওয়ায় আমি আর ওই পাকিস্তানি বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি এবং বাস্তবতা হলো আমি সেই টাকা হারিয়েছি'।

চব্বিশ বছরের সবুজ ছিলেন কাতারে কর্মরত। এক বন্ধুকে ঋণ দিতে গিয়ে তাঁর টাকা মার যায়। তিনি বলেছিলেন, 'আমার ক্যাম্পের এক ভারতীয় সঙ্গীর গ্রামের বাড়িতে জরুরি আর্থিক সংকট তৈরি হয়েছিল। তিনি ২৯৫ ডলার (প্রায় ২৫ হাজার টাকা) সমান অর্থ ধার নিয়েছিলেন। এখন আর সেই সেই টাকা ফেরত পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

গড়ে, ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীরা ২ হাজার ৬০ ডলার বা (১,৭৫,০০০ টাকা) করে হারান। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আতিকের। তিনি বকেয়া মজুরি হিসেবে ৫ লাখের বা (৫,৮৮২ ডলার) বেশি টাকার ক্ষতির শিকার হন। সর্বনিম্ন ক্ষতির কথা জানিয়েছিলেন কালাম। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তাঁর পকেটে সাড়ে নয় হাজার টাকার সমান কিছু দিরহাম ছিল। গ্রেফতার করার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাঁর সেই টাকা হাতিয়ে নেয়।

অধ্যায়ের উপসংহার

এই অধ্যায় প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের মহামারীকালীন অভিজ্ঞতা উন্মোচনের মাধ্যমে সংকটজনক পরিস্থিতিতে অভিবাসীদের অবস্থা বিষয়ক আলোচনায় অবদান রাখে। অধ্যায়টি বাধ্যতামূলকভাবে ফেরত পাঠানো এবং বর্তমান অভিবাসীদের সমীক্ষার তথ্য এবং পরোক্ষ সূত্রের আলোচনা ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোভিড-১৯ এর সময় বাংলাদেশি অভিবাসীদের বিপন্নতার কথা তুলে ধরেছে।

অধ্যায়টি শুরু হয় স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও মানসিক আঘাতের মুখে পড়া অভিবাসীদের কথা দিয়ে। এটি দেখায়, কোভিড-১৯ এর সময় বিশ্বের অন্যান্য অভিবাসীদের মতো বাংলাদেশি অভিবাসীরাও স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়েছিল। জাতীয় স্তরের তথ্য দেখায় যে ২৭ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের মধ্যে সারা বিশ্বে ২,৩৩০ জন বাংলাদেশি অভিবাসী কোভিড-১৯ জনিত কারণে মারা গেছেন। সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে সৌদি আরবে।

এই গবেষণার অধীনে সাক্ষাৎকার নেওয়া দুইশ অভিবাসীর মধ্যে একজন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ছিলেন। দুই অভিবাসীর মৃত্যু হয়; তাঁদের একজন গন্তব্য দেশে এবং অন্যজন ফিরে আসার এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশে মারা যান। গন্তব্য দেশগুলির বেশিরভাগ সরকারই ভিসার অবস্থা নির্বিশেষে সকল অভিবাসীদেরই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে। তবে বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশি অভিবাসীদের সেই সুযোগ গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। পেশাদার এবং উচ্চ-দক্ষ কর্মীরা স্পষ্টতই স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার

ক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়েননি। যাদের কর্মসংস্থান অনিয়মিত, তারা গ্রেফতার ও বিতাড়নের ভয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিতে যাননি। মৃতদের মধ্যে একজন অন্তত বেঁচে যেতে পারতেন যদি তিনি আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে এসে হাসপাতালে যেতে পারতেন। যাঁরা উপসাগরে ফ্রি ভিসায় ছিলেন, তাঁরা দরকারের সময় স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারতেন যদি তাঁদের অনেকের কাছে সেবাগুলি সম্পর্কে তথ্য জানার সুযোগ থাকতো। মনে হয় আবাসিক নারী অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু অনাবাসিক নারী গৃহকর্মী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেননি। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, আর্থিক অভাবে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার সামর্থ্য তাঁদের ছিল না, যেহেতু ওইসব পরীক্ষার খরচ তাঁদেরই বহন করতে হতো।

জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসী এবং এখনও গন্তব্য দেশে রয়ে যাওয়া অভিবাসীরা বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগের মধ্য দিয়ে গেছেন। এটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সত্য। যাইহোক, লিঙ্গ ভেদে তাঁদের অবস্থান এবং কাজের ধরনের ভিন্নতার কারণে যার যার উদ্বেগের প্রকৃতিও আলাদা ছিল। পুরুষ অভিবাসীরা স্বাস্থ্য ও আর্থিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত দুশ্চিন্তার কথা জানান। একটি ঘরে গাদাগাদি করে আটক থাকা, ঋণ পরিশোধে খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা, দেশে থাকা পরিবারের কাছে রেমিট্যান্স পাঠাতে না পারার হতাশা ও অসহায়ত্বের বোধ, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ভিসা নবায়নের দুশ্চিন্তা, ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং পুঁজি হারানোর কথা তুলে ধরেছিল পুরুষ অভিবাসীরা। অনাবাসিক নারী অভিবাসীরাও একই রকম চাপের কথা উল্লেখ করে। তবে আবাসিক গৃহকর্মীদের জীবনের চাপ ছিল ভিন্ন। পরিবারের সাথে কম যোগাযোগ, বেতন না-পাওয়া বা আংশিক পাওয়া এবং বাড়তি কাজের চাপ ছিল তাঁদের উদ্বেগের বড় বড় কারণ। বাড়িতে থাকা তাঁদের পরিবারগুলিও অভিবাসীদের সাথে যোগাযোগের সময় কোভিড-১৯ সম্পর্কিত চাপ-তাপ অনুভব করেছিল।

স্বল্পমেয়াদী অভিবাসী নারী-পুরুষ উভয়েই চাকরি হারানো, কর্মঘন্টা কমে যাওয়া এবং আয়হ্রাস পাওয়ার মুখে পড়েছে। মাত্র ৪৭ শতাংশ শ্রমিক তাঁদের চাকরি বহাল রাখতে পেরেছে। অভিবাসীদের মধ্যে ২৬ শতাংশ আংশিকভাবে কর্মরত ছিলেন এবং বাকি অভিবাসীরা (২৭ শতাংশ) ছিলেন সম্পূর্ণ বেকার। অনাবাসিক গৃহকর্মী ও তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদের মতো আবাসিক গৃহকর্মীদের চাকরি হারাতে হয়নি। অনাবাসিক এই নারীরা এতই নাজুক অবস্থায় পড়েছিল যে তাঁদের জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করাই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। আবাসিক গৃহকর্মীদের কাজের বোঝা এই সময় বহুগুণ বেড়ে যায় এবং তাঁদের মজুরি পরিশোধেও অনেক বিলম্ব করা হয়।

গবেষণার একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ফল হলো এই: অতীতের অন্যান্য সংকট পরিস্থিতির মতো, গন্তব্য দেশগুলি কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলার অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে অভিবাসীদের জোরপূর্বক তাঁদের মূল দেশে বিতাড়নের পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল। অভিবাসীদের তাঁদের মূল দেশে ফেরত পাঠানোর বেলায় গন্তব্য দেশগুলি আন্তর্জাতিক মানসম্মত কোনো কাঠামো বা মানদণ্ডের ধার ধারেনি। অভিবাসীদের আটক করা ও ফেরত পাঠানো ছিল কিছু উপসাগরীয় দেশের দুটি হাতিয়ার। ভিসা মেয়াদোত্তীর্ণদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ছিল তাঁদের বিতাড়নে উৎসাহিত করার আরেকটি উপায়। ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের পঞ্চান্ন শতাংশ আটকের সম্মুখীন হয়েছেন। বেশিরভাগ পুরুষ অভিবাসীদেরই গেফতার ও আটকের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যাঁরা গ্রেফতার ও আটকের অভিজ্ঞতা পেয়েছিল, তাঁদের জনপরিসর, রাস্তা বা তাঁদের বাসস্থানের সামনে থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। পুরুষ অভিবাসীরা গড়ে প্রায় ২০ দিনের মতো আটক থেকেছিল। অধিকাংশই কারাগারে বা ডিটেনশন সেন্টারে অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণের শিকার হয়েছে। কয়েকজনকে শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত করা হয়। বন্দীদের অধিকাংশই কারাবাসের পুরো সময় ধরে একবস্ত্রে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই অভিবাসীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়।

বিতাড়নের আকস্মিক ধরনের কারণে, অনেক অভিবাসী তাঁদের কষ্টার্জিত আয়ের একটি অংশ গন্তব্য দেশে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। অভিবাসীদের ৬৭ শতাংশের মজুরি পুরোপুরি পরিশোধ করা হয়নি। অভিবাসীদের মধ্যে বাহান্ন শতাংশ গন্তব্য দেশে তাঁদের সম্পদ, জিনিসপত্র এবং উপকরণাদি রেখে এসেছেন। উনিশ শতাংশ অভিবাসী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে গ্রেফতারের সময় তাঁদের অর্থ, মোবাইল, ঘড়ি ইত্যাদি খুইয়ে ফেলেন। সাত শতাংশকে তাঁদের ভিসার বার্ষিক নবায়নের উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতাকারীদের অর্থ প্রদান করার জন্য মোটা অঙ্কের টাকা ত্যাগ করতে হয়েছিল।

বাংলাদেশিদের অভিজ্ঞতাগুলি দেখায় যে, যারা ইতিমধ্যেই অধিকার ও সুরক্ষার বঞ্চনার মধ্যে ছিল কোভিড-১৯ তাঁদেরই বেশি ভুগিয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে অভিবাসীদের চিকিৎসার বিষয়ে শ্রমিক গ্রহণকারী কোনো দেশেরই এমন কোনো নীতি ছিল না যা তাঁদের কার্যক্রমের সহায়ক হবে। গ্রহীতা দেশগুলোর নীতিমালার অভাব এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে অভিবাসীরা সংকটের সময়ে খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও মজুরির ক্ষেত্রে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে যায়।

কোভিড-১৯ এর সময়ে গন্তব্য দেশগুলিতে অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা বৈশ্বিক শ্রম-মান কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে। এটি আরও দেখায় যে, সকল শ্রমপ্রেরক ও শ্রমগ্রহীতা দেশগুলির এমন জরুরি নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন যা অভিবাসীদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করবে। জরুরি নির্দেশিকাকে অবশ্যই নারী ও পুরুষ অভিবাসী এবং নিয়মিত ও অনিয়মিত অভিবাসী সবার প্রতি সংবেদনশীল করা প্রয়োজন।

অধ্যায় ৫

গন্তব্য দেশে ও স্বদেশে নিরাপত্তা ও নিরাপত্তাহীনতা

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সিকদার, সারোয়াত বিনতে ইসলাম, জেসিয়া খাতুন

স্নায়ুযুদ্ধের শেষের দিকে, যখন প্রথাগত নিরাপত্তা বিশ্লেষণের পরিসর বিস্তৃত করা হচ্ছিল, তখন এর মধ্যে অভিবাসনকে সুরক্ষা চিন্তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় এ কারণে যে, এটি আন্ত: ও অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে স্থিতিশীলতার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে (বুজান, ওয়েভার ও ডি ওয়াইল্ড, ১৯৯৮ এবং বুজান ও ওয়েভার, ২০০৩)। বর্তমানে, কোভিড-১৯ মহামারী ও 'অপর' নিয়ে ভীতি অভিবাসনকে আরো নিরাপত্তাকেন্দ্রিক করায় ভূমিকা রাখছে। অভিবাসী শ্রমিকদের কোভিড-১৯ এর উৎস হিসেবে দেখানো হয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অভিবাসীদের নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কোভিড-১৯ বিস্তারের জন্য দায়ি করে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে (চুঘ, ২০২০, ইউএন, ২০২০ এবং সেভেন ক্যান, ২০২০)। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের সময়, বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি অভিবাসী এবং তাঁদের প্রবাসী পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ১ এপ্রিল থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ থেকে মোট চার লাখ অভিবাসী বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন (ডউডউ, ২০২০)। এই অধ্যায়ের অনুসন্ধানের লক্ষ্য হলো:

(ক) গন্তব্য দেশে অভিবাসনের নিরাপত্তায়ন, (খ) বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর অভিবাসীদের নিরাপত্তাহীনতা ও নাজুকতা (গ) বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও সমাজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং (৪) নিরাপত্তাকরণের কারণে অভিবাসীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা।

ব্যারি বুজান প্রমুখ (১৯৯৮) নিরপাত্তাকরণের সুস্পষ্ট ধারণাগত কাঠামো দিয়েছেন। তিনি নিরাপত্তায়নকে সংঙ্গয়িত করেছেন একদল ব্যক্তির দ্বারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে পূর্বে উপেক্ষিত চ্যালেঞ্জগুলিকে জনগণ, রাষ্ট্র ও

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও কল্যাণের জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করার সুচিন্তিত পদক্ষেপ হিসেবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তৃতার মাধ্যমে স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিসীমার বাইরে বিশেষ জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে যৌক্তিকতা তৈরি করেন। নিরাপত্তায়নের ফল হলো বিরাট আকারে সম্পদ বরাদ্দ, আইনের সংস্কার, এবং বিষয়টির সামরিকীকরণ। এই বই ব্যারি বুসানের দেওয়া নিরাপত্তায়নের সংজ্ঞা অনুসরণ করেছে।

অধ্যায়টি ভূমিকা এবং উপসংহারসহ আটটি ভাগে বিভক্ত। অনুচ্ছেদ-২ এ কোভিড-১৯ এর সময় অভিবাসনকে একটি অপ্রচলিত নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে বিবেচনা করার ধারণাগত বোঝাপড়া যাচাই করা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে গবেষণার পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে গন্তব্য দেশগুলিতে অভিবাসীদের কীভাবে নিরাপত্তায়ন করা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের সঙ্গে বাংলাদেশে কীরকম আচরণ করা হয়েছিল তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপত্তায়নের প্রক্রিয়া ও অভিঘাত বর্ণনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে। সপ্তম অনুচ্ছেদে অভিবাসীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ওপর নিরাপত্তায়নের প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, অষ্টম অনুচ্ছেদে মূল ফলাফলগুলির সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ ধারণাগত কাঠামো

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং এর উপ-ক্ষেত্রের অধ্যয়ন হিসেবে নিরাপত্তা অধ্যয়ন নিরাপত্তার ধারণাকে পুনরায় সংঙ্গায়িত করার চেষ্টা করেছে। প্রচলিত রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সামরিক নিরাপত্তার পাশাপাশি বিভিন্ন অ-প্রথাগত নিরাপত্তা (non- traditional security বা এনটিএস) সমস্যাকে এনটিএস ধারণার অধীনে বিস্তৃত শিরোনামে নিরাপত্তা-চিন্তনের সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল। বিশ্বের কিছু অংশে, অ-সামরিক হুমকিকে কিছু সম্ভাব্য শত্রু রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির চেয়ে গুরুতর বলে মনে করা হয়। সে কারণে এনটিএস-এর চিন্তাকাঠামোয় নিরাপত্তা অধ্যয়নের বেলায় অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সমস্যাগুলিকে ধারণ করে ক্ষেত্রটিকে আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানানো হয়েছে(বুথ, ১৯৯১, ওয়েভার, ১৯৯৫, এবং আইয়ুব, ১৯৯৭)। এই বিকাশমান চিন্তাধারার মধ্যেই জনসংখ্যার স্থানান্তরকে (বিশেষ করে আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তর, সংক্রামক রোগের বিস্তার, সংগঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ, যেমন অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান, মানবপাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি) একটি নিরাপত্তা সমস্যা হিসেবে দেখা হয়েছে।

টেইটেলবম (টেইটেলবম ২০০২) প্রথম পদ্ধতিগতভাবে নিরাপত্তা আলোচনায় অভিবাসনকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি অভিবাসনকে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে ভেবেছিলেন। তাঁর যুক্তি হলো, শরণার্থী জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য অভিবাসীরা যখন বড় আকারে আন্তঃসীমান্ত চলাচল করে তখন গন্তব্য দেশের স্থিতিশীলতা চাপে পড়ে এবং তৈরি হয় রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব। জনচলাচল বহন করে নিয়ে আসে সন্ত্রাসবাদ ও আন্তর্জাতিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে সহজতর করার ঝুঁকি। অতএব, তিনি এমন ধরনের নিরাপত্তায়ন পদক্ষেপের প্রস্তাব করেন, যা গতানুগতিক রাজনৈতিক সীমানার বাইরে গিয়ে অভিবাসন থেকে উদ্ভূত নিরাপত্তাহীনতা মোকাবিলায় সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ বা কঠোর অভিবাসন নীতি প্রবর্তনের মতো জরুরি ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। ডি'অ্যাপলনিয়ো ও ফার্নি (ডি'অ্যাপলনিয়ো ২০১৫: ৩৭ ও জেস ফার্নি ২০১৬: ৪) বলেন যে, অভিবাসন সংহতি-বিনষ্ট ও সম্ভাব্য চরমপন্থা আনতে পারে। বুজান, ওয়েভার ও জ্যাপ ডি ওয়াইল্ড (১৯৯৮) একটি সমাজের সংহতির দৃষ্টিকোণ থেকে অভিবাসনকে অপ্রচলিত সমস্যা হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁরা যুক্তি দেন, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অন্য সম্প্রদায় থেকে জনসংখ্যার আগমন স্থানীয় জনসংখ্যার গঠন বদলে দিয়ে তার পরিচয়ও

বদলে দিতে পারে। সুতরাং অভিবাসনকে গ্রহীতা দেশের পরিচয়ের জন্য হুমকি হিসাবে দেখা যেতে পারে। যাইহোক, বুজান প্রমুখ দেখিয়েছেন যে, অভিবাসনের চ্যালেঞ্জটি নিরাপত্তায়নের মাধ্যমে মোকাবিলা করা যায় না, বরং এ ধরনের উদ্যোগের ফলে অভিবাসীদের ওপর শোষণ, বৈষম্য, অবিচার এবং এমনকি হয়রানি ও নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে। যখন অভিবাসনের নিরাপত্তায়ন হয়ে যায় তখন এটি অভিবাসীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য নতুন হুমকি তৈরি করতে পারে। অভিবাসীদের সামাজিক স্থিতিশীলতা কিংবা অর্থনৈতিক সুযোগের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা গ্রহীতা সমাজের পক্ষ থেকে বলপ্রয়োগমূলক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে এবং অভিবাসীরা নির্যাতন ও অসম আচরণের শিকার হতে পারে। এই ধরনের আচরণ মানুষের নিরাপত্তার সাতটি উপাদানকেই (অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, পরিবেশগত নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, সম্প্রদায়গত নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা) লংঘন করে। এভাবে এটি অভিবাসী সম্প্রদায়কে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে। এই ক্ষেত্রে অনিয়মিত অবস্থায় থাকা অভিবাসীরা সবচেয়ে অনিরাপদ হয়ে ওঠে।

অপ্রচলিত নিরাপত্তা হুমকি হিসাবে এইচআইভি/এইডস, গুরুতর তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সিন্ড্রোম (সারস), উদীয়মান ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা (টিবি) স্ট্রেইন এবং ইবোলা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগও গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং নিরাপত্তা গবেষণার জগতেও রাষ্ট্র ও ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষায় সংক্রামক রোগগুলিকে নিরাপত্তার বিষয় হিসেবে দেখার আগ্রহ বাড়ছে (ক্যাবলেরো-অ্যান্টনি, ২০০৬: ১০৬)। যাইহোক, বৈশ্বিক পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তনের প্রেক্ষিত এবং বিভিন্ন মহামারী-সম্পর্কিত বিপদের গতিশীল সম্পর্কের কারণে হয়তো সংক্রামক রোগের নিরপত্তায়ন এইসব হুমকির মোকাবিলায় দক্ষতার সাথে সাড়া দেওয়ার পদ্ধতি হিসাবে আর যথেষ্ট নয়। মহামারী মোকাবিলায় সক্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে বড় আকারের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তাই, সংক্রামক রোগগুলিকে নিরাপত্তা ধারণার অধীনে গুরুতর হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্তসূচক পন্থা গ্রহণের পাশাপাশি এইসব জটিল সমস্যাগুলি মোকাবিলায় পদ্ধতিগত ও সমন্বিত কার্যক্রমও হাতে নিতে হবে (পূর্বোক্ত, ১০৬)।

আন্তসীমান্ত চলাচলের সঙ্গে সংক্রামক রোগের জটিল সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষের গতিশীলতার ফলে ভাইরাস বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে চলে যেতে পারে। বিশ্বাস করা হয় যে, যে কোনও দেশ বা জনগোষ্ঠীর ভেতর যাওয়ার সময়, আন্তসীমান্ত অভিবাসীসহ সচল জনগোষ্ঠী তাঁদের সাথে ভাইরাসও বহন করতে পারে (স্কেলডন, ২০০০, ইউএনডিপি, ২০০৪, সিকদার, ২০০৮ এবং কোহেন এবং সিরকেসি, ২০১১)। এইচআইভি/এইডস এবং অভিবাসন বিষয়ক একটি অবস্থানপত্রে আইওএম (২০০২:২) বলেছে যে, জনসংখ্যার গতিশীলতা এবং এইচআইভি/এইডস অভিবাসন প্রক্রিয়ার শর্ত ও কাঠামোর সাথে যুক্ত। আর তা ঘটে উৎস দেশের মানুষের মধ্যে, ট্রানজিটের সময়, গন্তব্যে এবং তাঁদের ফেরার পর। পরিষেবা ও তথ্যের অভাবে, অভিবাসীরা কেবল রোগের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে না বরং অজান্তেই তাঁদের স্ত্রীসহ অন্য যাদের কাছে তারা একটা সময়ের ব্যবধানে ফিরে আসে, তাঁদের মধ্যেও ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটায়।

এটা আশ্চর্যজনক নয় যে, ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে চীনের উহানে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের ফলে অর্থনীতি বন্ধ হয়ে গেছে, সীমান্ত বন্ধ হয়ে গেছে এবং অদৃশ্য শত্রুর ভয় বিশ্বজুড়ে অভিবাসন নীতি কঠোর করায় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি একটি নতুন 'স্বাস্থ্য নিরাপত্তায়ন' অভিবাসন প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটিয়েছে (চুঘ, ২০২০)। কলঙ্কায়ন, বেঠিক তথ্য প্রচার এবং বৈষম্য গন্তব্য দেশগুলিতে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষ বাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র একটি আপাতবিরোধী 'আধা-কোয়ারান্টাইন' তৈরি করেছে যা রাষ্ট্রকে মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার শাসনব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায়। তাই মনে হয় যে অভিবাসন নীতির দীর্ঘমেয়াদী

প্রভাবগুলি জন-গতিশীলতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির (পূর্বোক্ত) ওপর আরও নিয়ন্ত্রণ ডেকে নিয়ে আসছে। সঙ্কটের সময় একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নিরাপত্তায়ন নতুন কিছু নয়। সন্ত্রাস থেকে শুরু করে রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় প্রায়শই অভিবাসীদের বলির পাঁঠা বানানো হয় এবং অভিবাসনকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে ভাবা হয় (জাতিসংঘ, ২০২০)।

কোভিড-১৯ এর পর অভিবাসনের নিরাপত্তায়নের ফলে অভিবাসীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়েছে, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অসুবিধা বাড়িয়েছে; চাকরি ও আয়ের ক্ষতি ইত্যাদি ঘটিয়েছে। মহামারীর সময় অভিবাসনের নিরাপত্তায়নের অন্যতম প্রধান ফল হলো বাধ্যতামূলক প্রত্যাবাসন। চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর এবং পেরুতে বসবাসকারী ভেনেজুয়েলার অভিবাসীরা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, তারা নিজের দেশে প্রবেশের সময়ও বাধার মুখোমুখি হন। কারণ তাঁরা ভাইরাসের বাহক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন এবং সরকার কঠোরভাবে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করেছিল (কররিয়া ও কোস্টা, ২০২০)। একই প্রেক্ষাপটে, অনেক মোজাম্বিকান অভিবাসী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে আসায় উদ্বেগ বাড়ে যে তারা হয়তো নিজ দেশে কোভিড-১৯ ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে পারে। সম্ভাব্য ভাইরাসবাহক হিসাবে, অভিবাসীরাও ক্রমবর্ধমান বিরূপতার মুখোমুখি হয়। অনেক ইথিওপিয়, ভারতীয় এবং নেপালি প্রত্যাবাসনকারী অভিবাসী জানিয়েছেন, তাঁরা ভাইরাসমুক্ত হলেও তাঁদের পরিবার আশঙ্কা করেছিল যে ফিরে এসে তারা তাঁদের ভাইরাসে আক্রান্ত করবে। তাঁদের প্রতিবেশী এবং সমাজও তাঁদের সন্দেহ করে এবং এড়িয়ে যায় (ভট্টাচার্য, ব্যানার্জি এবং রাও, ২০২০ এবং আইওএম, ২০২০ এ)।

দেশে ফিরতে বাধ্য হওয়া বেশিরভাগ অভিবাসীর বেকারত্বের ঝুঁকি তীব্র হয়ে উঠেছিল। মহামারী ছড়িয়ে পড়ার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই কাজ খুঁজে না-পাওয়ার সম্ভাবনা মারাত্মক আকার ধারণ করে। চাকরির অভাব ও অনিশ্চয়তা তাঁদের অবসাদ ও আত্মঘাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। (ভট্টাচার্য, ব্যানার্জি ও রাও, ২০২০)। অর্থ বা সঞ্চয় ছাড়া নিজ দেশে ফিরে আসা তাঁদের অর্থনৈতিক গঞ্জনারও শিকার করে তোলে। ফিরে আসা নারী অভিবাসীরা লিঙ্গ-ভিত্তিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে (আইওএম, ২০২০বি, ইউএন উইমেন, ২০২০ এবং এইচআরডব্লিউ, ২০২০)

এই সংকটের সময়, শ্রমিক প্রেরণকারী অনেক দেশ জোরপূর্বক প্রত্যাবাসিত শ্রমিকদের পুনঃসংস্থানের জন্য তহবিল বরাদ্দ করেছে (ডাংঘানা ও ঘিমিরে, ২০২০ এবং হেন্ডারসন, ২০২১)। দীর্ঘমেয়াদে, সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্যতার অভাব, কলঙ্কায়ন এবং/অথবা বৈষম্যমূলক আচরণ অভিবাসীদের তাঁদের নিজস্ব সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি কেবল অভিবাসী এবং তাঁদের পরিবারের ভাল থাকাকেই হুমকিতে ফেলে না, বরং ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সামাজিক অবস্থান দুর্বল করে। আর এভাবে বাড়ায় নিরাপত্তাহীনতা ও নাজুকতা।

এই অধ্যায়ে, আমরা কোভিড-১৯ মহামারীর সময় জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো বাংলাদেশি অভিবাসী এবং তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তাহীনতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে গবেষণা দাঁড় করেছি এবং তা এগিয়ে নিয়েছি। এ থেকে আরও পরিশ্রুত ও সীমিত-সামাজিক বোঝাপড়া গড়ে ওঠে যে, কী করে সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক পরিষেবায় সুযোগের অভাব এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৌশলে ঘাটতি অভিবাসীদের প্রত্যাবর্তনের যাত্রায়, গন্তব্য দেশে থেকে নিজ দেশে ফেরার সময়ে তাঁদের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলে।

অনুচ্ছেদ ৩: গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার জন্য, এই অভিসন্দর্ভে মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মোট ২০০ জন উত্তরদাতার (১০০ জন জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসী এবং ১০০ জন পরিবার পেছনে রেখে-যাওয়া বর্তমান অভিবাসী) সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের ২১টি জেলায় মে থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মাঠের অনুসন্ধান পরিচালিত হয়েছিল। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, এই গবেষণাটি সম্প্রতি প্রকাশিত নিবন্ধ, মিডিয়া প্রতিবেদন, শ্বেতপত্র এবং অন্যান্য অনলাইন লেখাপত্রের ডেস্ক রিভিউ করা হয় যাতে গবেষণা-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি আসন্ন প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রমের পদ্ধতি আরো সুষ্ঠু করা যায়। সাক্ষাৎকারগুলি এসপিএসএস ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। ফিল্ড নোটগুলি অংশগ্রহণকারীদের বাস্তবতা এবং সার্বিক পরিস্থিতি বোঝার কাজে অবদান রাখে। কেস প্রোফাইলগুলি ফেরত পাঠানো অভিবাসী, এবং বর্তমানে অভিবাসী পরিবার এবং অন্যান্য উৎসের সাক্ষাৎকারের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ গন্তব্য দেশে অভিবাসীদের নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে বিবেচনা

কোভিড-১৯ এর দ্রুত প্রাদুর্ভাবে যখন প্রধান প্রধান অভিবাসী গ্রহণকারী দেশের অর্থনীতি সরাসরি আক্রান্ত হয়েছিল, তখন তারা স্থানীয় ও অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে কোভিডের বিস্তার প্রতিরোধ ও পর্যবেক্ষণের জন্য বেশ কিছু বহুস্তরীয় বিধিনিষেধমূলক ব্যবস্থা চালু করেছিল (যেমন; গণ কোভিড-১৯ পরীক্ষা, অস্থায়ী লকডাউন, সাধারণ ক্ষমা, বাজার বন্ধ, নিষেধাজ্ঞা এবং জোরপূর্বক প্রত্যাবাসন ইত্যাদি)। এই রাষ্ট্রীয় নীতিগুলি বিপুলসংখ্যক অভিবাসী শ্রমিকনির্ভর বড় বড় খাতগুলিকে হুমকির মুখে ফেলে। এই শ্রমিকেরা নিজেদের দেশেও ফিরে যেতে পারছিল না। কেননা প্রবাসে বা দেশে উভয় স্থানেই তাঁদের চলাচল নিষিদ্ধ থাকায় ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না। (ইকডুয়ুগু, ২০২০: ১-৩)। অনেক শ্রমগ্রহীতা দেশ অভিবাসীদের নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এর সমাধান হিসেবে শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক প্রত্যাবাসনের পথ বেছে নিয়েছে (ইউএনএনএম, ২০২০)। যেমন, সৌদি আরব কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে রাখার সংগ্রাম করছিল এবং অভিবাসী শ্রমিকদের বিতাড়নকেই ভেবেছিল অন্যতম সমাধান। এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত, মহামারীর কারণে, সৌদি আরব প্রায় ২ হাজার নয়শ ইথিওপিয় অভিবাসীকে ফেরত পাঠিয়েছিল। মে মাসে ইয়েমেনের হাউথি কর্তৃপক্ষ সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ৮০০ সোমালি অভিবাসীকে জোর করে তাঁদের মরু সীমান্তে রেখে-আসার অভিযোগ এনেছিল। ইয়েমেনেও ভাইরাস নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের ফলে, এই অভিবাসীরা মৌখিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতিত হন।

৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সৌদি আরব, ওমান, বাহরাইন, কুয়েত ও মালদ্বীপ ওইসব দেশে বসবাসকারী হাজার হাজার অননুমোদিত বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিতাড়নের আহ্বান জানিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত হুমকি দিয়েছে, যেসব দেশ তাঁদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে তাঁদের সঙ্গে শ্রমিক বিষয়ক সম্পর্কের অবসান ঘটবে। দেশটি তাঁদের বিতাড়ন নীতি অমান্যকারী দেশগুলির শ্রমিকদের ওয়ার্ক ভিসা কঠোর কোটাভুক্ত করার কথা বিবেচনায় রাখছে বলেও জানায়। পরে বাংলাদেশ সরকার তার শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনতে সম্মত হয়।

মার্চ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৪ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক জোরপূর্বক বিতাড়নের শিকার হয়। এই গবেষণায় অংশ নেওয়া ১০০ জন প্রত্যাবাসিত অভিবাসীর মধ্যে ১৮ জন জানিয়েছেন যে তাঁরা, কাজ বা কেনাকাটার জন্য

বের হয়ে তাঁরা পুলিশের হাতে আটক হন। এই অভিবাসী শ্রমিকেরা সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মালয়েশিয়ায় কাজ করতেন। অন্যদিকে, এই গবেষণায় ১০০ অভিবাসী পরিবারের মধ্যে ৪৮ টি পরিবার জানায় যে, তাঁদের পরিবারের অভিবাসী শ্রমিকেরা গন্তব্য দেশে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে অনিরাপদ অবস্থায় ছিল। অভিবাসীরা তাঁদের দেশে থাকা পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছিল যে, যেহেতু তাঁদের কোভিড-১৯ সংক্রমণের জন্য দায়ি করা হচ্ছে সেহেতু যেকোনো মুহূর্তে তাঁদের গ্রেপ্তার করে দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে। অভিবাসীরা তাঁদের পরিবারকে জানিয়েছিল যে কোভিড-১৯ বিস্তারে তাঁদের হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

খলিলুর রহমান (৩০) দুবাইয়ের একটি ওয়েল্ডিং কোম্পানিতে চার বছর ধরে কাজ করছিলেন। কর্তৃপক্ষ লকডাউন ঘোষণা করলে সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি পাশের এক ফলের দোকানে কাজ করছিলেন। কারফিউ বিরতির সময়ও ফলের ওই দোকান চলত। কিন্তু পুলিশ তাঁর কর্মস্থলে অভিযান চালায়, তাঁকে গ্রেফতার করে এবং তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে। তাঁকে ২২ দিনের জন্য কারাগারে পাঠানো হয়েছিল, তারপরে তিনি নিজ দেশে ফিরতে পারেন। তারা যে দেশেই থাকুক না কেন, এই মহামারী পরিস্থিতিতে প্রত্যাবাসিত অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্দশার কাহিনী একইরকম। আব্দুর রহিম, বয়স ২৪, মালয়েশিয়ায় রাস্তা মেরামতের কাজ করতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে তিনি গৃহস্থালি সামগ্রী কেনার জন্য স্থানীয় বাজারে এলে একজন পুলিশ অফিসার এসে তাঁকে বলে যে তাঁর কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা দরকার। তাঁকে পুলিশের গাড়িতে উঠতে বলা হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে কিন্তু নেওয়া হয় কারাগারে। খালি হাতে দেশে ফেরত পাঠানোর আগে তাঁকে পাঁচ দিন আটক করে রাখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'পুলিশ আমাকে ফেরত পাঠিয়েছে অথচ আমার ওয়ার্ক পারমিট ছিল, বৈধ ভিসা ছিল। আমি তাঁদের অনুরোধ করলাম, কিন্তু তারা শুনল না। তাঁদের মন গলানো যায়নি। আমার সমস্ত কাগজপত্র হালনাগাদ থাকা সত্ত্বেও আমার সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছিল। অধিকাংশ বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক একই রকম অবস্থায় পড়েছিল। আসলে আমাদের দেখার কেউ নেই, না আমাদের দেশের সরকার না মালয়েশিয়ার সরকার'।

সুব্রামানিয়াম (২০২০) দেখেছেন যে অভিবাসী শ্রমিকেরা কোভিড-১৯ এর সময় উপসাগরীয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ক্রমাগত জাত্যাভিমানগত কুসংস্কার ও বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছিল। তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে উপসাগরীয় দেশগুলিতে কিছু গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা জাতবিদ্বেষমূলক বিবৃতি দিয়েছেন। সৌদি তেল জায়ান্ট, আরমাকো কোম্পানিতে কর্মরত একজন দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী শ্রমিককে সার্জিক্যাল মাস্ক পরে মানুষ-সমান আকারের স্যানিটাইজার নিয়ে ঘুরতে দেখা যায়। এবং মনে হয় তিনি আরামকোর কোনো একটি ভবনের ভেতরে ও বাইরে কর্মকর্তাদের পরিচ্ছন্নতা সেবা বিতরণ করছিলেন। সুব্রামানিয়াম মালয়েশিয়ায়ও এরকম জাতিবিদ্বেষী দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছেন। এর মধ্যে ছিল একজন সিনিয়র মন্ত্রীর বিবৃতি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, কোভিড-১৯ এর সময়ে অভিবাসীদের খাওয়ানোর দায়িত্ব তাঁদের নিজ দেশের দূতাবাসের নেওয়া উচিত। যাইহোক, বাস্তবে মালয়েশিয় কর্তৃপক্ষ কিছু জায়গায় অভিবাসীদের খাদ্য সরবরাহ করেছিল। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে বিদ্বেষমূলক আওয়াজ ছিল যে সরকারকে কেন এই শ্রমিকদের খাদ্য সরবরাহ করতে হবে (সুব্রামানিয়াম, ২০২০)।

কুয়েতের একজন সুপরিচিত অভিনেত্রী হায়াত আল-ফাহাদ, একটি টিভি চ্যানেলে বলেছিলেন যে কুয়েতিদের জন্য হাসপাতালের শয্যা সংরক্ষিত রাখতে অভিবাসীদের 'মরুভূমিতে' বহিষ্কার করতে হবে (এই অভিবাসীরাই কুয়েতের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)। কুয়েতের সংসদ সদস্য সাফা আল-হাশেমও একই ধরনের বক্তব্য

দিয়েছেন। তিনি দেশটিকে 'শুদ্ধ' করার জন্য অভিবাসীদের বহিষ্কারের আহ্বান জানিয়েছেন (বাট্টা, ২০২০)। সামাজিক দূরত্ব পালন না করায় ভাইরাস ছড়িয়েছে বলে সৌদি আরবে কেউ কেউ অভিবাসীদের দোষী করেছেন। আল ইউর্ম পত্রিকায় সংবাদ এসেছে যে, আল খোবার প্রদেশের সৌদি নাগরিকেরা বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের প্রতি ঘৃণা অনুভব করেন। তাঁদের মতে 'অভিবাসী শ্রমিকদের' উপস্থিতি সমস্যা সৃষ্টি করছে এবং এর সমাধান অবশ্যই হওয়া উচিত। অভিবাসীরা স্বাস্থ্য নির্দেশনা যেমন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরা বা হস্ত প্রক্ষালন মানছে না। সৌদিরা সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি বিতাড়নসহ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। কোভিড-১৯ এর শুরুর মাসগুলিতে ঘৃণাত্মক বক্তব্যও অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ৫ : বাংলাদেশের বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর অভিবাসীদের সঙ্গে আচরণ

অভিবাসীদের জরুরি পরিস্থিতিতে প্রত্যাবর্তন সামলানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) রয়েছে। ১৯৯০ এর ইরাক/কুয়েত যুদ্ধ, ২০০২-০৩ সালের সার্স ভাইরাসের সংক্রমণ এবং লিবিয়ায় গৃহযুদ্ধের সময় (২০০৪ থেকে চলমান) এ ধরনের জরুরি প্রত্যাবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল। তবুও, করোনাভাইরাসের বিস্তার দেখিয়ে দিয়েছে, স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলার জায়গা থেকে বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের নতুন ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (এমওএইচএফডব্লিউ) নির্দেশনা অনুসারে, জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীরা নিজেরাই কোয়ারান্টিন পালন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে প্রথমে বিমানবন্দরে স্ক্রিনিং অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর পরে কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা না গেলেও অভিবাসীদের হজ্ব ক্যাম্পে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারান্টিনে রাখা হয়েছিল এবং শুধুমাত্র সংক্রমিত হওয়া অভিবাসীদের পাঠানো হয়েছিল নির্ধারিত হাসপাতালে। যাইহোক, স্বেচ্ছা-কোয়ারান্টিন দুর্বলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার কারণে এবং মিডিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট ভয়ের ফলে কোয়ারান্টিনের প্রয়োগ আরো কঠোর করা হয়।

অভিবাসী শ্রমিকেরা চরম সংকটে পড়ে দেশে ফিরে নিজ দেশের বিমানবন্দরে মিশ্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় এবং তাঁদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। ফিরে আসা ১০০ জন অভিবাসীর মধ্যে ৮৭ শতাংশ জানিয়েছেন, বিমানবন্দরে গড়ে তাঁদের সাড়ে ৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়েছিল। এমনকি কাউকে কাউকে ৯ ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কেবল রুটি ও কলা সরবরাহ করেছিল। এমনকি পানীয় জলও পাওয়া যেত না। ক্ষুধার্ত অবস্থায় অনেককে বিমানবন্দরের ভেতরের দোকান থেকে খাবার কিনতে হয়েছিল, আর সেখানকার দাম ছিল খুবই বেশি। এভাবে, অপেক্ষার সময় অভিবাসীদের মানানসই খাবারের প্রয়োজন ছিল। কাতার থেকে ফিরে আসা চুয়াল্লিশ বছর বয়সী মনির বলেন, 'আমাদের বিমান ভোর ৪ টায় বাংলাদেশে অবতরণ করে। সকাল ৯ টার দিকে আমাদের রুটি ও কলা খেতে দেওয়া হলো। পরীক্ষার জন্য আমাদের বিমানবন্দরেই রাখা হয়েছিল। বিকাল ৪ টার আগে আমি বিমানবন্দর থেকে বের হতে পারি নি। ভয়াবহ ক্ষুধার্ত লাগছিল। আমি শুনেছি যারা আগে এসেছিল তারা বাড়ি ফেরার জন্য ৫ হাজার করে টাকা পেয়েছিল। আমরা এত ভাগ্যবান ছিলাম না'। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রত্যাবাসিত একজন অভিবাসী নুরুল আলম বলেছিলেন যে বিমানবন্দরে অভিবাসীদের সাথে আনুষ্ঠানিকতা সারার বেলায় উন্নতির অনেক জায়গা রয়েছে। বিমানবন্দরে কর্মকর্তাদের মনোভাব ও শারীরিক ভাষা দেখে খলিলুর রহমান হতাশ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তারা আমাদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেন ফিরে আসা অভিবাসীরা তাঁদের ভাইরাসে আক্রান্ত করতে পারে'। বিমানবন্দরে,

অভিবাসীরা কোনো কোভিড পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাননি। বেশ কয়েকজন অভিবাসী বলেছেন তাঁদের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য যে স্ক্যানার ব্যবহার করা হয়েছিল তা কাজ করছিল না। কিন্তু বেশিরভাগ অভিবাসী জানিয়েছেন, তাঁদের শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয়েছে। ২৮ বছর বয়সী হাসানুজ্জামান মালয়েশিয়া থেকে ফিরে আসা একজন অভিবাসী। তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা বেশি; অতএব, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটি আলাদা ঘরে রাখেন, এবং পরে তাঁকে ছেড়ে দেন। তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে হাজী ক্যাম্পে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বেশিরভাগ প্রত্যাবাসী অভিবাসী আরও জানিয়েছেন যে, নিরাপত্তার অংশ হিসাবে তাঁদের ১৪ দিনের জন্য বাড়িতে আলাদা অবস্থায় থাকতে বলা হয়েছিল। কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একটি যোগাযোগ নম্বরও দেওয়া হয়েছিল।

সৌদি আরব থেকে ফেরত আসা ২৫ বছর বয়সী প্রবাসী সাইফুল ইসলাম জানান, বিমানবন্দরের চিকিৎসক যখন সন্দেহ করেন যে তাঁর করোনা ভাইরাস রয়েছে, তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাজী ক্যাম্পে পাঠানো হয়। সেখানে চারিদিকে মশা-মাছির বিস্তার ছিল এবং তাঁকে ওই অবস্থায় সেখানে ১৪ দিন যন্ত্রণা নিয়ে কাটাতে হয়েছিল। তিনি আরও দাবি করেন, হাজী ক্যাম্পে কয়েকজন প্রত্যাবাসী ২ দিনের বেশি থাকেননি এবং তারা ক্যাম্প ছাড়ার জন্য প্রহরীদের ঘুষ দিয়েছিলেন। কিন্তু খালি হাতে ফিরে আসার জন্য তিনি অন্যদের মতো কষ্টকর ১৪ দিনের কোয়ারান্টিন থেকে পালানোর ব্যবস্থা করতে পারেননি।

এপ্রিল ও মে মাসে আসা অভিবাসীরা সরকারের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা (৬০ মার্কিন ডলার) করে পেয়েছেন। এই গবেষণার জন্য যেসকল জোরপূর্বক প্রত্যাবাসিতরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাঁরা ফিরেছেন সরকারি স্কিম শেষ হওয়ার পরে। এঁদের ছাব্বিশ জনকে বেসরকারি সংস্থাগুলি থেকে খাদ্যের প্যাকেজ ও যাত্রার খরচ হিসেবে ২ হাজার (২৩ মার্কিন ডলার) করে টাকা দেওয়া হয়েছিল।

অভিবাসী শ্রমিকেরা দেশে ফিরে এলে সাধারণত তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে আসে। এবারের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। লকডাউনের কারণে কারো পক্ষে বিমানবন্দরে আসা ছিল অসম্ভব। প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের জন্য প্রধান সমস্যা ছিল যে তাঁদের যে গ্রাম; সেখানে পৌঁছানোর জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল কিন্তু লকডাউনের জন্য পরিবহন সুবিধা ছিল দুর্লভ। তারা এ ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকেও কোনও সহায়তা পায়নি। ফলে গাড়ির চালকদের বাড়তি অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল। উত্তরদাতাঁদের মধ্যে একজন হলেন লতিফ, তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ফিরেছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে ড্রাগ দেওয়া হয়। দুই দিন পর তিনি বাড়িতে পৌঁছান। তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিজেকে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন এবং তার যা কিছু ছিল সবই খোয়া গেছে।

গ্রামে যখন তারা ফিরল, তারা দেখেছিল যে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চোখে-মুখে উদ্বেগ। মালয়েশিয়া থেকে ফিরে আসা ২৬ বছর বয়সী সাগর হোসেন জানিয়েছেন, তিনি ফিরে এলে তাঁর পরিবারের আচরণ ছিল অদ্ভুত। তারা ভয় পাচ্ছিল যে তিনি হয়তো কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রমিত হয়েছেন। পরিবারের এমন আচরণে তিনি মানসিকভাবে খারাপ বোধ করেছিলেন।

জোরপূর্বক প্রত্যাবাসন প্রায়ই অভিবাসীদের দুর্ভোগের উৎস। পাশাপাশি, এটি তাঁদের সমাজের মানসিক সুস্থতার ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে (বিরুপাক্ষ, কুমার এবং নির্মলা, ২০১৪: ২৩৩)। মানসিক সহায়তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য ও ভাল-থাকা বিষয়ে স্থানীয় রীতি ও জ্ঞানের অভিযোজন পারে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও সমাজকে এই ধরনের চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করতে। এর মাধ্যমেই তারা আক্রান্ত হওয়া নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি থেকে

সক্রিয় জয়ী হিসেবে নিজেদের রূপান্তরিত করে নিতে পারে (আইএফআরসি, ২০২০)। খালি হাতে ফিরে আসা একশত অনিচ্ছুক প্রত্যাবাসীদের ৯২ শতাংশই বিমানবন্দরে বা কমিউনিটি পর্যায়ে কোনো মানসিক-সামাজিক মদদ বা পরামর্শ পাননি। যদিও মানসিক চাপ ও ধাক্কা সামলাতে প্রাথমিকভাবে অভিবাসীদের জন্য এরই প্রয়োজন ছিল। ২ নারী অভিবাসীসহ মাত্র আটজন প্রত্যাবাসিত অভিবাসী জানিয়েছেন যে তাঁরা একটি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) থেকে পরামর্শ পেয়েছেন। সুমি খাতুন জানান, কাউন্সেলিং পাওয়ার পর তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছিলেন কিন্তু পরে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে আবার হতাশ হয়ে পড়েন।

অনুচ্ছেদ ৬ : নিরাপত্তায়ন প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের পরপরই, ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াগুলি এমন খবর প্রকাশ করতে থাকে যে অভিবাসীরা কোভিড-১৯ ছড়িয়ে দিচ্ছে। ক্রমবর্ধমান হারে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে ভাইরাস আনার অভিযোগ আনা হয়। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া উভয়ই অভিবাসী গোষ্ঠীর ওপর নিরাপত্তায়নের নেতিবাচক পরিণতি বুঝতে না পেরেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে ভুল তথ্য প্রচার করে। কিছু এলাকা ও সমাজে অভিবাসীদের 'বিপজ্জনকভাবে সংক্রামিত মানুষের' তকমা দিয়ে দেওয়া হয়। এমন খবরও মেলে যে কিছু এলাকায় লাল পতাকা তুলে দিয়ে সেটাকে অভিবাসীদের বাড়ি তথা ভাইরাস আক্রান্ত বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়।

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের পর ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখার স্বার্থে কর্তৃপক্ষের থেকে রেডিও/টিভিতে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, সাধারণ মানুষ যেন সদ্য বিদেশ থেকে আগত কোনো ব্যক্তির সাথে দেখা হলে তা জানায়। এটি স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল এবং তারা মনে করেছিল অভিবাসীরা ভাইরাসের বাহক। অভিবাসীরা কিছু এলাকায় 'বিপজ্জনকভাবে সংক্রমিত মানুষ' হিসেবে চিহ্নিত হয়। পৃথকীকরণ নিশ্চিত করার জন্য, কর্তৃপক্ষ অভিবাসী বাড়িগুলিকে লাল পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করে। এর ফলে সেসব পরিবার পরিষেবা প্রদানকারীরা যেমন দোকান, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যেসব পরিবারে কোনো অভিবাসী ফিরে এসেছিল তাঁদের জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কিছু জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীরা দুর্ব্যবহার এবং বৈষম্যেরও শিকার হয়েছিল। রামরু(২০২০) একটি ঘটনা উল্লেখ করেছে, যেখানে অভিবাসীরা শারীরিক আক্রমণ এবং চাঁদাবাজির সম্মুখীন হয়েছিল। অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলি নীতিনির্ধারকদের সামনে বিষয়টি নিয়ে আসে এবং কর্তৃপক্ষ খুব দ্রুত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিরাগ তৈরি করে এমন টিভি/রেডিও/পাবলিক সার্ভিসের ঘোষণা পরিবর্তন করে।

স্থানীয় পর্যায়ে হয়রানি: জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় মে-জুলাই ২০২০ সময়কালে। ততদিনে অভিবাসীদের নিরাপত্তায়নের নেতিবাচক কথাবার্তা লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে এসেছে। জরিপের তথ্যের মধ্যেও এটি প্রতিফলিত হয়। মোট ৮৮ জন উত্তরদাতা তাঁদের এলাকায় কোনো হয়রানির সম্মুখীন হননি। মাত্র ১২ জন উত্তরদাতা মৌখিক এবং অন্যান্য ধরনের দুর্ব্যবহারের মুখোমুখি হয়েছেন। কয়েকজনকে দোকানদারেরা তাঁদের দোকানে প্রবেশ করতে নিষেধ বলেছিল। মোহন আলী বলেছিলেন যে, কোয়ারেন্টাইন শেষ করার পরেও তিনি কেনাকাটার জন্য কোথাও যেতে পারেননি। ২৫ দিন পরে তিনি বাইরে গেলে পাড়ার লোকেরা তাঁকে হুমকি দেয়। পরে তাঁকে নিজের নিরাপত্তার জন্য পুলিশকে জানাতে হয়। ডাক্তারের চূড়ান্ত পরীক্ষার পরে তিনি স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াতে পারেন। কিছু অভিবাসী অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের প্রতিবেশী এবং স্থানীয় সমাজ তাঁদের দিকে আড়চোখে তাকিয়েছিল এবং তাঁদের মৌখিকভাবে গালি দিয়েছিল।

অনেকে বাজে ভাষায় কথা বলেছিল এবং ফিরে আসা অভিবাসীদের কোভিড-১৯ এর বাহক হিসাবে বর্ণনা করেছিল।

কুয়েত থেকে ফেরত আসা ৪০ বছর বয়সী শিমুল হোসেন জানিয়েছেন, কোয়ারেন্টাইন পর্ব শেষ হয়ে গেলেও, স্থানীয় প্রশাসনের একজন সদস্য তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাকে আবার কোয়ারেন্টাইন পালন করার জন্য চাপ দেন। তিনি তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে রাজি না হলে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা তাঁকে হুমকি দেয়। ৫৭ বছর বয়সী কাজী মনসুর খৈয়ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যাবাসিত একজন অভিবাসী। তিনি বলেছেন, তাঁর বোনের সাথে দেখা করতে গেলে প্রতিবেশীদের একজন তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল। তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। তিনি আরও বলেছিলেন, 'বিদেশে শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভোগার পর, দেশে এসে কোয়ারেন্টাইন শেষ করার পরও আপন আত্মীয়ের বাড়িতে একইরকম হয়রানির শিকার হওয়া মানসিকভাবে খুবই বেদনাদায়ক'। এই অভিজ্ঞতাগুলি বোঝায় যে অভিবাসী শ্রমিকেরা যে বৈষম্য ও কলঙ্কায়নের শিকার হয়েছেন তা কীভাবে কমানো যায় তা নিয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব ছিল। রামরু প্রতিবেদন দেখিয়েছে যে গণমাধ্যম বিষয়টি সংবেদনশীলতার সাথে তুলে ধরতে পারেনি। প্রাথমিকভাবে, ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া উভয়ই বারবারই প্রচার করেছে যে, ফিরে আসা অভিবাসীরাই হলো সারা দেশে ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার উৎস।

সাক্ষাৎকারের তথ্যগুলিও দেখায়, অভিবাসীদের ১৪ দিনের জন্য কোয়ারান্টিন পালনের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের ৮৫ শতাংশই তা মেনে চলেন। সেলিম বলেছিলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্যই কোয়ারেন্টাইন বজায় রাখার দরকার বোধ করেছি। ইউএনও-র দপ্তরের একজন ব্যক্তি আমার বাড়িতে এসেছিলেন। যে, আমি সরকারি আদেশ অনুসরণ করছিলাম কি না। হয়রানি বা ভয় থেকে নয়, আমি আমার পরিবারের নিরাপত্তার কারণেই তা মেনে চলেছিলাম'। যেসব অভিবাসী সবসময় সরকারের নিরাপত্তা নির্দেশনা মেনে চলতে পারেননি তাঁরা তা পারেননি মূলত বেঁচে থাকার জন্য আয়ের সংস্থান করতে গিয়ে। সবুর মিয়া বলেছিলেন, 'আমি যদি বাড়িতে বসে থাকতাম, তাহলে পরিবারের খাবার জোগানোর কোনো উপায় হতো না। সেই সময় আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল আমার পরিবারের সদস্যদের বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্য উপার্জন করা। তিনি সাক্ষাৎকারের সময় ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'আয় না থাকলে আমি কীভাবে কোয়ারেন্টাইন বজায় রাখতে পারি? আমি কোনো কাজ না করে বাসায় থাকলে খাবার কোথা থেকে আসবে? এই কোয়ারেন্টাইন-ফোয়ারেন্টাইন আমার জন্য মজার শব্দ এবং অকেজো'। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে সামাজিক সুরক্ষা নীতি ছাড়া, কোনো সহায়হীন ব্যক্তি বা প্রত্যাবাসিতদের মতো ক্ষতিগ্রস্থ কাউকে আইন পালনে রাজি করানো কঠিন। পরিবারের সদস্যদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা আর সকল কিছুর চাইতে বড়। এখান থেকেই আমরা পরের অনুচ্ছেদে প্রবেশ করবো, যার বিষয় হলো অভিবাসীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ওপর হুমকি।

অনুচ্ছেদ ৭: অভিবাসীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার হুমকি

জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীরা দুই ধরনের নিরাপত্তাহীনতার কথা তুলে ধরেছিল। এগুলো হলো মানসিক নিরাপত্তাহীনতা এবং আয়ের নিরাপত্তাহীনতা। জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের ৮৪ শতাংশ এবং বর্তমানে অভিবাসী পরিবারের রেখে আসা সদস্যরা সামাজিক ও আয়ের নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসী শ্রমিক ছিলেন যাঁর যাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী।

তাঁদের আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে পরিবারে উত্তেজনা বেড়েছে। এই কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে, স্থানীয় চাকরি দুষ্প্রাপ্য। এটি তাঁদের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলেছে। ফিরে আসা একজন নারী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন কারণ তাঁর পরিবারের সদস্যরা মনে করতেন যেখানে অন্য নারী অভিবাসীরা বিদেশে থেকে গেছে সেখানে তাঁর ফিরে আসা উচিত হয়নি। সেলিম এবং আরো অনেকে জানিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের আত্মীয় এবং স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করে সংসার চালাচ্ছেন। মাত্র কয়েকজন তাঁদের সঞ্চয় থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। লকডাউন পরিস্থিতিতে চাকরি পাওয়া কঠিন হবে। অভিবাসীরা শ্রেণী সচেতনও। কারণ বলেছিলেন, 'আমি যে কোনো চাকরি নিতে পারি না। চার বছর সৌদি আরবে কাটানোর পর সমাজে আমার একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে। আমি এর সাথে আপস করতে পারি না'। অভিবাসীরা ব্যাংক ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে আগ্রহী ছিল না। সবুর বলেন, সরকারি সংস্থা ওয়ারবি (WARBE) তাঁকে ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে বলেছিল। দীর্ঘদিন ধরে দেশের বাইরে থাকায় এবং এখনকার কৃষি ও অকৃষি উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় তিনি নতুন ব্যবসা শুরু করতে আগ্রহী ছিলেন না। যেহেতু বেশিরভাগ অভিবাসীরা নির্মাণ শিল্পে জড়িত ছিল সেহেতু তাঁদের পক্ষে ব্যবসা শুরু করা চ্যালেঞ্জের কাজ হতো। এছাড়া তাঁদের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। এইসব অনিশ্চয়তার কারণে, ফিরে আসা অভিবাসীদের ৮৬ শতাংশ জানিয়েছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে তারা আবার অভিবাসনের চেষ্টা করবে।

আয়-উপার্জন না থাকায় শিশুদের শিক্ষা এবং পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুমি খাতুনের ছেলে ইসমত চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত কিন্তু তার স্কুল ছিল বন্ধ। ইসমতের দেখাশোনা করতেন সুমির মা অর্থাৎ ইসমতের নানী। তিনি জানিয়েছিলেন যে মেয়ে রেমিট্যান্স পাঠাতে না পারায় গৃহশিক্ষকের কাছে ইসমতের পড়া বন্ধ করতে হয়েছিল। ওমর সিদ্দিকীর বাবার রক্তচাপের ওষুধ দরকার। তার আরও কিছু জটিলতা রয়েছে। তিনি জানেন না কীভাবে আগামী মাসের জন্য তাঁর বাবার জন্য ওষুধ কিনবেন। এটা স্পষ্ট যে অভিবাসীরা নিজেরা কোনো নিরাপত্তা হুমকি নয়; বরং তাঁরাই নিরাপত্তা হুমকির মুখে ছিল।

অধ্যায় উপসংহার

অধ্যায়টি এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে বাংলাদেশি অভিবাসীরা গন্তব্যের দেশগুলিতে এবং বাংলাদেশে ফিরে আসার পরও নিরাপত্তায়নের শিকার হয়েছিল। অধ্যায়টি নিরাপত্তায়নের মারাত্মক পরিণতিগুলি চিহ্নিত করেছে আর তা প্রকাশিত হয়েছে অভিবাসী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিয়ে।

এই অধ্যায়টি দেখায় যে অভিবাসীরা গন্তব্যের দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে কণ্ঠস্বরহীন মানুষ, এবং তাঁদের নিরাপত্তায়ন করা বেশ সহজ। গন্তব্য দেশগুলিতে মিডিয়ার মাধ্যমে অভিবাসীদের নিরাপত্তায়ন করা হয় এই বলে যে তারা কোভিড-১৯ ছড়ানোর অন্যতম প্রধান উৎস। মিডিয়া ফলাও করে প্রচার করেছে যে অভিবাসীরা লকডাউন পালনের কঠোর নির্দেশ মেনে চলছে না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ চাকরি, খাবার বা ঔষধ খুঁজতে তাঁদের বাসস্থান থেকে বেরিয়ে আসে। টিকে থাকার এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে গন্তব্য দেশের নাগরিকদের ভাইরাসের কাছে অনিরাপদ করে তোলার আচরণ হিসেবে দেখা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর সময় চার লাখেরও বেশি শ্রমিককে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্তকে জায়েজ করতে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেছে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলি।

দুর্ভাগ্যবশত, গন্তব্যস্থল ছেড়ে চলে এলেও অভিবাসীদের নিরাপত্তায়ন শেষ হয়নি। তারা তাঁদের স্বদেশেও বক্তব্যের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার মাধ্যমে একই ধরনের নিরাপত্তায়নের মুখোমুখি হয়েছিল। বিমানবন্দরে সরকারি

কর্মচারীরা অভিবাসীদের পরিষেবা দেওয়ার সময় সংক্রমণের ভয় ও সন্দেহের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বিমানবন্দরের কয়েকজন কর্মকর্তা এমন মন্তব্যও করেছিলেন যে, এই স্বল্প শিক্ষিত অভিবাসীরা অন্যদের নিরাপত্তার পরোয়া করে না, তারা সরকারি লোকজনকেও বিপদের মধ্যে ফেলছে। তাঁদের অভিব্যক্তির প্রকাশ ছিল এমন যে, অভিবাসীদের প্রত্যাবর্তন দেশটিকে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

গ্রামে ফিরে আসার পর অভিবাসীরা দেখেন, স্থানীয়রা তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করছে না। প্রথম দিকে, তাঁদের মৌখিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্থানীয় বাজারে প্রবেশাধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল। কয়েক মাস পরে, স্থানীয়দের মনোভাব কিছুটা হলেও বদলায়। জুন মাসের পরে আসা অভিবাসীরা তাঁদের পূর্বসূরিদের মতো করে স্থানীয় জনগণের হিংসাত্মক আচরণের মুখোমুখি হননি। তা সত্ত্বেও, স্থানীয় জনগণ, রাজনীতিবিদ এবং সরকারী কর্মীরা বেশ কিছু অভিবাসী পরিবারের ওপর তাঁদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অপব্যবহার করেছে। অযৌক্তিকভাবে কঠোর নজরদারির কারণে কারও কারও জন্য দৈনন্দিন সামগ্রী পাওয়াতেও সমস্যা হয়। এটা এত দূর পর্যন্ত গিয়েছিল যে, ফিরে আসার পর একজন অভিবাসীকে আবারো ২৫ দিনের জন্য কোয়ারান্টিনে যেতে বলা হয়েছিল।

কিছু ক্ষেত্রে, অভিবাসীরা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া আচরণেও দুঃখ পেয়েছিলেন। তাঁরা মৌখিকভাবে কিংবা তাঁদের শারীরিক ভঙ্গিমার মাধ্যমে তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই মূল উদ্বেগ অবশ্যই আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা ছিল, তা সত্ত্বেও পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই বুঝতে পারতেন না যে প্রত্যাবর্তনের সময় অভিবাসীরা যে মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে কী করা উচিত।

সাক্ষাৎকারের সময়ও কোভিড-১৯ অভিবাসীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। চাকরির ও আয়ের অভাব অভিবাসী পরিবারের মানুষের নিরাপত্তাহীনতার প্রধান উৎস ছিল। বেশিরভাগ অভিবাসী পরিবারের জন্য দিনের পর দিন জীবনধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ছিল। তাঁদের দিনানুদিনের প্রয়োজন মেটানোর প্রধান উপায় হয়ে উঠেছিল টাকা ধার করা। খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমানোর পাশাপাশি, বিদ্যালয়গামী শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে আপোস করা হয়েছিল। প্রবাসী পরিবারগুলি গৃহশিক্ষক রাখা বন্ধ করে দেয়। বিশেষ করে বয়স্ক সদস্যদের পরিবারের স্বাস্থ্যসেবাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অনেক পরিবারের জন্যই ঔষধ কেনা হয়ে দাঁড়ালো কঠিন এক চ্যালেঞ্জ

অধ্যায় ছয়

ব্যবধান সম্পর্কে বোঝাপড়া: জাতীয় পরিসংখ্যান এবং খানা পর্যায়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ

সেলিম রেজা, তাসনিম সিদ্দিকী, ইয়ার মাহবুব চৌধুরী ও সায়রা আফরিন

পরিবারে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে আসার কারণে কোভিড-১৯ অভিবাসী ও তাঁদের পরিবারের ওপর বিরাট ও অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অভিঘাত নামিয়ে এনেছে। এই প্রেক্ষিতে কোভিড-১৯ রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারের ওপর যে প্রভাব ফেলেছে তা পরীক্ষা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এটা করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অভিবাসী পরিবার থেকে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে। অভিবাসী পরিবারের সদস্যদের বয়ানের সঙ্গে পরিসংখ্যানগত তথ্যের ব্যাখ্যার তুলনার মাধ্যমে এই অধ্যায়ে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে যে, রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ অংকের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে অভিবাসী পরিবারে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের বাস্তবতার মিল নেই। দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ অনেক কারণে বেড়েছে এবং এর অর্থ এই নয় যে বেশিরভাগ অভিবাসীর আয় রেমিট্যান্স প্রেরণের জন্য যথেষ্ঠ ছিল।

এই অধ্যায়টি ছয়টি ভাগে বিভক্ত। এই ভূমিকার পর, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে গৃহস্থলীর খাদ্য এবং অন্যান্য রকমের ভোগের খরচে রেমিট্যান্সের ভূমিকা সম্পর্কে লেখালেখির পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে কোভিড-১৯ এর সময় রেমিট্যান্স প্রবাহের বৈশ্বিক দৃশ্যপট এবং ২০২০ সালে বিভিন্ন বহুপক্ষীয় সংস্থাগুলির পূর্বাভাসের ওপর। ২০২০ সালে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের জাতীয় পরিসংখ্যান উপস্থাপন করার পাশাপাশি কিছু নির্বাচিত অভিবাসী পরিবারের রেমিট্যান্স পাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অনুচ্ছেদে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে হ্রাসকৃত রেমিট্যান্স প্রবাহের কারণে পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির হাল, সন্তানদের শিক্ষা, ঋণ পরিশোধ এবং পরিবারের সদস্যদের বিদ্যমান স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব আলোচিত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ছয়ে জাতীয় পর্যায়ে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধির পরিসংখ্যানের সঙ্গে খানা পর্যায়ে কমে আসা রেমিট্যান্সের মধ্যে ব্যবধানের কারণ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। সপ্তম অনুচ্ছেদে মূল মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে এবং সামনে আনা গেছে কিছু সুপারিশ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ লেখালেখি পর্যালোচনা

আন্তর্জাতিক অভিবাসন এবং রেমিট্যান্স প্রেরণকে আলাদা করা যায় না। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ফলে শ্রমিকপ্রেরক ও গ্রহীতা উভয় দেশের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়ে। অভিবাসী শ্রমিকেরা তাঁদের পরিবারে যে অর্থ ও পণ্য পাঠায় তা-ই সাধারণত রেমিট্যান্স হিসাবে পরিচিত হয় (অ্যাডামস এবং কিউকুয়েচা, ২০১০)। রেমিট্যান্সের জাতীয়, স্থানীয় এবং পারিবারিক স্তরে বিস্তৃত আকারের প্রভাব রয়েছে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইতিবাচক। রেমিট্যান্স একটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সাহায্য করে, বাড়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্তর, এবং উৎসাহিত করে ভোগ। উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে, অভিবাসন ও রেমিট্যান্স পরস্পর জড়িত। গন্তব্য দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই তিনটি শর্তের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আন্তর্জাতিক অভিবাসন (অ্যাডামস অ্যান্ড পেজ, ২০০৫)। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অর্থনৈতিক দিক। প্রেরক ও গ্রহীতা উভয় দেশের জন্য অভিবাসন অর্থনৈতিক কল্যাণ নিয়ে আসে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সম্পদ হস্তান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হয়ে উঠেছে রেমিট্যান্স (অ্যাডাম অ্যান্ড কিউয়েকা, ২০১০)।

দেখা গেছে যে, অভিবাসন বৃদ্ধির কারণে ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে নেপালে দারিদ্র্য ২০ শতাংশে নেমে এসেছে, যদিও অভিবাসন ব্যতিরেকে এই হার ৩০ থেকে ৩৪ শতাংশ বেড়ে যাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছিল (লোকশিন, বন্টচ-ওসমোলোভস্কি এবং গিণ্ঢনস্কায়া, ২০১০)। নিশ্চিতভাবেই এটা রেমিট্যান্সের ইতিবাচক প্রভাবের প্রতিফলন। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। লাতিন আমেরিকায়, আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স দারিদ্র্য কমিয়েছে ০.৪ শতাংশ (অ্যাকোস্টা, ফাজনজিলবার এবং লোপেজ, ২০০৭)। এই ধরনের কেস স্টাডি বা বাস্তব উদাহরণগুলি হলো একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স ও অভিবাসনের ইতিবাচক প্রভাবের প্রমাণ। কিছু দেশে রেমিট্যান্স ওই দেশের মোট জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশেরও বেশি হতে পারে। দারিদ্র্য হ্রাসে অন্যান্য পথে পুঁজিপ্রবাহের তুলনায় রেমিট্যান্স আরো বেশি স্থিতিশীল এক উৎস (জাতিসংঘ, ২০১০)। দারিদ্র্য হ্রাস বিভিন্ন ভাবেই ঘটতে পারে কিন্তু এর অন্যতম এক মূল কার্যকারক হলো রেমিট্যান্স।

অভিবাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থার (আইওএম, ২০১৭) মতে, ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ১৫০.৩ মিলিয়ন বা ১৫ কোটি তিরিশ লাখ (পুরাতন তথ্য) এবং ২০১৬ সালে মোট ৪২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স হিসেবে উন্নয়নশীল দেশে এসেছিল। শ্রমিক প্রেরণকারী দেশগুলির দিক থেকে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য রেমিট্যান্সের গুরুত্বই খুবই নির্ধারক। ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহের সাধারণ প্রবণতা দেখায়, এই দেশগুলি তাঁদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, বৈদেশিক সঞ্চয় ও সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যাপকভাবে রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল। দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের জিডিপির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো রেমিট্যান্স। ২০১৭ সালে নেপালের জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অনুপাত ছিল ২৮ শতাংশ। এটা দেশটিকে বৈশ্বিকভাবে শীর্ষ পাঁচ জিডিপি-রেমিট্যান্স অনুপাতের দেশের একটিতে পরিণত করেছে। একইভাবে, রেমিট্যান্স-টু-জিডিপি অনুপাত বাংলাদেশে ১১ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ৯ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ৭ শতাংশ বিশ্বব্যাংক, ২০১৯)। বিশ্বের ১৬০ টি দেশে প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি বাস করে। এদের অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে কম বেতনের অভিবাসী শ্রমিক, যারা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আনায় অবদান রাখে। রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং রপ্তানি আয়ের পরে বৈদেশিক মুদ্রার দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস। ২০১৯ সালে

এর পরিমাণ ছিল মোট দেশজ উৎপাদনের ৫.৮ শতাংশ (জিওবি, ২০১৯)। শুধু রেমিট্যান্স পাওয়াই নয়, জাতিসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে যা অর্জনের আশা করছে সেই এসডিজি লক্ষ্যগুলি পূরণেও স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পাশাপাশি অভিবাসন অবদান রাখে বলে বিশ্বাস করে বাংলাদেশ সরকার (সিদ্দিকী, ২০১৬)।

সাধারণত, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণে পরিবারের সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য নির্ভরযোগ্য অর্থায়নের উৎস (গিউলিয়ানো এবং রুইজ-অ্যারাঞ্জ, ২০০৯)। এই বিবেচনায়, রেমিট্যান্স প্রবাসী পরিবারের অর্থায়নে বিশেষরকম অবদান রাখে এবং পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মান বাড়ায়। প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স, যার ৯০ ভাগের বেশি ব্যবহার করা হয় পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বাবদ কেনাকাটা ও ভোগে (লিপটন, ১৯৮০)। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে, প্রবাসী পরিবারের দৈনন্দিন খরচ পূরণের জন্য রেমিট্যান্স এক নির্ভরযোগ্য উৎস। গ্রামীণ বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রাপক এবং অ-প্রাপক পরিবারের মধ্যে খরচ এবং সঞ্চয়ের বেলায় আচরণের পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে হায়দার, হোসেন ও সিদ্দিকী (২০১৬) দেখতে পান, রেমিট্যান্স গ্রহণকারী পরিবারের মাসিক খরচ রেমিট্যান্সবিহীন পরিবারের তুলনায় গড়ে ৩২ মার্কিন ডলার বেশি। কীভাবে রেমিট্যান্স খরচের বা ভোগের ধরন বদলে দিচ্ছে, এই কেস স্টাডিগুলি তার প্রমাণ দেয়। যেসব পরিবার রেমিট্যান্স পায় তারা সাধারণত রেমিট্যান্স না-পাওয়া পরিবারের চেয়ে বেশি খরচ করে।

রেমিট্যান্স বিভিন্ন ভোগ-সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা হয় যেমন খাদ্য, খাদ্য বহির্ভূত সামগ্রী (পোশাক ও জুতা, পরিষেবা বিল, প্রসাধন এবং মনোহারি পণ্য, উৎসব ও দান, ভ্রমণ ও বিনোদন), আবাসন, টেকসই পণ্য (ফ্রিজ, টিভি, আসবাবপত্র, অলঙ্কার), কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, সোলার প্যানেল ইত্যাদি), চিকিৎসা, শিক্ষা এবং বিনিয়োগ খাত। এত সব খাতগুলির মধ্যে খাদ্যের পেছনেই রেমিট্যান্সের ব্যবহার হয় বেশি।

খাদ্যের পরে খাদ্য বহির্ভূত খাতে রেমিট্যান্স ব্যয় করা হয় প্রায় ২০.৭১ শতাংশ। রেমিট্যান্স থেকে বিনিয়োগ হয় সবচেয়ে কম; প্রায় ১.৫২ শতাংশ (কুমার, হোসেন ও ওসমানী, ২০১৮)। বাংলাদেশে প্রবাসী পরিবারের ব্যয়ের ধরনও দেখায় যে উল্লেখযোগ্য অনুপাতের রেমিট্যান্স অ-টেকসই জিনিসের পেছনে ব্যয় হয়। আর এসব জিনিস উৎপাদনে অ-প্রবাসী মানুষেরাই জড়িত। শেরা ও মেয়ার (২০১৩) দেখেছেন, স্থানীয়ভাবে করা খরচ অ-প্রবাসীদের কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি করে। তার একটা ইতিবাচক প্রভাব স্থানীয় সমাজে পড়ে। অভিজ্ঞতাজাত সাক্ষ্য থেকে নিশ্চিত করা গেছে যে, প্রবাসী পরিবার যা কেনাকাটা করে, তার কয়েকগুণ বেশি প্রভাব পড়ে অ-প্রবাসী পরিবারের আয়ের ওপর। এতে করে তাঁদের আয়ের সংস্থান হয়।

উন্নয়নশীল দেশে অভিবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ সরকারি উন্নয়ন সহায়তার চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি এবং তা প্রাপক দেশগুলির সার্বিক উন্নয়ন ও মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে (রথা, ২০১৬)। ক্ষুদ্র স্তরে (মাইক্রো লেভেলে) প্রবাসী শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিট্যান্সের ভূমিকাই প্রধান। রেমিট্যান্সের সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহারগুলির মধ্যে একটি হলো, অভিবাসী শ্রমিকের পরিবারের ঋণ পরিশোধের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। সাধারণত, অভিবাসী শ্রমিকেরা নতুন দেশে অভিবাসনের সময় বিপুল পরিমাণ ঋণের দায়ে পড়েন। কারণ বিদেশে যাওয়ার খরচ তাঁরা আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধার নিয়ে করেন। ক্যাসেলস ও মিলার (২০০৯) ব্যাখ্যা করেছেন যে যসব এলাকা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সাধারণত সেখানকার গরিবদেও চাইতে সেখানকার মধ্যস্তরের লোকেরাই বেশি অভিবাসী হয়। দেখা গেছে, ফিলিপাইনে পাঠানো রেমিট্যান্সের ৪৬ শতাংশই খরচ হয়ে যাচ্ছে পরিবারের ঋণ শোধ করার

জন্য (লোয়ে, ২০১২)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অভিবাসী কর্মীই পরিবারের আয়ের প্রধান জোগানদাতা। কিন্তু এমনটি না হলে অভিবাসনের জন্য করা ঋণের বোঝা পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণ হয়। রেমিট্যান্স ঋণ পরিশোধ করতে সাহায্য করে এবং পরিবারকে বোঝা থেকে মুক্তি দেয়। অভিবাসী শ্রমিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ঋণ পরিশোধের সংগ্রাম থেকে বাঁচায়।

তাছাড়া, রেমিট্যান্স বিশ্বব্যাপী শিশুদের শিক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। অ্যাডামস ও পেজ (২০০৫) অনুসারে দেখা গেছে, যে পরিবারগুলি রেমিট্যান্স পায় তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আবাসন খাতে বেশি ব্যয় করে। শিক্ষায় এই ব্যয় রেমিট্যান্স না-পাওয়া পরিবারের তুলনায় প্রায় ৪৫-৫৫ শতাংশ বেশি। শিক্ষায় রেমিট্যান্সের ইতিবাচক প্রভাব হ্যানসন ও উডরফের (২০০৩) গবেষণায়ও লক্ষ্য করা গেছে। লোপেজ কার্ডোভা (২০০৫) দেখিয়েছেন, মেক্সিকোতে শিশুদের স্কুলে উপস্থিতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে রেমিট্যান্স। হ্যাসনস ও উডরাফও (২০০৩) তা দেখিয়েছেন, বিশেষ করে ১০-১৫ বছর বয়সী বালিকাদের বেলায়। রেমিট্যান্সের কারণে একটা সময়ে শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা কমে। বিশ্বের অনেক অঞ্চল শিক্ষায় রেমিট্যান্সের ইতিবাচক প্রভাবের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। রেমিট্যান্স সম্ভবত দরিদ্রদের সম্পদ আহরণের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করায় সাহায্য করে বলে ধারণা করেছেন ক্যালেরো, বেদি ও স্প্যারো (২০০৯)। তাঁরা দেখিয়েছেন, রেমিট্যান্সের কারণে ইকুয়েডরের দরিদ্র শিশুদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা বাড়ছিল। ফিলিপাইনভিত্তিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে, রেমিট্যান্স পরিবারের আয় ও বিনিয়োগের ওপর অনেক ইতিবাচক প্রভাব ফেলে যা শিশুদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে সাহায্য করে (ইয়াং, ২০০৮)। এসব গবেষণার ভিত্তিতে দাবি করা যেতে পারে যে, রেমিট্যান্স বিশ্বজুড়ে শিশুদের শিক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। রেমিট্যান্স শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিই বাড়ায় না, রেমিট্যান্সের কল্যাণে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়াও কমে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে ধর্মীয় নিয়মকানুন তুলনায় আরো কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়, যেমন জর্ডানে; সেখানে মেয়েদের শিক্ষা বৃদ্ধির কৃতিত্বও রেমিট্যান্সের (Cagatay, Mert, Koska & Artal-Tur, 2019)|

রেমিট্যান্স উন্নত স্বাস্থ্যসেবাও নিশ্চিত করতে পারে, যেমন মা ও শিশুস্বাস্থ্যের বেলায়। উন্নয়নশীল দেশে অভিবাসী পরিবারে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা সেবা নিশ্চিত করার অন্যতম উপায় হলো রেমিট্যান্স। এর ফলে শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস পায় এবং মা ও শিশুর পুষ্টির অবস্থা উন্নত হয়। রেমিট্যান্স দিয়ে একবার সংসারের খাদ্য খরচ বৃদ্ধি করা মানে গর্ভবতী নারীদের পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তা, যা তার স্বাস্থ্য এবং ভ্রূণের বিকাশে প্রভাব ফেলে।

নবজাতকের কম ওজন শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। সেকারণেই গর্ভবতী মায়ের সঠিক পুষ্টি শিশু মৃত্যু কমানোর বেলায় গুরুত্বপূর্ণ। যখন স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বরাদ্দ অপ্রতুল, তখন উন্নয়নশীল দেশের জনগণ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়। এই ক্ষেত্রে, নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলির রেমিট্যান্সপ্রাপ্তি মূলত তাঁদের আয় বণ্টন বাড়ায় এবং তাঁদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ বাড়িয়ে দেয়।

অনুচ্ছেদ ৩: উন্নয়নশীল দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ নিয়ে উদ্বেগ

বৈশ্বিক দৃশ্যপট: কোভিড-১৯ মহামারী প্রবাসী শ্রমিকদের আয় এবং তাঁদের পরিবারের জন্য পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর থেকে ফিলিপাইন, তাজিকিস্তান এবং ব্রাজিলের মতো অনেক শ্রম-প্রেরক দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ দুই অঙ্ক পরিমাণ (অক্সফোর্ড বিজনেস গ্রুপ, ২০২০) কমে গিয়েছিল। বাস্তবে, ২০২০ সালের এপ্রিলে বিশ্বব্যাংক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ২০২০ সালের শেষ নাগাদ

নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে রেমিট্যান্স ১৯.২ শতাংশ কমে যাবে, যা হতে পারে ইতিহাসের সবচেয়ে খাড়াখাড়ি পতন। ভবিষ্যদ্বাণীটি মূলত এই আশঙ্কার উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিল যে অর্থনৈতিক মন্দা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি অনেক অভিবাসীকে বেকার করে দেবে অথবা কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। এই প্রেক্ষাপটে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল (মজুমদার ও প্রমুখ ২০২০; দাস, ২০২০)।

রেখে-আসা পরিবারগুলিতে রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাসের সম্ভাব্য প্রভাব: এটি ভালভাবেই স্বীকৃত যে রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাসের প্রভাব অনেক শ্রমিক প্রেরণকারী দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পড়বে। তাঁদের আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য বা ব্যালান্স অব পেমেন্ট নেতিবাচক হয়ে পড়তে পারে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এটি অভিবাসীদের রেখে আসা পরিবারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। অভিবাসী পরিবারের ওপর কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। কারণ এই বিষয়ে আমাদের খুব কম পরীক্ষামূলক গবেষণা রয়েছে। নেপাল, ফিলিপাইন এবং ভারতে অভিবাসী পরিবারের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কয়েকটি গবেষণা থেকে পারিবারিক আয়ে রেমিট্যান্সের অনুপাত এবং মহামারী চলাকালীন গৃহস্থালি ভোগ কমার বিষয়ে কিছু অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়।

বিস্টা ও প্রমুখ (২০২০) কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণায় কোভিড-১৯ এর অর্থনৈতিক প্রভাব এবং নেপালের অর্থনীতির সাথে এর সংযোগ তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণায়, লেখকেরা দাবি করেছেন যে অভিবাসী পরিবারে রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে কারণ নেপালি অভিবাসী শ্রমিকেরা মহামারী কালে স্বাভাবিক সময়কার মতো রেমিট্যান্স পাঠাতে পারেনি। চৌধুরী (২০২০) এবং কৈরালা ও আচার্য (২০২০) একই ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন, যেমন অভিবাসী পরিবারের আয় ও ব্যয় হ্রাস, যা নেপালের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিবর্তনের কারণে ভারতীয় অভিবাসী শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের আয় ও ব্যয় কমেছে, যেখানে কোভিড-১৯ তাঁদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য উদ্বেগ তৈরি করেছে (খান্না, ২০২০)। ফিলিপাইনে জিডিপির ৭০ শতাংশই হলো পারিবারিক খরচ। যেহেতু সেখানকার পারিবারিক ব্যয় রেমিট্যান্সের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, সেহেতু ফিলিপিনো অভিবাসী শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস এবং কর্মসংস্থানের অধোগতি পরিবারিক ভোগকে প্রভাবিত করেছিল (মুরাকামি, শিমিজুতানি ও ইয়ামাদা, ২০২০)। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে তৈরি হওয়া আকস্মিক অর্থনৈতিক মন্দা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৯১ মিলিয়নেরও বেশি আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের চাকরির নিরাপত্তা এবং সুস্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ফেলেছে (এডিবি, ২০২০)। বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও নেপালের মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে রেমিট্যান্সের প্রবাহ কমে যাওয়ায় অভিবাসী পরিবারের আর্থিক অস্থিতিশীলতা বেড়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪ : রেমিট্যান্স প্রবাহের পূর্বাভাস এবং বাস্তবতা

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী: ২০২০ সালের এপ্রিলে বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস ছিল যে চলমান মহামারীর কারণে ওই বছরে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ প্রায় ২২ শতাংশ কমে যেতে পারে (বিশ্বব্যাংক, ২০২০)। এশিয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের পূর্বাভাস ছিল যে রেমিট্যান্স প্রবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পাঁচটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতির মধ্যে থাকবে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশের রেমিট্যান্স তার ২০১৯-এর পর্যায় থেকে ২৭.৮ শতাংশ কমে যাবে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ১৫.৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে (এশিয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ২০২০)।

জাতীয় পর্যায়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ: দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন দেখা গেছে, বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে ২০২০ সালের প্রথম কয়েক মাসে। কিন্তু মে মাস থেকে এটা বাড়তে শুরু করে। এটি এমন হারে বাড়তে শুরু করে যে ২০২০ সালে বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২১.৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এটি আগের বছরের তুলনায় ১৮.৬ শতাংশ বেশি। বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র ভবিষ্যদ্বাণী অন্তত এই দফায় সত্য হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটে, এই অধ্যায়টি যে ব্যাপক গবেষণা-প্রশ্নের উত্তর দেবে তা হলো, জাতীয়ভাবে যখন রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ছে তখন অভিবাসী পরিবারে কেন তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না? সব অভিবাসী পরিবার কি রেমিট্যান্স পাচ্ছিল? নারী অভিবাসী পরিবারের কী হাল ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে, কোভিড-১৯ এর সময়ে ২০০ বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারের সাম্প্রতিক রেমিট্যান্স প্রবাহের বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যায়টি প্রণীত হয়েছে।

পারিবারিক পর্যায়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ: চিত্র ৬.১ দেখায় যে গবেষণার আওতায় থাকা ৬১ শতাংশ অভিবাসী পরিবার ২০২০ সালের মার্চ থেকে পরের তিন মাস কোনো রেমিট্যান্স পায়নি। ওই সময়ে মাত্র ৩৯ শতাংশ পরিবার রেমিট্যান্স পেয়েছে, যেখানে রেমিট্যান্সের গড় পরিমাণ ছিল ৫৩,৫০০ টাকা। প্রতিবেশী দেশগুলির মতো, যেমন ভারত, নেপাল ও ফিলিপাইনের মতো বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারগুলি লক্ষ্যণীয়ভাবে রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং মহামারী চলাকালে রেমিট্যান্সের প্রবাহ কমে আসায় তাঁদের আয়ের ক্ষতি যেমন হয়েছে তেমনি কমে গেছে নিজেদের খরচের পরিমাণ।

চিত্র ৬.১: পরিবার পর্যায়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ

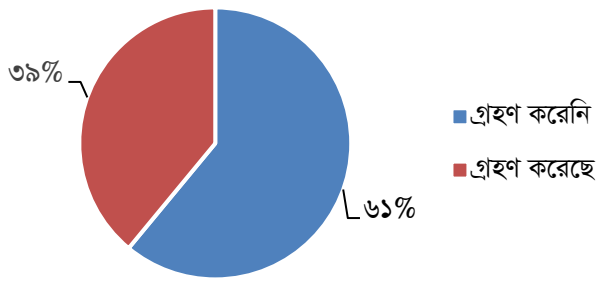

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

অভিবাসী শ্রমিকের ছেলে মজনু উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র। তার বাবা ওমানে ছয় বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেন। সাক্ষাৎকারের সময় মজনু জানায়, পরিবারে তার দাদা, মা, নয় বছরের ভাই এবং চার বছরের বোনসহ ছয়জন সদস্য আছে। পরিবারের মৌলিক চাহিদা ও দৈনন্দিন খরচ মেটাতে তার বাবার পাঠানো রেমিট্যান্সই ছিল আয়ের একমাত্র উৎস। মজনু বলেছে, 'কোভিড-১৯ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দুর্দশা নিয়ে এসেছে। আমার বাবা গত তিন মাস ধরে বেকার এবং তিনি রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছেন না। এই অবস্থায় টিকে থাকা এখন খুব কঠিন।' এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, কোভিড-১৯ এর কারণে অভিবাসী শ্রমিক রেমিট্যান্স পাঠাতে না পারলে পরিবারের সদস্যদের কেমন নিম্নমানের জীবনযাপন করতে হয়। পরিবারের সদস্যদের কেবল দৈনন্দিন খরচই কমাতে হয় না, জীবন চালাতে অন্যদের কাছ থেকে ঋণও নিতে হয়। আয়ের এই ক্ষতি খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণে তাঁদের সামর্থ্যও কমিয়ে দেয়।

বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, অভিবাসনের গড় খরচ ২৩০০ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের (৪৮০ মার্কিন ডলার) প্রায় ৫ গুণ (শর্মা ও জামান, ২০০৯)। যেহেতু উচ্চাকাঙ্খী অভিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে আসে, তারা ঋণ গ্রহণ, সম্পত্তি বন্ধক রাখা, রিক্রুটিং এজেন্সির কাছ থেকে মাসিক সুদের হারের বিনিময়ে ঋণ নেওয়া (মাসে ৩-৫ শতাংশ থেকে বছরে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত) ইত্যাদির মাধ্যমে অভিবাসনের খরচ সংগ্রহ করে থাকে। অভিবাসীদের সাধারণত কয়েক বছরের মধ্যে ঋণ শোধ করতে হয়। এই বন্দোবস্তের কারণে গন্তব্য দেশগুলিতে তাঁদের আয় দীর্ঘমেয়াদে বড় পরিমাণে কমে যায়। এই প্রেক্ষাপটে, কোভিড-১৯ বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ যোগ করেছে। এর মানে হলো, যেসব বাংলাদেশি অভিবাসী এখনও গন্তব্যের দেশে অবস্থান করছেন, তাঁরা কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে ঋণের ফাঁদে পড়তে পারেন।

নারী-পুরুষ ভেদে রেমিট্যান্স প্রবাহ: কোভিড-১৯ মহামারীতে রেমিট্যান্স প্রবাহের বৃহতৎ মাত্রার লিঙ্গগত প্রভাব রয়েছে। চিত্র ৬.২ দেখায় যে, ৬৯ শতাংশ নারী অভিবাসী মহামারীর সময়ও রেমিট্যান্স পাঠাতে পেরেছে, যেখানে পুরুষ অভিবাসীদের মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশ তা করতে সক্ষম হয়েছে। এটি থেকে বোঝা যায় যে মহামারীটি গন্তব্য দেশগুলিতে বাংলাদেশের পুরুষ অভিবাসীদের তুলনায় নারী অভিবাসীদের আয়ের ওপর কম প্রভাব ফেলেছিল। এর প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হলো, নারী অভিবাসীদের পেশাগত অবস্থান। বাংলাদেশি নারীদের ৯০ শতাংশের বেশি গৃহকর্মী হিসেবে কর্মরত, বিশেষ করে উপসাগর এবং অন্যান্য আরব দেশে। অনেক পুরুষ-অধ্যুষিত খাত মহামারীর কারণে তাঁদের কার্যক্রম বন্ধ বা স্থগিত করলেও এই সময়ে নারী গৃহকর্মীদের চাহিদা অপরিবর্তিত ছিল। ফলে, পুরুষ অভিবাসীদের তুলনায় নারী অভিবাসী পরিবারে চাকরি হারানো বা আয়হ্রাসজনিত ধাক্কা কম লেগেছে। যদিও নারী গৃহকর্মীদের ভেতরে বিপন্নতার ধরন একেকজনের বেলায় একেকরকম ছিল।

চিত্র ৬.২: কোভিড-১৯ এর সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহে নারী-পুরুষ ভিন্নতা

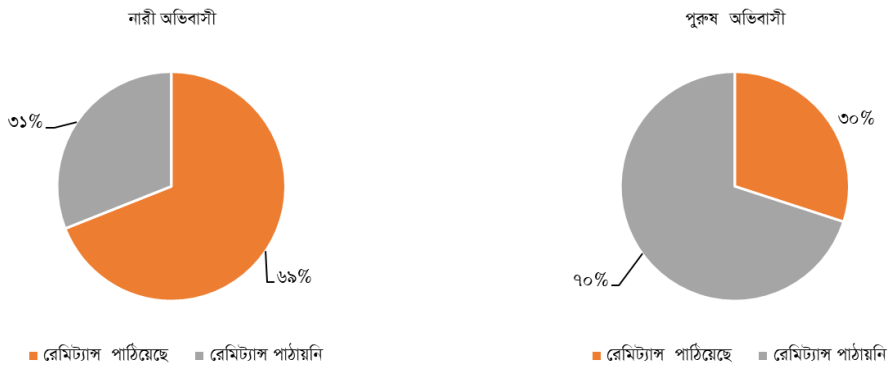

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

চাকরির নিরাপত্তা এবং তার সঙ্গে জড়িত রেমিট্যান্স পাঠানোর সামর্থ্য তা আবাসিক গৃহকর্মীদেরই বেশি ছিল। বিপরীতে, অনেক অনাবাসিক অভিবাসী নারী শ্রমিক পুরুষ অভিবাসীদের মতোই একইভাবে চাকরি হারিয়েছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাই এই ধারণাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ হয় যে, সকল নারী অভিবাসী পুরুষের চাইতে দ্বিগুণ নিপীড়িত হয়ে থাকে। কোভিড-১৯ এর ক্ষেত্রে গৃহকর্মীদের কাজের চাপ বেড়েছে এবং তাঁদের নিরন্তর পরীক্ষার

মধ্যে রাখা হয়েছে। যাই হোক, বাড়িতে থাকা তাঁদের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তার বোধ দিয়েছে। আসলে নিজেদের স্বার্থেই নিয়োগকর্তারা নিশ্চিত থাকতে চেয়েছেন যে নারী কর্মীরা ভাইরাসের সংস্পর্শে যাতে না আসে।

পুরুষ এবং নারী প্রবাসী কর্মীর পরিবারের প্রাপ্ত গড় রেমিট্যান্সের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। অভিবাসীদের রেখে-যাওয়া পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, পুরুষ অভিবাসীদের তুলনায় নারী অভিবাসীদের ক্ষেত্রে রেমিট্যান্সের পরিমাণ কম ছিল। যদিও পুরুষ অভিবাসীর তুলনায় অনেক বেশি নারী অভিবাসীর পরিবার রেমিট্যান্স পেয়েছেন, তবুও পুরুষদের তুলনায় নারী অভিবাসীর পরিবারের প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল কম। এটি আবার এটা বোঝায় যে, নারী কর্মীরা তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় কম উপার্জন করে।

প্রকৃতপক্ষে, গন্তব্য দেশে শ্রম অভিবাসনের বেলায় লিঙ্গ অনযায়ী কাজের ভিন্নতা অনেক পার্থক্য তৈরি করে দেয়। বেশিরভাগ এশিয় অভিবাসী নারী ঘরোয়া কাজ, স্বাস্থ্য, বিনোদন এবং সেবা খাতের মতো 'মেয়েলি' পদে কাজ করার প্রবণতা দেখান। পুরুষদের তুলনায় নারী অভিবাসীদের কম বেতন দেওয়া হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষ অভিবাসীদের তুলনায় নারী অভিবাসীরা তাঁদের আয়ের বেশি অংশটি তাঁদের পরিবারের কাছে পাঠায় (মার্টিন, ২০০৩; সিদ্দিকী ২০০৮)। যেহেতু নারীরা প্রায়ই পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম বেতন পায়, তাই নারীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের মোট রাজস্বও কম হতে পারে। নারী শ্রমিকদের উপার্জনের বেশিটাই শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় করা হয়, যেখানে পুরুষ অভিবাসীরা সম্পদ ক্রয় ও বিনিয়োগে বেশি ব্যয় করে বলে প্রতীয়মান হয়।

অনুচ্ছেদ ৫: রেমিট্যান্সের প্রবাহ হ্রাসের প্রভাব

বাংলাদেশের অনেক পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস হলো রেমিট্যান্স। ৬.৩ নং চিত্র দেখায় যে, ৫৭ শতাংশ পরিবারের রেমিট্যান্স ছাড়া আয়ের অন্য কোনো উৎসই নেই। এছাড়া, ২০ শতাংশ পরিবার জানিয়েছে, রেমিট্যান্স থেকেই আসে তাঁদের আয়ের তিন-চতুর্থাংশ। ১৪ শতাংশ পরিবারের বেলায় তা আয়ের অর্ধেক। পরিবারগুলি রেমিট্যান্সের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ায় মহামারীর কারণে তাঁদের আয় লক্ষ্যণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যেমন, শাকিলের ভাই নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে কাতারে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমার ভাই নির্মাণ খাতে কাজ করতেন। কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার পরে তার কোনও কাজ ছিল না। এমনকি তিনি নিজের খাবারের খরচও মেটাতে পারছিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই, তিনি ফেব্রুয়ারি মাস (২০২০) থেকে আমাদের টাকা পাঠাতে পারছিলেন না। আমরা এখানে দুর্দশায় আছি এবং আমার ভাইও বিদেশে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন'।

চিত্র ৬.৩ : রেখে-আসা অভিবাসী পরিবারে রেমিট্যান্স নির্ভরতা

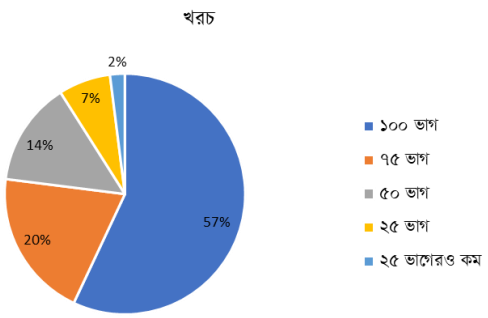

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

আয়ের অভাবে অনেক পরিবার ধার ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে। দেখা গেছে যে পুরুষ ও নারী অভিবাসী সদস্য থাকা যথাক্রমে ৬০ ও ৩৮ শতাংশ পরিবার তাঁদের দৈনন্দিন খরচ চালাতে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে। অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারের জন্য ধার করাই হলো গতানুগতিক বিকল্প উপায়। কিন্তু এটা সাময়িক স্বস্তি দিলেও এটা অভিবাসীদের পরিবারের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করে।

শাকিল বলেন, 'আমার ভাই-ই হলো আমাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী, এবং ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তাঁর কাজ নেই। দিনে তিন বেলা আহার জোটাতে আমাদের কঠিন অবস্থা হয়ে যায়। প্রথম দিকে, দোকানদাররা শিগগিরই দাম শোধ করার আশ্বাসের ভিত্তিতে আমাদের খাদ্যসামগ্রী দিয়েছিল। কিন্তু এখন তারা এরকম বন্দোবস্তে আর রাজি না'।

রেমিট্যান্সের অভাবে অনেক অভিবাসী পরিবার ঋণের দায়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যে পরিবার ইতিমধ্যেই অভিবাসনের প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে ঋণ করেছিল; কোভিড-১৯ এর কারণে তারা আরও খারাপ অবস্থায় পড়ে গেছে, যেহেতু রেমিট্যান্সের অভাবে তাঁদের ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। কীভাবে তারা তাঁদের ঋণ পরিশোধ করতে পারবে তা নিয়ে চিন্তিত। কোভিড-১৯ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে সমস্ত সংগ্রাম সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ কখনও শোধ করা যাবে না ভেবে তারা চিন্তিত। কাতারে অভিবাসী একজন শ্রমিকের বাবা মুসা মিয়া জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর ছেলেকে পাঠানোর জন্য যে ঋণ শোধ করেছিলেন, কীভাবে তা শোধ করবেন সেই চিন্তা তাঁর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো লাগে। তিনি জানান, 'আমি আমার ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর জন্য (বিভিন্ন উৎস থেকে) সত্যিই কিছু টাকা ধার করার জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। ভেবেছিলাম শীগগিরই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাব কিন্তু এখন আমি বিধ্বস্ত। আমি যাদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছি তারা প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে আসে এবং ঋণ ফেরত দেওয়ার সময়সীমা মানতে না পারায় দুর্ব্যবহার করে। আমার ছেলে গত তিন মাসে একটা পয়সাও পাঠায়নি। সে এখন নিজেই অনেক অসহায়। সে আমার কল ধরে না। যখন ফোন ধরে, শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কেবল কাঁদে। এখন আমার কী করা উচিত? আমি যদি আত্মহত্যা করতে পারতাম! যদি কোভিড-১৯ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, তাহলে এই বিশাল ঋণ ফেরত দেওয়ার কোনো আশাই থাকবে না আমার'।

অনেক পরিবারের প্রবীণ সদস্য আছেন। তাঁদের বেঁচে থাকার জন্য ওষুধের প্রয়োজন হয়, যেমন দরকার হয় রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের মতো পরিস্থিতিতে। পরিবারগুলি তাঁদের জন্য অর্থ সংস্থান করতে কঠিন সময় পার করছে। জরুরি ঔষধ কিনতে না পারার কারণে যাদের পরিবারের কোনো সদস্যের হৃদরোগের মতো স্বাস্থ্য জটিলতা আছে, তাঁদের যত্ন নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মর্জিনা খাতুনের কথা। তিনি একজন অভিবাসী শ্রমিকের স্ত্রী। তাঁর স্বামী সংযুক্ত আরব আমিরাতে একটি দোকানে কাজ করেন। ২০২০ সালের মার্চ মাসে তাঁর স্বামী রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ করে দিলে তিনি অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্য ওষুধ কিনতেও ব্যর্থ হন। তিনি উদ্বিগ্নভাবে বলেছিলেন, 'আমার বাবা স্ট্রোক করেছিলেন। তিনি নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছেন। আগামী মাস থেকে আমি তার দরকারি ওষুধগুলো কিনতে পারব না ভেবে আমি উদ্বিগ্ন'।

আর্থিক বোঝা হলো অভিবাসী শ্রমিক এবং তাঁদের রেখে-আসা পরিবারের সদস্যদের ওপর চাপ সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। অনেক বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীকে কাজের সন্ধানে বিদেশে যাওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হয়। তাই অভিবাসন অভিবাসী পরিবারের ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এই ধরনের ৫৭ শতাংশ পরিবারের আয় শুধুমাত্র অভিবাসীদের রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, পরিবারে পুরুষ অভিবাসী থাকা পরিবারের ২১ শতাংশ এবং নারী অভিবাসী থাকা পরিবারের ৩৮ শতাংশের ক্ষেত্রে পরিবারের

অন্যান্য সদস্যদের আয় থাকতে দেখা যায়। এর অর্থ অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারের সদস্যদের দৈনিক খরচ মেটানোর আর্থিক প্রতিশ্রুতি অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর চাপ বাড়ায়। ঋণ পরিশোধের চাপের ওপর যোগ হওয়া এই বাড়তি চাপ অভিবাসী শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থ অধ্যায় দেখিয়েছে যে মহামারী শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কিছু অভিবাসী শ্রমিক গন্তব্য দেশে খুব অসহায় হয়ে পড়ে। আয়ের অভাবের কারণে তাঁদের অনেককে খাদ্য কিনতে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাঁদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এমন ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবারের বাকি সদস্যদের কাছ থেকে জরুরি আর্থিক সহায়তা চাইতে হয়েছিল। তাঁদের সাহায্য করার জন্য তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ঋণ নিয়ে বিদেশে টাকা পাঠাতে হয়েছিল, যাতে অভিবাসী শ্রমিকেরা অন্তত তাঁদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে কিছুটা সাহায্য পায়। রেমিট্যান্স পাঠানোর বদলে অভিবাসী শ্রমিকদের উল্টো তাঁদের রেখে-আসা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জরুরি আর্থিক সহায়তা পেতে হয়েছিল। এটা অভিবাসী শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। ফলে, কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার সাথে-সাথে অভিবাসী জনগোষ্ঠী ব্যাপকমাত্রায় নাজুক অবস্থার মধ্যে পতিত হয়।

অভিবাসী পরিবারগুলো দিনে তিন বেলা খাবার নিশ্চিত করতে গিয়ে কঠিন সময় পার করেছে। জরিপে যেসব পরিবারের অবস্থার মূল্যায়ন করা হয়েছিল, তাঁদের সদস্যরা জানিয়েছে যে তারা আমিষ জাতীয় খাবার কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। ৬৩ শতাংশ দুধ খাওয়া কমিয়েছে, ৮১ শতাংশ নিয়মিতভাবে মাছ ও মাংস কিনতে পারে না। ৯০ শতাংশ বিগত তিন মাসে মাংস খাননি। তারা তাঁদের বাচ্চাদের জন্যও উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার দিতে পারেন না। ২০০ পরিবারের মধ্যে ৬৫ টি পরিবারে সাত বছরের কম বয়সী শিশু ছিল। তাঁদের মধ্যে ৭২ শতাংশের দুধ খাওয়া কমে গেছে, ৪৩ শতাংশের কমেছে ডিমের খরচ এবং ৭৪ শতাংশের মাংস খাওয়ার পরিমাণ কমে গেছে। ফলে, তারা বুঝতে পেরেছিল যে পুষ্টিকর খাবারের অভাবে তাঁদের শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি হুমকিগ্রস্থ হতে পারে। এটি তাঁদের শিশুদের শিক্ষা এবং সামগ্রিক সুস্থতা বিষয়ে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।

আম্বিয়ার বাবা বহু বছর ধরে সৌদি আরবে কাজ করছেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের ১৩ জনের বড় পরিবার। এর মধ্যে রয়েছে আমার ভাই, বোন, মা, দাদা-দাদি এবং আমার চাচাতো ভাইরা যাদের বাবা তাঁদের পরিত্যাগ করেছিল। আমার বাবাই হলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য। আল্লাহর রহমতে আমার বাবা শারীরিকভাবে ভালো আছেন। তিনি কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হননি। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছেন না। আমরা মৌলিক খাদ্যসামগ্রীর ওপর টিকে আছি কিন্তু দুধ, মাছ ও মাংসসহ স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করার কোনো উপায় নেই'।

অভিবাসী পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্য গ্রহণ রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল বলে অভিবাসী পরিবারের সদস্যরা শিশুদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর অভাব পূরণে চাপের মধ্যে রয়েছে। মোশতারী বেগম প্রবাসী শ্রমিকের স্ত্রী। তাঁর স্বামী সৌদি আরবে কাজ করেন। স্বামীর চাকরি চলে গেলে রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। তিনি এখন তাঁর মেয়ের জন্য ফর্মুলা দুধ কিনতে পারছেন না। যেমন তিনি বলেছেন, 'আমার মেয়ের বয়স দুই বছর। আমি তার জন্য দুধ কিনতে পারি না। গত তিন মাস ধরে সে অনেক কম দুধ খেয়ে বেঁচে আছে।'

পিতামাতারা তাঁদের শিশুদের জন্য মৌলিক খাবার কেনার জন্য আর্থিকভাবে চাপে থাকার পাশাপাশি স্কুলগামী শিশুদের বাবা-মাও কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছেন। মহামারী চলাকালীন স্কুলগুলি বন্ধ থাকায়, শিক্ষা হয়ে উঠেছে গৃহভিত্তিক। গৃহভিত্তিক শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক প্রয়োজন। রেমিট্যান্সের অভাবে, পরিবারগুলি গৃহশিক্ষক কিংবা

অনলাইনে পড়ালেখার বন্দোবস্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এছাড়া, যাদের কোচিং বা প্রাইভেট টিউশন করানোর সামর্থ্য ছিল, তাঁদেরও প্রাইভেট টিউশনে বাচ্চাদের পাঠানো বন্ধ করতে হয়েছিল অথবা গৃহশিক্ষককে বাদ দিতে হয়েছিল। দুই স্কুলগামী শিশুর মা মাহফুজা এই বলে হতাশা প্রকাশ করেন যে তিনি বাড়িতে বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে কঠিন অবস্থায় ছিলেন। তাঁর নিজের কথায়, 'আমার স্বামী বাহরাইনে থাকেন। তিনি গত দুই মাস ধরে রেমিট্যান্স পাঠাননি। সামর্থ্য না থাকায় আমি প্রাইভেট টিউটর বন্ধ করে দিয়েছি। আমার বড় ছেলের অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে কিন্তু আমার কাছে স্মার্ট ফোন কেনা এবং ইন্টারনেট চালানোর ডেটা কেনার টাকা নেই'।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অভিবাসী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছিলেন যে পরের মাসে কীভাবে চলবেন সে ব্যাপারে তাঁদের কোনো পরিকল্পনা নেই। রেমিট্যান্সের ওপর তাঁদের চরম নির্ভরতা তাঁদের ঋণগ্রস্ত করেছে। কারণ আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া ছাড়া তাঁদের সামনে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। প্রতিটা দিন অকথ্য যন্ত্রণা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে পার হওয়া এবং গরিব হয়ে পড়ার ভয়ের সঙ্গে বসবাস করতে হয়েছে অভিবাসী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের। তাছাড়া, তারা বিদেশে বসবাসরত তাঁদের আপন ও প্রিয়জনের জন্যও সমানভাবে উদ্বিগ্ন। আয়ের অনিশ্চয়তা এইভাবে অভিবাসী শ্রমিক এবং তাঁদের রেখে-আসা পরিবারের সদস্যদের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করেছে।

অনুচ্ছেদ ৬ : রেমিট্যান্স প্রবাহের তথ্যগত ব্যবধানের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা

রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়ার জাতীয় তথ্য পরিবার পর্যায়ে রেমিট্যান্স প্রাপ্তির অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। অভিবাসী পরিবারগুলি যখন বারবার কোনো রেমিট্যান্স না পাওয়ার করুণ বাস্তবতার কথা জানাচ্ছে, তখন জাতীয় পরিসংখ্যানে রেমিট্যান্স প্রবাহে ব্যাপক ঢল নামার কথা বলছে। এই অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করার প্রথম ধাপ হলো, দীর্ঘ মেয়াদে রেমিট্যান্সের বৃদ্ধির আদল বা ধরন চিহ্নিত করা। সারণি ৬.১-এ বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের বার্ষিক ওঠা-নামার হিসাব শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এটি দেখায় যে ২০০৯-১০ এবং ২০১২-১৩ এর মধ্যে বার্ষিক রেমিট্যান্স বৃদ্ধির হার ছিল ৬ থেকে ১৩ শতাংশ। ২০১২-১৩ সালে বাংলাদেশ ২ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা পায়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এটি ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পরের দুই বছরে রেমিট্যান্স আবার ১৪ শতাংশ কমে গিয়েছিল। এই সময়ে ছয় লাখের কিছু কম শ্রমিক অভিবাসী হয়েছিল। আবার, পরের তিন অর্থবছরে বার্ষিক রেমিট্যান্স বেড়েছিল যথাক্রমে ১৭ শতাংশ, ১০ শতাংশ এবং ১১ শতাংশ। এই বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক বিদেশে গিয়েছিল (প্রতি বছরে ৭ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক অভিবাসী হয়েছিল)। ২০১৭ সালে অভিবাসী হয় এক মিলিয়ন বাংলাদেশি। ওপরে বর্ণিত দৃশ্যের বিপরীতে, বিস্ময়করভাবে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথমার্ধে রেমিট্যান্স অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইসময়ে প্রবৃদ্ধির হার ছিল আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৮ শতাংশ বেশি। এটাকে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা এটা ছিল অস্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য গবেষকেরা একে কোভিড-১৯ এর সময়ে বিরাট সংখ্যায় অভিবাসীদের প্রত্যাবর্তনের ঘটনা দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

সারণি ৬.১ রেমিট্যান্স প্রবাহের বার্ষিক বৃদ্ধি ও অধোগতির শতাংশ হার

অর্থবছর	রেমিট্যান্স (মিলিয়ন হিসেবে মার্কিন ডলারে)	বৃদ্ধির হার
২০০৯-১০	১০৯৮৭.৪	-
২০১০-১১	১১৬৫০.৩২	৬%
২০১১-১২	১২৮৪৩.৪৩	১০%

২০১২-১৩	১৪৪৬১.১৫	১৩%
২০১৩-১৪	১৪২২৮.৩	-২%
২০১৪-১৫	১৫৩১৬.৯১	৮%
২০১৫-১৬	১৪৯৩১.১৮	-৩%
২০১৬-১৭	১২৭৬৯.৪৫	-১৪%
২০১৭-১৮	১৪৯৮১.৬৯	১৭%
২০১৮-১৯	১৬৪১৯.৬৩	১০%
২০১৯-২০	১৮২০৫.০১	১১%
২০২০-২১ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০)	**১২৯৪৪.৭৫**	**৩৮%**

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে সিপিডি'র দ্বারা প্রণীত

বিভিন্ন দেশে থেকে আসা রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবণতা বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা যেতে পারে। সারণী ৬.২ বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে আসা রেমিট্যান্সের প্রবাহে কার কত অংশ তা দেখায়। বেশিরভাগ রেমিট্যান্স উৎস দেশগুলির ক্ষেত্রে কোনো লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটেনি। সৌদি আরব এখনও সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স পাঠানোর দেশের অবস্থানে রয়েছে। কেবলমাত্র সংযুক্ত আরব আমিরাতের অবস্থানের লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় অবস্থানের মধ্যে ওঠা-নামা করছে। মালয়েশিয়া পঞ্চম থেকে সপ্তম অবস্থানের মধ্যে রয়েছে। ওমান, কাতার এবং সিঙ্গাপুরের অংশভাগ কমবেশি একই রয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি অভিবাসী ফিরে এসেছে সৌদি আরব থেকে, এটাই সম্ভবত সেখান থেকে আসা রেমিট্যান্সের সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণ। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকেও বড় আকারে শ্রমিকের প্রত্যাবর্তন ঘটলেও, সেখান থেকে আসা রেমিট্যান্সের প্রবাহ সৌদি আরব বা মালয়েশিয়ার মতো বেশি দেখাচ্ছে না। অতএব, এমন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, বিরাট সংখ্যক শ্রমিকের প্রত্যাবর্তন আপনাআপনি রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়াতে অবদান রেখেছে।

সারণি ৬.২: বাংলাদেশে আসা রেমিট্যান্সের উৎস এবং সেসব দেশের ক্রমবর্ধমান অংশ

দেশ	২০১৫ অর্থবছরের জুলাই জুনে অংশভাগ	অংশভাগ (জুলাই-জুন)		রেমিট্যান্স বৃদ্ধির হারের অংশভাগ
		২০২১ অর্থবছর	২০২১ অর্থবছর	
সৌদি আরব	২১.৮%	২১.০%	২৩.৭%	৩০.৪%
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৮.৪%	১১.৬%	১২.৫%	১৪.৮%
সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৫.৫%	১৪.৩%	১০.৮%	২.৩%
মালয়েশিয়া	৯.০%	৬.৯%	৯.০%	১৪.৩%
যুক্তরাজ্য	৫.৩%	৭.৮%	৮.০%	৮.৩%
কুয়েত	৭.০%	৭.৯%	৭.১%	৫.২%
ওমান	৬.০%	৬.৮%	৭.১%	৭.৬%
কাতার	২.০%	৫.৯%	৫.২%	৩.৩%
ইতালি	১.৭%	৪.৩%	৩.২%	০.৫%
সিঙ্গাপুর	২.৯%	২.৪%	২.৭%	৩.৩%
অন্যান্য	১০.২%	১১.০%	১০.৭%	১০.০%
মোট (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	**১০০.০% (১৫৩১৬.৯)**	**১০০.০% (৭৭১৬.৩)**	**১০০.০% (১০৮৯৪.১)**	**১০০.০% (৩১৭৭.৮)**

সূত্র: 'কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে কীভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহের ঊর্ধ্বগতি ব্যাখা করা যায়' শীর্ষক সিপিডি আয়োজিত ওয়েবিনার, জানুয়ারি ১৭, ২০২১।

এই দেশগুলি থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণের ক্ষেত্রে কিছু অদল-বদল হতে পারে। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, রেমিট্যান্সের পরিমাণ লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে শুধুমাত্র কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রে। এগুলো হলো সৌদি আরব ও মালয়েশিয়া। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আসা রেমিট্যান্সের মোট প্রবাহের ২১ থেকে ২৩ শতাংশ সৌদি আরবের। ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম ভাগে, অর্থাৎ জুন-ডিসেম্বর এটি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বৃদ্ধি ছিল বাংলাদেশে আসা মোট প্রবাহের ৩০.৪ শতাংশ। গোড়ার দিকেই দেখা গিয়েছিল যে কোভিড-১৯ এর কারণে প্রত্যাবর্তনের প্রধান স্রোতটা আসছে সৌদি আরব থেকে। এরকম বড় আকারের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে বাংলাদেশে পৌঁছানোর আগেই রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেওয়ার মধ্যে কিছু সংযোগ থাকতে পারে। কেননা, বাংলাদেশিদের নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বেশি নিজের সঙ্গে বহন করার অনুমতি নেই। অন্যদিকে, আগে বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের মাত্র ৯ শতাংশ আসতো মালয়েশিয়া থেকে। তাহলেও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথমার্ধে এটা ১৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে। বিতাড়নের নিরন্তর ভয় থেকে হয়তো অভিবাসীদের একটি অংশ তাঁদের প্রবাসকালীন সঞ্চয়ের পুরোটাই বাড়িতে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে। অনেক অভিবাসী গন্তব্য দেশে তাঁদের বিনিয়োগ উঠিয়ে নিয়ে রেমিট্যান্স হিসাবে সেই পরিমাণ নগদ অর্থ বাড়িতে পাঠিয়েছেন। এছাড়া, ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার অভিবাসী একেবারের মতো দেশে ফিরে আসেন। তাঁরাও অবশ্যই তাঁদের সমস্ত সঞ্চয় ফিরিয়ে এনেছেন। যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশ থেকে আসা রেমিট্যান্স প্রবাহের অনুপাত মোটামুটি একইরকম ছিল। এই সময়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইতালি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ ব্যাপকভাবে কমে গেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের অংশ ১১ শতাংশ থেকে ২.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। যদি রেমিট্যান্স প্রবাহ শ্রমিকদের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে জড়িত থাকতো তাহলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বেলাতেও তা বাড়বার কথা ছিল।

কিছু বিষয়ের আরো জোরদার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল স্টক বা মোট প্রবাসী মজুত এবং অভিবাসনের প্রবাহের পার্থক্য। যদিও বিগত বছরের তুলনায় ২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন প্রবাহ ৬৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, তারপরও বিভিন্ন গন্তব্য দেশে বাংলাদেশি অভিবাসীদের বড় মজুত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের অনুমান এই যে, বর্তমানে ২৫ লক্ষ বাংলাদেশি সৌদি আরবে বাস করছেন। এঁদের মধ্যে যাঁদের চাকরি বা সঞ্চয় টিকে আছে তাঁরা টাকা পাঠাতে থাকবেন। তাই এক লক্ষ কর্মীর প্রত্যাবর্তন রেমিট্যান্স প্রবাহকে বড় মাত্রায় প্রভাবিত নাও করে থাকতে পারে। যারা নিয়মতান্ত্রিক পথে বা আনুষ্ঠানিকভাবে রেমিট্যান্স পাচ্ছে, তাঁদের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৯ সালের জুন মাস থেকে দুই শতাংশ নগদ প্রণোদনা দিচ্ছে (বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০২০)। চোরাই হুন্ডির বাজার নিয়ন্ত্রণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা পাওয়ার ক্ষেত্রে আগে যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, মহামারীর মধ্যে রেমিট্যান্স প্রবাহকে স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেসবের মধ্যে কিছু শর্ত শিথিল করে। পাশাপাশি রেমিট্যান্স গ্রহণকারী কিছু প্রধান ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রণোদনার অতিরিক্ত আরো ১ শতাংশ অতিরিক্ত প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। এই নগদ প্রণোদনা রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আংশিকভাবে দায়ী।

এছাড়া কিছু অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানও সক্রিয় আছে, তাই এই উপাদানও বিবেচনায় নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। অভিবাসনের সঙ্গে কিছু লুকানো খরচও জড়িত। ওয়ার্ক ভিসা বিনামূল্যের হওয়ার কথা, কিন্তু বাস্তবে, এগুলি গন্তব্য দেশে কেনা-বেচা করা হয়। স্বাভাবিক পরিস্থিতি থাকলে ২০২০ সালে মোটামুটি ৭ লাখ শ্রমিক অভিবাসী হতো, কার্যত সেখানে অভিবাসন করতে পেরেছে মাত্র ২ লাখ ১৭ হাজার ৬৬৯ জন। এর অর্থ ওই বছরে অনেক

কম সংখ্যক ভিসা কিনতে হয়েছে। স্বাভাবিক সময় হলে আরো অন্তত ৪৮২,৩৩১টি ভিসা কিনতে হতো। ২০১৯ সালে গন্তব্য দেশে গড়ে প্রতিটি ভিসাবাবদ দিতে হয়েছে ৩ হাজার ডলার করে। ভিসা বিক্রির ব্যবসা অবৈধ হওয়ায় তা হয় চোরাইবাজারে, প্রকাশ্যে নয়। যেহেতু ভিসা কেনার উদ্দেশ্যে বহির্মুখী রেমিট্যান্স সরকার কতৃক অনুমোদিত নয়, এবং রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলিও বিদেশে যারা ভিসা বিক্রি করে তাঁদের কাছে বাংলাদেশ থেকে টাকা পাঠাতে পারে না। তাই হুন্ডি কারবারিদের মাধ্যমে তারা এই কাজটা করে থাকে। অভিবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্স হুন্ডি কারবারিদের অর্থসংগ্রহের প্রধান উৎস। ২০২০ সালে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলি ভিসা কেনার জন্য হুন্ডি কারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগের দরকার হয়নি। এতে করে হুন্ডি ব্যবসায়ীদের হাতে ১,৪৪৭,০০০,০০০ মার্কিন ডলার ((৪৮২,৩৩১ী ৩০০০ মার্কিন ডলার) কম গিয়েছে। এই টাকাটা আনুষ্ঠানিক মানি ট্রান্সফার প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকবার কথা।

কিছু আমদানিকারক এবং স্বর্ণ ও অন্যান্য চোরাচালানীরাও ব্যাপক আকারে হুন্ডির টাকার ওপর নির্ভর করে লেনদেন চালায়। প্রথম দল কর এড়াতে হুন্ডির ওপর নির্ভরশীল হয় এবং তারা আমদানিতে আন্ডার ইনভয়েস করে। দ্বিতীয়ত, অন্য একটি দল সোনা এবং অন্যান্য অবৈধ জিনিস পাচারের জন্য হুন্ডিতে প্রবেশ করে। কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে চোরাচালানের মাত্রাও কমে আসে, আর এভাবেই হুন্ডির টাকার চাহিদাতেও পতন ঘটে। তাই হুন্ডি কারবারিদের আগের মতো আগ্রাসীভাবে অভিবাসীদের রেমিট্যান্স সংগ্রহ করার দরকার হয়নি। হুন্ডি কারবারিদের অনুপস্থিতিতে অভিবাসীরা আনুষ্ঠানিক ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে টাকা পাঠাচ্ছে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্সের উচ্চপ্রবাহ এটা বোঝায় না যে অভিবাসীরা ভাল আয় করছে এবং তাঁদের সকলেরই দেশে পাঠানোর মতো আয় আছে। তাই আনুষ্ঠানিক চ্যানেলগুলির মাধ্যমে বাংলাদেশে আসা রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বিষয়ে আরো গবেষণা করা প্রয়োজন।

কোভিড-১৯ এর মাঝামাঝি সময়ে ঘূর্ণিঝড় আমফান বাংলাদেশে আঘাত হানে, এর পরপরই আসে মৌসুমী বন্যা। এটা খুবই স্বাভাবিক যে অভিবাসীদের যাদের পক্ষে অর্থ জড়ো করা সম্ভব ছিল, তারা তাঁদের দুর্যোগ আক্রান্ত পরিবারের সমস্যা লাঘবে তা পাঠিয়ে দিয়েছে। উপরের যুক্তিগুলি বর্ধিত রেমিট্যান্স প্রবাহের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদানে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আরো শক্তিশালী বোঝাপড়া তৈরির জন্য সুষ্ঠু পদ্ধতিগতভাবে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৭ : অধ্যায় উপসংহার

এই গবেষণার অধীন ৬১ শতাংশ পরিবার কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব থেকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় পর্যন্ত কোনো রেমিট্যান্স পাননি বলে দেখায় এই অধ্যায়। বাকি পরিবারগুলি প্রতি কিস্তিতে গড়ে ৫৩ হাজার ৫০০ টাকা করে পেয়েছে। যাইহোক, কোভিড-১৯ এর সময় পাঠানো রেমিট্যান্সের হিসাবও ছিল লিঙ্গভিত্তিক। ৩০ শতাংশ পুরুষ অভিবাসী পরিবারের বিপরীতে ৬৯ শতাংশ নারী অভিবাসী পরিবার রেমিট্যান্স পেয়েছে। পরিবারগুলি রেমিট্যান্সের ওপর যে অত্যন্ত নির্ভরশীল তা গবেষণায় দেখা গেছে। ৫৭ শতাংশ পরিবারের জন্য রেমিট্যান্সই আয়ের একমাত্র উৎস। ২০ শতাংশ পরিবারের আয়ের তিন-চতুর্থাংশ রেমিট্যান্স থেকে আসে। ১৪ শতাংশ পরিবারের আয়ের অর্ধেকটা আসে রেমিট্যান্স থেকে।

জাতীয় রেমিট্যান্সের সাম্প্রতিক প্রবৃদ্ধির অর্থ এই নয় যে অভিবাসী পরিবারগুলি মহামারীর আগের সময়ের মতো রেমিট্যান্স পাচ্ছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের ওপর বিভিন্ন সংস্থার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যেসব মডেলিংয়ের ওপর ভিত্তি করে

করা হয়েছে, তা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ব্যস্টিক বাস্তবতা (micro level realities) বিবেচনায় নিতে পারে না। কোভিড-১৯-এর সময় বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি অনেকগুলি কারণে হতে পারে। এই অধ্যায়ে তার কয়েকটি আলোচিত দিক হলো: রেমিট্যান্স প্রেরকদের ২ শতাংশ আর্থিক প্রণোদনা, কিছু ব্যাংকের তরফে আরো ১ শতাংশ অতিরিক্ত প্রণোদনা, বিতাড়নের আশঙ্কার পরণতিতে অভিবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁদের সমস্ত সঞ্চয় দেশে পাঠানো এবং কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের পর মুষ্টিমেয় মানুষের অভিবাসনের ঘটনা। এগুলি আলোকপাত করে এই ঘটনার ওপর যে, ভিসা কেনার জন্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলিকে হুন্ডি বাজারে প্রবেশের প্রয়োজন ছিল না। ব্যবসা খাতে আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের জন্য এবং সোনা চোরাচালানীদের বাংলাদেশে সোনা পাচারের জন্যও হুন্ডির সাহায্য দরকার হয়নি। তাই বিভিন্ন মাধ্যমে যে রেমিট্যান্স আগে বাংলাদেশে প্রবেশ করতো, এই সময় সেসব এসেছিল আনুষ্ঠানিক চ্যানেলগুলির মাধ্যমে। এই বাড়তি রেমিট্যান্স প্রবাহের সঙ্গে যে বিপুল সংখ্যক পরিবার রেমিট্যান্স পাননি তাঁদের অভিজ্ঞতা মেলাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার প্রয়োজন। সংকটকালে রেমিট্যান্সের অনুপস্থিতিতে অভিবাসী পরিবারগুলির দুর্দশার প্রতিকারে তাঁদের এককালীন নগদ অনুদান প্রদান করা অপরিহার্য।

কোভিড-১৯ মহামারীর সময় অভিবাসী পরিবারের সদস্যদের সার্বিক পরিস্থিতি ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক ছিল। এর প্রধান কারণ হলো, অধিকাংশ অভিবাসী পরিবারের বিকল্প আয়ের উৎস নেই এবং বিপুল সংখ্যক পরিবার রেমিট্যান্সের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। যেহেতু রেমিট্যান্স প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে বা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে, সেহেতু মহামারী চলাকালে তারা চরম দুর্দশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কিছু পরিবারের সদস্যদের সামান্য কিছু সঞ্চয় ছিল, কিন্তু সেসবও দ্রুত নিঃশেষিত হয়েছে। তাই অভিবাসী পরিবারের অর্থনৈতিক নাজুকতা কমাতে অবিলম্বে নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু কোভিড-১৯ শ্রম প্রেরণকারী দেশগুলির জন্য রেমিট্যান্সের পুরো দৃশ্যপট বদলে দিয়েছে; তাই এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত ফলাফলগুলি যাচাই করার জন্য শক্তিশালী, বৃহৎ পরিসরে প্রতিনিধিত্বমূলক গবেষণা-অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

রেখে-আসা পরিবার: রেমিট্যান্স আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে মোকাবিলা

মোতাসিম বিল্লাহ, তাহমিদ আকাশ ও নাজমুল আহসান

মূলত রেমিট্যান্স আসা অনিয়মিত হয়ে যাওয়ার কারণে কোভিড-১৯ অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারগুলি এক দীর্ঘস্থায়ী জরুরি অবস্থায় মধ্যে পড়ে গেছে। বিশ্বের অন্যান্য শ্রমিক প্রেরণকারী দেশের মতো বাংলাদেশের অভিবাসীদের পরিবারগুলিও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভর করে। তাঁদের ব্যয়যোগ্য আয়ের বড় অংশটাই আসে এখান থেকে। আগের অধ্যায়ে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে তেমন করে কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে, অনিয়মিত রেমিট্যান্স এবং কিছু ক্ষেত্রে তার একেবারে অনুপস্থিতি রেখে-আসা পরিবারগুলির আয় গুরুতরভাবে কমিয়ে ফেলে। এতে করে তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্যও কমে যায়। কোভিড-১৯ এর চাপিয়ে দেওয়া নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে অভিবাসীদের পরিবার বিভিন্ন ধরনের কৌশল রপ্ত করেছে। এই অভিযোজনের অনেক কলাকৌশল খাপ খাইয়ে নেওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে–যখন কিনা তাঁদের আয়ে ধস নামে কিংবা নেমে আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দারুনভাবে মিলে যায়। তবে অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারের মোকাবিলা করার কৌশলগুলি সবার বেলায় একইরকম ছিল না এবং তা বিভিন্ন স্তরে অনেকগুলি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত।

এই প্রেক্ষাপটে এই অধ্যায়ে মূলত এটাই আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ করে রেমিট্যান্সের অনুপস্থিতি বা অনিয়মিত প্রবাহের মুখে বাংলাদেশের অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারগুলি কীভাবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে। মহামারী পরিস্থিতির পটভূমিতে মোকাবিলার কৌশলগুলি বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্লেষণী কাঠামোর অভাবের কারণে, এই অধ্যায় সংকট ও দুর্যোগ পরিস্থিতি থেকে প্রমাণ দেখাতে ফ্রেড-এর তৈরির করা (২০০৬) ব্যাখ্যামূলক মডেল গ্রহণ করে। মূলত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে থাকা অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারের মোকাবিলার কৌশলের ওপর দৃষ্টিপাতের আগে এখানে এই মডেলের আলোকে মহামারী পরিস্থিতিতে অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারের মোকাবিলার কৌশলগুলির একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে। এই

বিবেচনায়, অধ্যায়টি মূলত ১০০ টি পরিবারের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেছিল। ফোনের মাধ্যমে তাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ২০২০ এর জুন-জুলাই মাসে। পাশাপশি জরিপ থেকে তুলে আনা অনেক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে সংগ্রহ করা টুকরা আখ্যানে এবং উন্নয়ন সংস্থার সরেজমিন প্রতিবেদনও ব্যবহার করা হয়।

অনুচ্ছেদ ২: ধারণাগত কাঠামো: মোকাবিলা কৌশলগুলির একটি ব্যাখ্যামূলক মডেল

মোকাবিলার ধারণাটি মূলত উদ্ভূত হয়েছে ব্যক্তির মানসিক চাপ ও সাধারণভাবে অসুস্থতা মোকাবিলার জন্য স্বাস্থ্য, মনোবিজ্ঞান এবং ঔষধের সমাজতত্ত্ব শাখা থেকে। ধারণাটি পরবর্তীতে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। পারিবারিক সমাজবিদ্যা ও জেন্ডার অধ্যয়ন এবং অন্যান্য সমস্যা যথা বেকারত্ব, পেশা/জীবন ভারসাম্য, আর্থিক সমস্যাবলী এবং দারিদ্র্যের সমাধানেও এটি প্রয়োগ করা হয়েছে। একে সাধারণত হুমকি, অনিষ্ট এবং ক্ষয়ক্ষতি ঠেকানো বা হ্রাস করার প্রচেষ্টা বা এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কষ্ট লাঘবের প্রচেষ্টা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় (কারভার এবং কনর-স্মিথ, ২০১০)। এভাবে মোকাবিলা করার বৈশিষ্ট্যটা এমন যে মানুষ তাঁদের বর্তমান সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিভিন্নরকম প্রত্যাশা মেটানোর জন্য কাজ করে। সাধারণভাবে এটি সম্পদের ব্যবস্থাপনার চেয়ে বেশি কিছু না, কিন্তু এর অর্থ হল কাজটি কীভাবে নতুন, অস্বাভাবিক এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে করা যায়। সুতরাং, মোকাবিলা বা মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা, সমস্যা সমাধানের সক্রিয় উপায় এবং চাপ সামলানোর কৌশল অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

এই প্রবন্ধের বিবেচনায়, রেমিট্যান্স বন্ধ এবং/অথবা স্থগিত হওয়াতে অভিবাসী পরিবারগুলি যেভাবে তাঁদের জীবনমান এবং পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাতে পড়েছে, তা সামাল দেওয়ার জন্য মোকাবিলার কৌশল হবে পরিকল্পিত এবং সুচিন্তিতভাবে রপ্ত করা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। মোকাবিলার কৌশলগুলির মধ্যে কৌশলগত আচরণ, সক্রিয় হওয়া এবং সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনি অভিযোজনশীল আচরণও জড়িত, যার অংশ হলো বুনিয়াদি তবে সাধারণত স্বল্পমেয়াদি সমন্বয়।

অভিজ্ঞতামূলক গবেষণায় দেখা যায় যে যখন কোনো সংসার বা খানা আর্থিক সমস্যার মুখে পড়ে, তখন তারা আশু এবং আরো বিচক্ষণ আচরণকে একসাথে মেলাতে চায়। আরো পরিকল্পিত ও চাহিদামাফিক উপায়ে আরো বাস্তববাদী এবং দূরদৃষ্টিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আর্থিক অসুবিধার প্রতিক্রিয়ায় পরিবারগুলি দ্রুতই খরচ কমিয়ে দেয়। গুরুতর পরিমাণে আয় কমে যাওয়ার পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার কৌশলগুলি মূল ভূমিকা পালন করে, যেহেতু এসব আশু ফল দেয়। যাহোক, দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক টানাপড়েন সামাল দেওয়ার বেলায় এই কৌশলগুলি প্রায় সবসময়ই অপ্রতুল। সেরকম অবস্থায়, খরচের ধরন নতুন আদলে (আরো কড়াকড়িভাবে) পুনর্গঠনের জন্য আরো পরিকল্পিত এবং কাঠামোগত মনোভাব দরকার।

অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারগুলি রেমিট্যান্সের আংশিক এবং/অথবা সম্পূর্ণ স্থগিতের কারণে তৈরি হওয়া আর্থিক কষ্ট কীভাবে মোকাবিলা করতে চেয়েছিল, তা বুঝতে এই অধ্যায়ে ফ্রেড (২০০৬) কর্তৃক বিকশিত করা ব্যাখ্যামূলক মডেল মোকাবিলা কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

চিত্র ৭.১: মোকাবিলা কৌশলগুলির ব্যাখ্যামূলক মডেল

এই মডেল অনুসারে, পরিবারগুলি তিনটি ভিন্ন ধরনের মোকাবিলা কৌশল অবলম্বন করে: স্ব-সংহতি (Self-mobilisation), অর্থাৎ খরচ কমানো বা আয় বৃদ্ধির জন্য পরিবারের সদস্যদের দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থাগুলির সাথে নিজের মিল রেখে চলা; সামাজিক-সংহতি (solidarity-based mobilization), অর্থাৎ সামাজিক সৌহার্দ্যের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য অনুযায়ী বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছ থেকে সহায়তা নেওয়া এবং তৃতীয়ত হলো প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি; যার অংশ হলো রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানানোর মতো উদ্যোগ (সামাজিক সুরক্ষা ও সহায়তার দাবি), নাগরিক সমাজ (বিশেষ করে অলাভজনক সংস্থা) অথবা আর্থিক অসুবিধা কাটিয়ে ওঠায় বাজারকে ব্যবহার করা। স্ব-সংহতির সময় ঘনিষ্ঠ মহলকে সাথে নিয়ে মোকাবিলার উদ্যোগ নেওয়া হয় অর্থাৎ তা ঘটে আপন পরিবারের মধ্যে। যৌথতাভিত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংহতির বেলায় পরিবারের বাইরে থেকে সহায়তা চাওয়া হয়। তখনও ব্যাপারটা একদিকে পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, আওতার মধ্যে থাকা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আইনগত প্রাতিষ্ঠানিক উপায়াদির আশ্রয়ও নেওয়া হয়।

কৌশলের প্রকারভেদ	মূল বৈশিষ্ট্যগুলি
নিজস্ব তৎপরতা বা আত্ম-সংহতি	• এই পরিবার প্রথমে সমস্যাটি নিজেরা মিলে সামলানোর চেষ্টা করে; খাদ্য, জীবনযাপন ও অন্যান্য খরচ কমিয়ে আনে, অথবা আয়ের নতুন উপায় খোঁজে বা একসঙ্গে উভয়টাই করে। • তাৎক্ষণিক কৌশল উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পন্য ও সেবাবাবদ ব্যয় কমায়। • খাদ্য খরচ কমাতে কিছু দামি খাবার (যেমন মাংস ও মাছ) বাদ দিয়ে ক্রমশ তুলনামূলক সস্তা খাবারের বিকল্প গ্রহণ করে। • যতদূর পারে শিশুদের জন্য খরচ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কওে; প্রথমেই বয়স্কদের খরচ কমিয়ে আনে। • কিছু কিছু স্বাস্থ্যসেবা নেওয়া বাদ দেয়, যেমন নিয়মিতভাবে ডাক্তার দেখানো।

সামাজিক সংহতি বা সংহতিভিত্তিক সহায়তা	• পারিবারিক ও বন্ধুত্বের যোগাযোগ-নির্ভর সহায়তা • পরিবার ও বন্ধুরা পণ্য ও সেবাসহায়তা দিয়ে দুর্দশার ভার লাগব করে। • সরাসরি আর্থিক মদদ দেওয়া (অনুদান, ঋণ, ঋণের কিস্তি দিয়ে দেওয়া এবং কিছু পণ্য ও সেবাসহায়তা যেমন ভাড়া, চলাফেরায় সাহায্য, শিক্ষা) অথবা পরোক্ষ সহায়তা (খাদ্য ও জামা-কাপড় পাঠানো ইত্যাদি)। এই সহায়তা কম বস্তুগতও হতে পাওে যেমন মানসিক শান্তি ও পরামর্শ দেওয়া। · স্বতঃস্ফূর্ত সংহতিকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া হলেও যে সাহায্য চেয়ে নিতে হয় তা মানসিকভাবে পীড়াদায়খ বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে, অনুরোধটা করা হয় একেবারে সংকটজনক অবস্থায়, যেমেন শিশুদের জরুরি প্রয়োজন কিংবা বড় কোনো সম্পত্তি হারানোর আশংকা থেকে।
প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা	• পরিবার মূল মূল প্রতিষ্ঠান যেমন রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ ও বাজারের দ্বারস্থ হয়। • এর অন্তর্ভুক্ত হলো বিভিন্ন ধরনের সরাকরি সহায়তা প্রক্রিয়া (সামাজিক নীতিগুলি), যেমন বেকারত্ব ভাতা, ন্যুনতম মজুরি ভাতা এবং অন্যান্য ধরনের সামাজিক সহায়তা (যেমন ছাত্রবৃত্তি, আবাসনে ভর্তুকি, শিশুকল্যাণ সুবিধা ইত্যাদি)। · নাগরিবক সমাজ (সিভিল সোসাইটি) পরিবারগুলির সহায়তায় বিভিন্নরকম অলাভজনক নাগরিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ওপরে বলা এই তিন ধরনের মোকাবিলার কৌশল পারস্পর থেকে আলাদা নয় বরং বেশিরভাগই পরস্পর বিজড়িত। কৌশলসমূহের পারস্পরিকতার জ্যামিতিও বদলায় এবং তা নির্ভর করে বিভিন্ন কার্যকারকের ওপর (Factor)| যার মধ্যে রয়েছে যেমন পরিবারটির বসবাসের প্রেক্ষাপট, তেমনি রয়েছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসহ মনস্তাত্ত্বিক ও সম্পর্কজনিত মাত্রা। তিন ধরনের কৌশলগত সক্রিয়তার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে এর সাময়িকতার মাত্রাকেও ভাবতে হবে। আগে যেমন বলা হয়েছে, নিয়ম হিসেবে স্ব-সংহতি হলো কোনো ব্যক্তির বা পরিবারের নেওয়া প্রথম কৌশল। এটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়; যেহেতু এর সাথে নিজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কৃচ্ছতা জড়িত। তাহলেও আর্থিক সমস্যার তীব্রতা এবং স্থায়ীত্বের জন্য বাড়তি সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। অনানুষ্ঠানিক সংহতিভিত্তিক যোগাযোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থেকে সাহায্য নেওয়ার ঘটনা সবসময়ই ঘটে যখন পরিবারগুলি তাঁদের নিজস্ব সহায় (উদাহরণস্বরূপ, সঞ্চয়) শেষ করে ফেলে এবং আর্থিক অবস্থা উদ্ধারের আগে তারা তাঁদের কেনাকাটার অভ্যাসে যতটা সম্ভব সামঞ্জস্যে আনে। তারপরও, যেসব পরিবারে তিন ধরনের কৌশলের সমাবেশ ঘটে, সেসব কৌশলের পর্যায়ক্রমিক ধাপ বা পথ চিহ্নিত করা যেতে পারে। এটা শুরু হয় স্ব-সংহতকরণ থেকে সামাজিক-সংহতিভিত্তিক সংঘবদ্ধতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিকে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নেওয়ার মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। তবুও ধাপে ধাপে তিনটি মোকাবিলা কৌশলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার প্রগতিশীল পথ সর্বজনীন বাস্তবতা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। এগুলোর সুবিধা পেতে হলে আগে তো সেসব লভ্য থাকতে হবে। তাছাড়া, মোকাবিলা-সক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিটি কৌশলের নিজস্ব সীমা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, মোকাবিলা কৌশলগুলি একটি রৈখিক আদল অনুসরণ নাও করতে পারে। অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারগুলি একটি বিকল্পের চেষ্টা শেষ করার পরই দ্বিতীয় বিকল্পের কথা ভাবতে পারে। আবার তারা বিকল্প জায়গা থেকে পঞ্চম উপায়টিও বেছে নিতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৩: কোভিড-১৯ মোকাবিলা কৌশল: বৈশ্বিক চালচিত্র

বিশ্বের অনেক জায়গায় কোভিড-১৯ অভিবাসীদের কর্মসংস্থানকে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে। অনেক অভিবাসী শ্রমিক তাঁদের চাকরি হারিয়েছে, বড় সংখ্যক শ্রমিকের কর্মস্থল সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার কারণে প্রাপ্য মজুরি তারা পায়নি। এই অবস্থার জন্য উৎস দেশে অভিবাসীদের রেখে যাওয়া পরিবারগুলির রেমিট্যান্স প্রবাহ লক্ষ্যণীয়ভাবে ব্যাহত হয়। অনেক গ্রহীতা দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ এক ধাক্কায় পড়ে গেছে। ৭.১ চিত্রটি দেখায়, ২০২০-এর জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রেমিট্যান্সের পতন ঘটেছে ০ থেকে -৬০ শতাংশের মধ্যে।

চিত্র ৭.১: এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কিছু নির্বাচিত দেশে বছরওয়ারি রেমিট্যান্সের পরিবর্তন, জানুয়ারি-জুন ২০২০

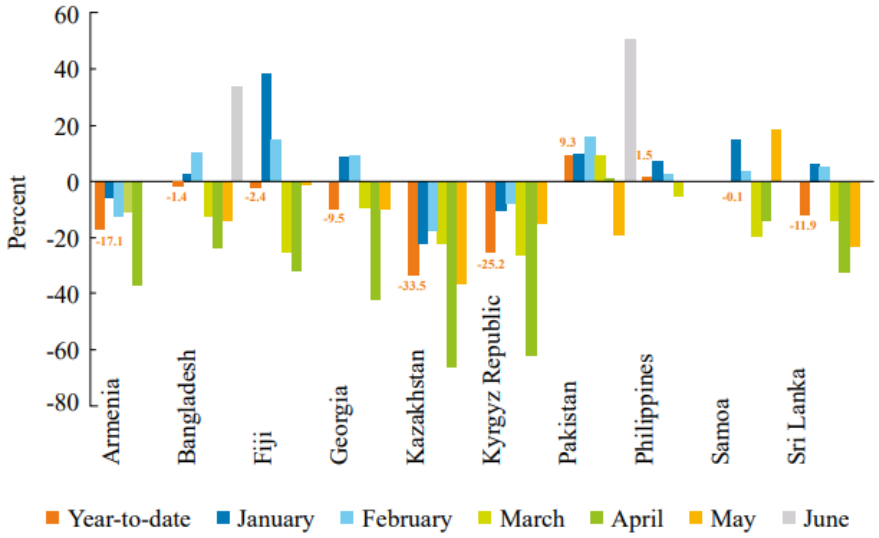

Note: Numbers refer to the year-to-date changes (base year 2019) in remittance inflows to selected Asian countries.

Source: ADB, 2020

রেমিট্যান্সের সবচেয়ে বড় পতনের সাক্ষি দক্ষিণ এশিয়া। এই ক্ষতির পরিমাণ ১৮.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা এশিয়ার মোট ক্ষতির ৫৮.৩ শতাংশ (এডিবি: ২০২০)। বিশেষ করে যেসব পরিবারে রেমিট্যান্সই আয়ের প্রধান উৎস, রেমিট্যান্সের বিঘ্নিত প্রবাহের নেতিবাচক প্রভাব প্রবাসীদের সেসব রেখে-আসা পরিবারের ওপরই পড়ার সম্ভাবনা বেশি। যেমন, কিরগিজ প্রজাতন্ত্রে গ্রহীতা পরিবারের আয়ের ৭৫ শতাংশই আসে রেমিট্যান্স থেকে (গাও প্রমুখ, ২০২০)। ফিলিপাইনে পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২০ সালে রেমিট্যান্স প্রবাহের ২৩ শতাংশ থেকে ৩২ শতাংশে নেমে আসার কথা। মূলত শ্রম-গ্রহীতা দেশগুলিতে চলা সামষ্ঠিক অর্থনৈতিক ধাক্কাই এর জন্য দায়ী। ফলে, মাথাপিছু গৃহস্থালী ব্যয় ২.২ শতাংশ থেকে ৩.৩ শতাংশ হ্রাস পায়; বয়স্ক ব্যক্তি আছে কিংবা কোনো উপার্জনকারী নেই এমন পরিবারে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দেয় (মুরাকামি প্রমুখ, ২০২০)।

এ বিষয়ে লেখালেখি পর্যালোচনার সময় দেখা গেছে, অভিবাসী প্রেরণকারী পরিবারগুলিতে রেমিট্যান্সের সম্পূর্ণ ও আংশিক স্থগিতাবস্থার প্রভাব এবং কোভিড-১৯ মহামারীর সময় কীভাবে পরিবারগুলি এই অবস্থা মোকাবিলা করেছে সে বিষয়ে পদ্ধতিগত ও বলিষ্ঠ জ্ঞানের দরকার। যদিও অর্থনৈতিক দুর্দশা ও বিপর্যয়ের ওপর পরিচালিত গবেষণা (কিক্কাওয়া এবং ওৎসুকা, ২০২০; মুরাকামি প্রমুখ, ২০২০; ইয়াং, ২০০৮) দেখায় যে রেমিট্যান্সের

স্থগিত ও অনিয়মিত প্রবাহ রেমিট্যান্স-নির্ভর পরিবারগুলিকে দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে দিতে পারে অথবা তাঁদের মৌলিক প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ কঠিন হয়ে যেতে পারে। ঋণ পরিশোধের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা পাওয়াও হয়ে যেতে পারে দুরূহ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: বাংলাদেশে মোকাবিলা কৌশলগুলি

হ্রাসকৃত পারিবারিক আয়: বাংলাদেশে অভিবাসীদের মোট রেখে-আসা পরিবারের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে রেমিট্যান্স থেকে। বিসিএসএম ও আরএমএমআরইউ-এর জরিপের (২০২০) ফলাফল (চিত্র:৭.২) দেখায়, অভিবাসীদের ৫৭ শতাংশ পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস হলো রেমিট্যান্স এবং আরো ২০ ভাগের বেলায় পরিবারের আয়ের তিন-চতুর্থাংশ রেমিট্যান্স থেকে আসে।

চিত্র ৭.২: অভিবাসীদের পরিবারের আয়ে রেমিট্যান্সের অনুপাত

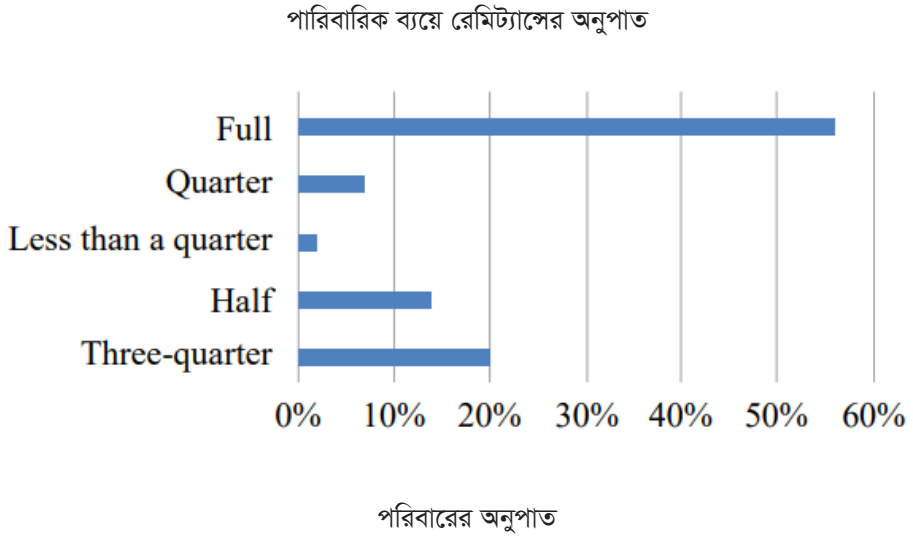

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব এসব পরিবারের রেমিট্যান্স প্রবাহকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ৬১ শতাংশ পরিবারে রেমিট্যান্সশূন্য হয়ে গিয়েছিল, অবশিষ্ঠ ৩৯ শতাংশ পরিবার যে রেমিট্যান্স পেয়েছিল তা ছিল লক্ষ্যণীয়ভাবে কম। চিত্র ৭.৩ দেখায় যে ফেব্রুয়ারি ২০২০-এর আগের ও পরের ১২ মাসে রেমিট্যান্স গ্রহীতা পরিবারে মাসিক রেমিট্যান্সের পরিমাণ প্রায় ৬০ শতাংশ কমে গেছে। কুমিল্লা জেলা থেকে কাতারে অভিবাসী হওয়া একজন অভিবাসী কর্মী রফিকের পরিবার যেমন জানিয়েছে, কোভিড-১৯ এর আগে রফিক তাঁদের মাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা করে পাঠাতো। কিন্তু মহামারীর বিস্তার ঘটলে রফিক মাসে শুধুমাত্র ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া, মহামারীর আগে অভিবাসী পরিবারগুলি খরচ মেটাতে প্রায় প্রতি মাসেই রেমিট্যান্স পেত, কিন্তু কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রেমিট্যান্স প্রবাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

চিত্র. ৭.৩: কোভিড-১৯ এর আগে এবং পরে অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের পরিমাণের তুলনা

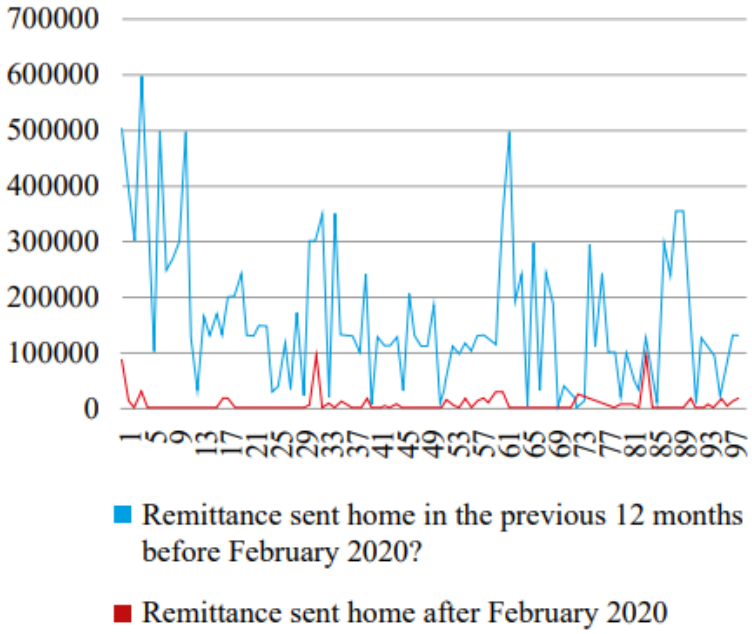

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

পরিবারভেদে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল অনেকাংশে আলাদা। এটি গ্রহীতা দেশগুলিতে অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত থাকতে পারে। জরিপে দেখা গেছে যে, ৬১ শতাংশ পরিবার কোনো রেমিট্যান্স পায়নি। কারণ তাঁদের অভিবাসী পরিবারের সদস্যরা চাকরি হারিয়েছে অথবা কোনো মজুরি পায়নি বা তাঁদের নিয়োগকর্তারা মজুরি দিয়েছে অনিয়মিতভাবে। অনেক পরিবার, বিশেষ করে মহামারীর প্রথম তিন মাসে কোনো রেমিট্যান্স পায়নি। যেমন বলা যায় খুরশেদের বাবা মাকবুলের কথা। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। মকবুল জানান, তাঁর ছেলে একটি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে কাজ করত এবং মাসে গড়ে ৪০ হাজার টাকা করে পাঠাতে পারত। তবে কোভিড-১৯ এর কারণে কারখানাটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং দেশটিতে কঠোর লকডাউন জারি করা হয়। তাই, তাঁর ছেলে বিদেশে টিকে থাকার জন্য সঞ্চয়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় নিয়মতিভাবে আর বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারছিল না। কারণ সে তার বেতন পাচ্ছিল না। মকবুল সেসময় তিন মাসে মাত্র ১৬ হাজার টাকা পেয়েছিলেন।

জরিপে আরও দেখা গেছে যে কিছু ক্ষেত্রে অভিবাসীরা ছুটিতে বাংলাদেশে এসেছিলেন কিন্তু কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে ফ্লাইট স্থগিত হওয়ায় কাজে ফিরতে পারেননি। অল্প কিছু পরিবার জানিয়েছে যে, তাঁদের পরিবারের অভিবাসী সদস্য অ-কোভিডজনিত অসুস্থতায় আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। রেমিট্যান্স অনেক পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস হওয়ায় তারা কঠিন অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়েছিল। রেমিট্যান্সের প্রবাহ কমে যাওয়ায় অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারগুলিকে কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বিভিন্ন মোকাবিলার কৌশল অবলম্বনে বাধ্য হতে হয়। এই কৌশলগুলি দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে: ব্যয় হ্রাস এবং আয় বহুমুখীকরণ কৌশল, যা ব্যাখ্যামূলক মডেলের তিনটি গঠনমূলক উপাদান দ্বারা ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: স্ব-সংহতি, সামাজিক-সংহতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংহতির আয়োজন।

গৃহস্থালির ব্যয় কমানোর কৌশল: রেমিট্যান্সের মন্দা অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারগুলিকে পারিবারিক ব্যয় কমানোর বেশ কিছু কৌশলের দিকে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে তাঁদের মাসিক গৃহস্থালির ব্যয়কে বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ। এসবই তাঁদের স্ব-সংহতিভিত্তিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন। তারা যে প্রথম এবং প্রধান উদ্যোগটি নিয়েছিল তা হলো, তাঁদের বর্জনযোগ্য গৃহস্থালি খরচ কমানো। গড়ে, অভিবাসী পরিবারগুলির আয়ের ৫৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। চিত্র: ৭.৪ দেখায় যে কোভিড-১৯ এর আগে, অভিবাসী পরিবারের মাসিক খরচ ছিল ৭-১৭ হাজার টাকা। কিন্তু মহামারী এই পরিবারগুলিকে তাঁদের খরচ ৩-৭ হাজার টাকার মধ্যে নামিয়ে আনতে বাধ্য করে। সামগ্রিকভাবে, অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারগুলি (MLBF) তাঁদের মাসিক গৃহস্থালির খরচ ৬০-৮০ শতাংশের মতো কমিয়ে দেয়।

চিত্র ৭.৪: কোভিড-১৯ এর আগে এবং পরে মাসিক গৃহস্থালির খরচ

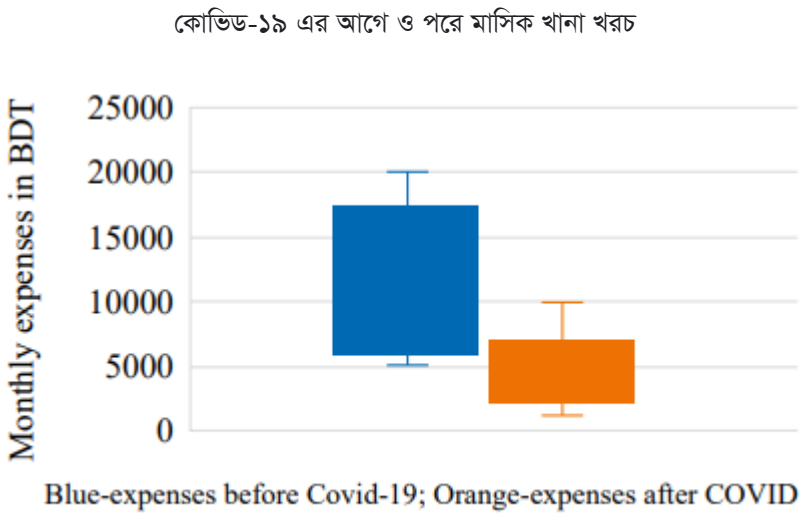

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

পরিবারের খাদ্যখরচ হ্রাস: রেখে-আসা অভিবাসী পরিবারের মাসিক পারিবারিক খরচ কমানো তাঁদের খাদ্য কেনার ব্যয়কে লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রভাবিত করেছে। জরিপে দেখা গেছে যে, ২০২০ সালের এপ্রিল-মে মাসে ৯০ শতাংশ অভিবাসী পরিবার তাঁদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী যেমন শাকসবজি, চাল, মসুর ডাল, দুধ, মাছ ও মাংসবাবদ খরচ কমিয়ে আনে। এসব হলো তাঁদের আশু স্ব-সংহতকরণ প্রচেষ্টা।

এই ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া দরকার যে, পরিবারগুলি প্রোটিন গ্রহণের খরচ লক্ষ্যণীয়ভাবে কমানোয় সম্ভাব্য কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াইয়ের সামর্থ্য কমে যাবার কথা। যদিও এই বক্তব্যের ব্যাপারে অভিবাসীদের কাছ থেকে পদ্ধতিগত তথ্যের অভাব ছিল। জরিপের ফল বলছে, ৯০ শতাংশ অভিবাসী পরিবার লাল ও সাদা উভয় মাংসের খরচ কমিয়েছে; মাছ খাওয়া কমিয়েছে ৮১ শতাংশ, এবং ৬৩ শতাংশের দৈনিক দুধ খাওয়া কমে গেছে। তাছাড়া চাল, মসুর ডাল ও সবজি খরচও যথাক্রমে ১০, ৮ ও ১৩ শতাংশ কমানো হয় (চিত্র ৭.৫)।

চিত্র ৭.৫: কোভিড-১৯ এর পরে অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারের খাদ্য গ্রহণে পরিবর্তন

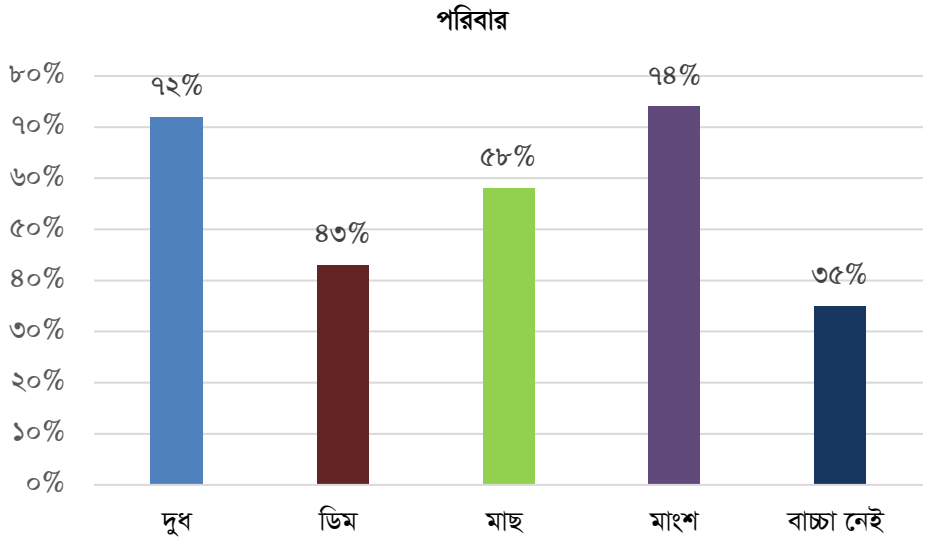

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

জরিপের ফলাফল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে বাস করা পরিবারগুলির অনুসরিত মোকাবিলা কৌশলগুলি চিহ্নিত করেছে। পূর্ববর্তী গবেষণায় (গুপ্ত প্রমুখ, ২০১৫) দেখা গেছে যে খাদ্যনিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে পরিবারগুলি কম পছন্দসই এবং কমদামী খাবারের ওপর নির্ভর করে এবং মৌসুমী শাকসব্জি খায়। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি গ্রামীণ পৌরসভায় কর্ডেরো-আহিমান প্রমুখ (২০১৮) দেখেছেন, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন পরিবারের জন্য সবচেয়ে বেশি গৃহীত কৌশল (৮৮.৪ শতাংশ) ছিল কম পছন্দসই এবং/অথবা সস্তা খাবারের ওপর নির্ভর করা।

কোভিড-১৯ অভিবাসী পরিবারের শিশুদের ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল সে সম্পর্কে খুব কমই তথ্য মেলে। চিত্র ৭.৬ ওইসব অভিবাসী পরিবারের শিশুদের অবস্থার ওপর কিছুটা আলোকপাত করেছে। অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারের ৬৭ শতাংশ শিশুর বয়স ছিল সাত বছরের কম। পরিবারগুলি তাঁদের প্রধান খাদ্যসামগ্রীর খরচ এক ধাক্কায় অনেক কমানোর জন্য কঠোর প্রচেষ্টা নেওয়ার ফলে শিশুদের খাদ্য গ্রহণের ধরনেও পরিবর্তন আসে, বিশেষ করে তাঁদেরও প্রোটিন গ্রহণ লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে যায়। অভিবাসী পরিবারের অর্ধেকের বেশি (প্রায় ৫৫ শতাংশ) মাংস ও দুধ বাদ দিয়ে দেয়, এর পরে বাদ দেয় মাছ (৪৪ শতাংশ), এবং ডিম (৩২ শতাংশ)।

কিছু খাদ্যসামগ্রীর ব্যাপারে আপস করার ব্যাপারটা গুরুতর ছিল, বিশেষত মহামারীর প্রথম কয়েক মাসে যখন অনেক পরিবার রেমিট্যান্সের সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখোমুখি হয়েছিল। গৃহস্থালির খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষাপটে (দক্ষিণ আফ্রিকার মাফেফেথেনি পাহাড়ি এলাকায়) একই রকম মোকাবিলার কৌশল নথিভুক্ত করেন শিসানিয়া ও হেন্ড্রিক্স (২০১১)। তাঁরা দেখতে পান, পরিবারগুলি সবচেয়ে বেশি যে মোকাবিলা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল তা হলো, প্রয়োজনের চেয়ে কম খাবার খাওয়া (৮৩ শতাংশ) এবং দিনে কম বেলা খাবার নেওয়া (৯১ শতাংশ)।

চিত্র ৭.৬: কোভিড-১৯ এর পরে অভিবাসী পরিবারের শিশুদের খাদ্য গ্রহণের পরিবর্তন

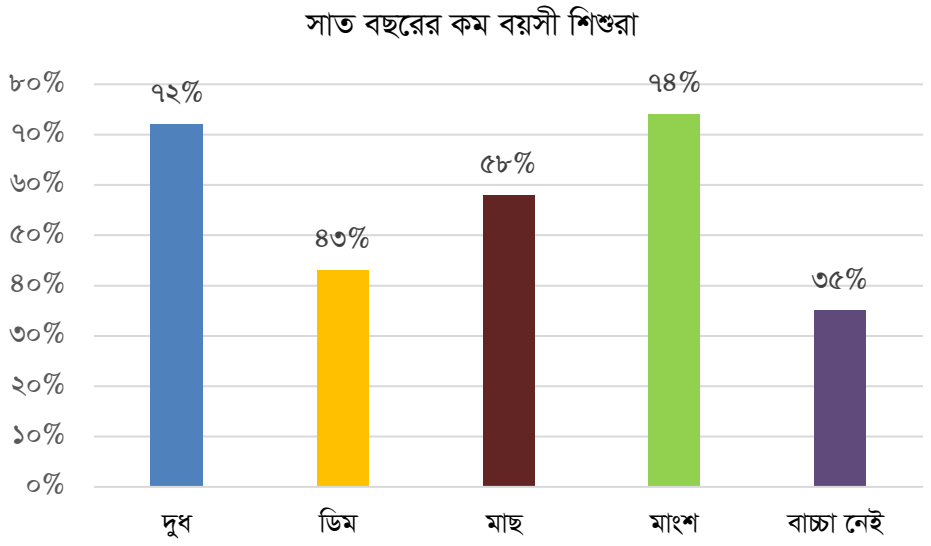

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

যেসব অভিবাসী পরিবারে রেমিট্যান্সই ছিল আয়ের একমাত্র উৎস, তারাও তাঁদের প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে। আবার অনেকে শুকনো খাদ্য যেমন চাল, মসুর ডাল ইত্যাদি মজুদ করে রেখেছিল। কারণ তারা আশংকা করছিল যে, পরবর্তী মাসগুলিতে রেমিট্যান্স অনিয়মিত থাকবে আবার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের দামও একইসাথে বাড়বে। যেমন, একজন অভিবাসীর স্ত্রী রাশিদাকে তাঁর বাহরাইন প্রবাসী স্বামী জানিয়েছিলেন, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা পাঠাতে পারবেন না বিধায় স্ত্রীর ভাইয়ের মুদি দোকান থেকে চাল ও মসুর ডাল বাকিতে নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। রাশিদা তাঁর ভাইয়ের সাহায্য চান এবং প্রায় চার মাসের জন্য খাবারের মজুদ করেন যাতে রেমিট্যান্সের অভাবের মধ্যেও তাঁর পরিবার বেঁচে থাকতে পারে। এই ঘটনাটি দেখায় কীভাবে অভিবাসীর স্ত্রী প্রথমে নিজে তৎপর হয়ে সংহতি-ভিত্তিক আয়োজনের মাধ্যমে তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে সহায়তা পেতে সক্ষম হন। পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষিতে ইথিওপিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এরকমভাবে বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছ থেকে খাবার ধার করা এবং খাবার অনুদান নেওয়ার ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছিল (কর্ডেরো-অহিমান প্রমুখ, ২০১৮; আসেসেফা কিসি প্রমুখ, ২০১৮)।

মহামারী পরিস্থিতি বাজারে সরবরাহ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। বিশেষ করে সরকার-আরোপিত লকডাউনের সময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যসামগ্রীর অভাব ঘটে। যাইহোক, এই গবেষণায় প্রবাসী পরিবারের খাদ্য গ্রহণের পেছনে বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতাজনিত প্রভাবের ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়নি। হয়তো সেটাও অভিবাসী পরিবারের খাদ্য গ্রহণের ধরনকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। পাশাপাশি এই গবেষণায় পরিবার কর্তৃক খাদ্য গ্রহণের সংখ্যার ব্যাপারে আপস করা হয়েছে কিনা, যেমন তিন বেলার বদলে দুই বেলা খাবার খাওয়া কিংবা অনাহারে থাকার ঘটনা; খুঁজে পাওয়া যায় নি। যদিও বেশিরভাগ পরিবার স্বীকার করেছে যে কোনো নির্দিষ্ট বেলার খাবারের পদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমাতে হয়েছিল। এছাড়াও, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে অধিকাংশ পরিবার অনাহার কিংবা খাবারের বেলা কমানোর বিষয়ে সরাসরি উত্তর দিতে অস্বস্তি বোধ করে। তারা বরং পরিবারের সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার সংগ্রামের দিকে ইঙ্গিত করে। কাতারে অভিবাসী একজনের মা রোশনা

বলেছেন, 'আমরা আমাদের খাদ্য গ্রহণের মানের সঙ্গে আপোষ করেছি। যাইহোক, তারপরও নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি যে শিশুরা খালি পেটে ঘুমাতে না যায়'।

এই বিবৃতি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষাপটে পরিচালিত পূর্ববর্তী গবেষণার ফলের প্রতিধ্বনি করে। যেমন, নরহাসমাহ প্রমুখ (২০১০) চিহ্নিত করেন যে খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় পড়া পরিবারগুলি যেসব কৌশল নেয়, যেমন, শিশুদের স্বার্থে বয়স্কদের খাবার কমিয়ে দেওয়া, পরিবারের কর্মরত সদস্যদের খাওয়াতে বেকারদের খাবার কমানো এবং দিনে তিন বেলা খাওয়ার অভ্যাস কমানো বা খাদ্য তালিকায় পদের সংখ্যা কমিয়ে আনা।

শিক্ষার খরচে আপস: বাংলাদেশ সরকার মহামারী প্রাদুর্ভাবের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে, ২০২০ সালের মার্চ মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। তাহলেও সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থিদের টিউশন ফি বিষয়ে পরিষ্কার কোনো নির্দেশমালা দেওয়া হয়নি। যদিও সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থিদের জন্য কোনো টিউশন ফি নেই এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা বিনামূল্যে করা আছে। তবে দেশের অনেক আধা-সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থিদের কাছ থেকে টিউশন ফি ধার্য করে চলেছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একটি অংশ অনলাইন ক্লাস চালু করেছে, এবং সরকার লাখো সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থিদের সাধারণ ক্লাস নেওয়ার জন্য টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার করেছে।

জরিপে দেখা গেছে যে অভিবাসী পরিবারের শিশুরা প্রধানত সরকারি ও আধা-সরকারি স্কুল ও কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাঁদের একটি অংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও পড়ত। তাছাড়া, অধিকাংশ পরিবারের শিশুরা গৃহশিক্ষক ও কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে প্রাইভেট টিউশন নিয়ে থাকে। কিন্তু, মহামারী শুরুর সঙ্গে-সঙ্গে ৬৬ শতাংশেরও বেশি পরিবার নিয়মিত স্কুল, কলেজ, কোচিং সেন্টার এবং গৃহশিক্ষকের ফি দিতে ব্যর্থ হয়। অনেক পরিবার স্কুল ও কলেজের ফি মওকুফের জন্য আবেদন করেছিল। আবার তাঁদের মধ্যে ভাল সংখ্যক পরিবার আংশিক বেতন দেওয়া কিংবা পরে বেতন নেওয়ার সুযোগের জন্য আবেদন করেছিল। সরকারি লকডাউনের কারণে অধিকাংশ পরিবার মহামারীর প্রথম দুই মাসে গৃহশিক্ষক ও কোচিং সেন্টার স্থগিত করতে বাধ্য হলেও তৃতীয় মাস থেকে সেগুলি আবার শুরু করেছিল। যেসব পরিবার লকডাউনের সময়ও প্রাইভেট টিউশনি চালিয়ে গিয়েছিল, তারা তাঁদের গৃহশিক্ষকদের অনুরোধ করেছিল যেন তারা অভিবাসীদের কাছ থেকে রেমিট্যান্স পাওয়া শুরুর পরে তাঁদের ফি নেয়। কিছু পরিবার অন্যান্য গৃহস্থালি খরচের চেয়ে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয় এবং নিয়মিত টিউশন ফি দেওয়া নিশ্চিত করে, যদিও এটি তাঁদের জন্য অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপ নিয়ে আসে। যেমন, যশোরে সৌদি আরবের একজন অভিবাসী শ্রমিক কালামের পরিবার কেবল সন্তানের কোচিং সেন্টারের ফি দেওয়ার জন্য মহামারীর সময়ে স্থানীয় একটি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল। এভাবে তারা তাঁদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির মধ্যে থাকা একমাত্র কন্যার জন্য মাসে ২২০০ টাকা করে কোচিং ফি পরিশোধ করেছিল। অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের অভিবাসী শরীয়তপুরের হারুনের পরিবার বাচ্চাদের প্রাইভেট টিউটর ও কোচিং সেন্টারের খরচ বহন করতে খাদ্যসামগ্রী, পরিবহন ইত্যাদির খরচ কমিয়ে ফেলেছিল। তারা বলেছিল, 'শিশুদের শিক্ষা আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে আমরা আমাদের অপ্রয়োজনীয় ও দামী খাবার খরচ কমিয়ে কোভিড-১৯ এর সময়ে বেঁচে থাকার জন্য কেবল মৌলিক খাবার যেমন ভাত, আলু, মসুর ডাল খেয়ে থেকেছি'। এই উদাহরণগুলি দেখায় যে কীভাবে প্রবাসীদের রেখে আসা পরিবারগুলি যার-যার প্রেক্ষাপটের দাঁড়িয়ে নিজস্ব উদ্যোগের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পাওয়ার কৌশলগুলি কাজে লাগিয়েছিল।

এমন কিছু ঘটনাও ছিল যেখানে অভিবাসী পরিবারগুলি তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। কারণ তারা শিক্ষার খরচ মেটানোর মতো টাকা জোগাতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিছু পরিবার এমনকি মহামারী চলাকালে শিক্ষার খরচ থেকে মুক্তি পেতে তাঁদের কন্যাদের বিয়ে দেওয়ার পথ বেছে নিয়েছিল। যেমন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত ঝিনাইদহের সালামের পরিবার বলেছে, 'কোভিড-১৯ আমাদের এমন আর্থিক কষ্টের মধ্যে ফেলেছিল, এক পর্যায়ে আমরা মাসে মাত্র ৪ হাজার টাকা করে বাঁচাতে আমাদের বড় মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ওই টাকাটা আমরা তাকে কলেজে পড়ানোর জন্য ব্যয় করতাম। সে এই বছর তার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং আমরা তার প্রাইভেট টিউশন, কোচিং সেন্টার, পরীক্ষার ফি কোনোটাই দিতে পারিনি। আমাদের মেয়ে খুব মেধাবী ছিল। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ভাল গ্রেডও পেয়েছিল। আমরা কমপক্ষে তাকে স্নাতক পাশ করানোর স্বপ্ন দেখেছিলাম যাতে সে ভালভাবে জীবনযাপন করতে পারে এবং পারিবারিক আয়ে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু স্বপ্নটি ভেঙে যায়, কারণ কোভিড-১৯ এ আমাদের একমাত্র উপার্জনকারী মানুষটি (সালাম, সংযুক্ত আরব আমিরাতে অভিবাসী) বেকার'। কোভিড-১৯ এর আগে সালাম প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা করে পাঠাতেন। কিন্তু আগের তিন মাসে একটি পয়সাও পাঠাতে পারেননি। 'বরং আমরাই পারিবারিক সঞ্চয় ভেঙ্গে তাঁকে প্রায় ২৫ হাজার টাকা পাঠিয়েছি, যাতে তিনি এই দুর্দিনে বেঁচে থাকতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে, আমরা আমাদের মেয়েকে সুশিক্ষিত করার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি'।

স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা হ্রাস: কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব অভিবাসীদের পরিবারে স্বাস্থ্যসেবা খোঁজার আচরণেও পরিবর্তন এনেছে। অনেক পরিবার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দিলেও ডাক্তারের কাছে এবং হাসপাতালে যাননি। জরিপে দেখা গেছে ২৬ শতাংশেরও বেশি পরিবারে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে; যেমন ঠাণ্ডা লাগা জ্বর, গলা ব্যথা ইত্যাদি। মাত্র ১০ শতাংশ পরিবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল; তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত বলে পরীক্ষায় ধরা পড়েছিল। তবে তাঁদের বাড়িতেই চিকিৎসা করা হয়েছিল। অভিবাসী পরিবারে এই নিম্ন মাত্রার স্বাস্থ্যসেবা-প্রত্যাশী আচরণের একটি কারণ হতে পারে এই যে, তারা ভেবেছিল ডাক্তারদের চেম্বার এবং হাসপাতালগুলি কোভিড-১৯ এর উৎস। কেননা অনেক উপসর্গযুক্ত ব্যক্তি হয়তো ডাক্তারের চেম্বারে বা হাসপাতালে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি, কোভিড-১৯ এর উপসর্গ বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালরকম অস্পষ্টতা ছিল। অনেকেই মনে করেছিল যে তারা মৌসুমী ফ্লু বা ঠাণ্ডায় আক্রান্ত। সেজন্য চিকিৎসার ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। অভিবাসী পরিবারের যে অংশটি বড় অসুস্থতার কারণে তাঁদের পরিবারের কাউকে না কাউকে ডাক্তারের কাছে কিংবা হাসপাতালে নিয়ে গেছেন, চিকিৎসা বিল পরিশোধ করা তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কাতারে অভিবাসী একজনের স্ত্রী সালিমা বলেন, 'আমার ছেলে প্রস্রাবের সংক্রমণে ভুগছিল। প্রাথমিকভাবে, তাকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মেনে বাসায় রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছিল। এক পর্যায়ে তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং হাসপাতালে নেওয়ার মতো টাকা না থাকায় আমি অসহায় হয়ে পড়ি। বিদেশে কোনো কাজ না থাকায় আমার স্বামী টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেন। সেই সময়, আমি আমার এক আত্মীয়ের কাছে গিয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে ১০ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। এটি আমাকে আমার ছেলের চিকিৎসার খরচ বহন করতে সাহায্য করেছে।' চট্টগ্রামের আরেক অভিবাসীর কন্যা হঠাৎ পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে এবং পরে অ্যাপেনডিসাইটিসে অস্ত্রোপচার করা হয়। এই ঘটনায়, হাসপাতালের বিল বহন করার জন্য অভিবাসীর পরিবার তাঁদের প্রতিবেশীর কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল।

আচার-অনুষ্ঠানের খরচ কমানো: অভিবাসনের প্রভাব সম্পর্কে আগের গবেষণাগুলিতে (সিদ্দিকী ও আনসার, ২০২০; সিদ্দিকী ও মাহমুদ, ২০১৮) দেখা গেছে যে অভিবাসী এবং তাঁদের পরিবার স্থানীয় উন্নয়ন এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান যেমন কমিউনিটি ক্লাব, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, মসজিদে দান করছে। কিন্তু মহামারীর সময়ে রেমিট্যান্স আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ স্থগিত হওয়ায় অভিবাসীদের পরিবারগুলি তাঁদের দৈনন্দির গৃহস্থালির চাহিদা পূরণে মনোযোগী হয়, যেমন খাদ্য, শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা। এমন কোনো পরিবার ওই সময়ে পাওয়া যায়নি যারা আগের মতো স্থানীয় উন্নয়নে কিংবা দানবাবদ অর্থ খরচ করছে। এমনকি প্রায় ১০০ ভাগ পরিবার জনপ্রিয় উৎসব, যেমন পহেলা বৈশাখ, ঈদ-উল ফিতর এবং ঈদ-উল আযহা ইত্যাদি উদযাপনের খরচ করা থেকে বিরত থাকে। চট্টগ্রাম জেলার এক অভিবাসী পরিবার জানায়, 'কোরবানির সময় আমাদের পরিবারে বড় পশু কেনার ঐতিহ্য ছিল। গত বছর আমরা কোরবানরি গরু কেনা বাবদ এক লাখ টাকা খরচ করেছি কিন্তু এ বছর আমরা একটি ছাগলও কিনতে পারিনি। কারণ আমাদের পরিবারের দুই অভিবাসী সদস্যের কেউই কোনো রেমিট্যান্স পাঠাতে পারেনি'। তাছাড়া, তাঁদের মধ্যে একজন কোভিড-১৯ মহামারীর সময় হঠাৎ ইতালি থেকে ফিরে এসে আরও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছিল। মৃত অভিবাসী মাসুদ মিয়ার স্ত্রী বলেছিলেন, 'আমার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর কারণে আমরা অনেক চাপের মধ্যে ছিলাম, আমরা সবাই নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিলাম এবং ঈদ উল ফিতরের দিন কখন এসেছিল তাও টের পাইনি। আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে (পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী) আমার সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হলো কীভাবে আমি তাঁর করা ঋণ পরিশোধ করবো। অসুস্থ হয়ে বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর তিনি স্থানীয় একটি সংস্থার কাছ থেকে ঋণ করেছিলেন'। টাঙ্গাইলের আরেক অভিবাসী পরিবার বলেছে, 'এ বছর আমরা বিশেষ কোনো দিন পালন করিনি, যেমন ঈদ কিংবা আমার সন্তানের জন্মদিন। আমরা কেবল তিন বেলা খাবার নিশ্চিত করার দিকে মনোনিবেশ করেছিলাম'।

পরিবারের একীভূতকরণ: খরচ কমানোর আরেকটি কৌশল ছিল পরিবারগুলিকে একত্রিত করা। কখনও কখনও এ ধরনের একত্রীকরণ পিতামাতার বা শ্বশুরবাড়ির লোকদের সাথে ঘটেছিল। জরিপে দেখা গেছে, সংসারের মাসিক খরচ কমাতে শহুরে এবং আধা শহুরে অবস্থানে থাকা কিছু পরিবার তাঁদের নারী সদস্যদের গ্রামে তাঁদের শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। যেমন, বাহরাইনের প্রবাসী শ্রমিক মোর্শেদের স্ত্রী গাজীপুর সদর এলাকায় তাঁর ভগ্নিপতির (ফজল) পরিবারের সাথে একই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার পরে, মোরশেদ এবং তাঁর ভাই ফজল তাঁদের স্ত্রীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য মাদারীপুর জেলার একটি গ্রামে, তাঁদের পিতামাতার বাড়িতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর পরে, অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য ফজল একটি ঘর অন্য ভাড়াটিয়ার কাছে ভাড়া দেন। ফজল বলেছিলেন, 'মোর্শেদ, আমার অভিবাসী ভাই, এবং আমি ছিলাম আমাদের পরিবারের উপার্জনকারী লোক। কিন্তু, মহামারী শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার ভাই বিদেশে চাকরি হারান। আমার সামান্য আয় দিয়ে আমি প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়াসহ পারিবারিক খরচ বহন করতে পারছিলাম না। তাই আমি আমাদের মহিলাদের তাঁদের পিতামাতার বাড়িতে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং মাসিক ৩ হাজার টাকায় বাসার একটি ঘর ভাড়া দিয়েছি। এটুকু বাড়তি অর্থ আমাকে শহরে ফিরে আয় বাড়ানোর পথ খুঁজতে সাহায্য করেছিল'। এ ধরনের মোকাবিলা কৌশল দেখা যায় বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের সুপার সাইক্লোনের সময়। সেসময়ও পরিবারের নারীদের তাঁদের পিতামাতার বাড়িতে পাঠানো হয়, কারণ তারা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে তাৎক্ষণিক আর্থিক কষ্ট এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি সহ্য করতে পারে না (পল, ১৯৯৮)।

এই কৌশলগুলির অনেকগুলির লিঙ্গীয় মাত্রা রয়েছে। রেমিট্যান্স সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থগিতের কারণে আয়ের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য অভিবাসীদের রেখে যাওয়া স্ত্রীরা তাঁদের আবাসস্থল বদলে ফেলেছিলেন। যদিও

শ্বশুরবাড়ির পরিবারের সঙ্গে মিশে যাওয়ার পর অভিবাসীদের স্ত্রীরা নতুন ধরনের নাজুকতার মধ্যে পড়েছে কিনা, এই গবেষণা সেদিকে অগ্রসর হয়নি। যাইহোক, এটা বলা যেতে পারে যে অভিবাসীদের স্ত্রীদের ওপর পরিবার একীকরণের প্রভাব তাঁদের স্বামীদের চেয়ে আলাদাই হবে। অন্যদিকে, এই সমীক্ষার জরিপে রেখে-যাওয়া স্বামীদের মোকাবিলার কৌশলগুলি খতিয়ে দেখা হয়নি। তবে, এর আগে নারী অভিবাসনের প্রেক্ষাপটে আকর্ষণীয় অনুসন্ধানগুলি নথিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেখানে দেখা গেছে যে অনেক স্বামীই তাঁদের অভিবাসী স্ত্রীদের অনুপস্থিতিতে পরিবার পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাই তাঁরা তাঁদের পরিবারকে তাঁদের পিতামাতার সাথে বা শ্বশুড়ের পরিবারের সাথে একত্রিত করেন (সিদ্দিকী, ২০০১)। সাম্প্রতিক প্রবণতা হলো, অভিবাসীদের স্বামী-স্ত্রী ও শিশুরা একান্নবর্তী পরিবার থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের একক পরিবার প্রতিষ্ঠা করছে (সিদ্দিকী এবং আনসার, ২০২০)। কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে আবার সেই পরিবারগুলি তাঁদের সাবেক বর্ধিত পরিবারে ফিরে যাচ্ছে।

পারিবারিক আয় বহুমুখীকরণ/সম্পূরক কৌশল: অভিবাসীদের রেখে যাওয়া পরিবারগুলি সম্পূরক আয় এবং আয় বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রেমিট্যান্সের শূন্যস্থান পূরণে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। একইভাবে, ব্যয় কমানোর কৌশলের মতো আয়বৃদ্ধির কৌশলগুলিও ব্যাখ্যামূলক মডেলের তিনটি কৌশলের মিশ্রণকে প্রতিফলিত করে: স্ব-সংহতি, সামাজিক-সংহতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংহতির আয়োজন।

ঋণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি: প্রায় ৫৫ শতাংশ পরিবার বিভিন্ন স্থানীয় উৎস থেকে টাকা ধার করেছে। এ ব্যাপারে পরিবার প্রাথমিকভাবে তারা তাঁদের অবস্থাপন্ন আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের দ্বারস্থ হন। রেখে-আসা অভিবাসী পরিবারের একটি অংশ স্থানীয় এনজিও/ ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার কাছ থেকে উচ্চ সুদের হারে অর্থ ধার নিয়েছিল যা তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক সংহতির কৌশল ব্যাখ্যা করে। যেমন, ঝিনাইদহ জেলার একটি অভিবাসী পরিবার স্থানীয় ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার কাছ থেকে উচ্চ সুদে ৫০ হাজার টাকা ধার নিতে বাধ্য হয়েছিল; যেহেতু পরিবারের অভিবাসী সদস্য সৌদি আরবে চাকরি হারিয়ে প্রায় চার মাস টাকা পাঠাতে ব্যর্থ হয়। সুদের হারটি কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় দুইগুণ বেশি যা পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আলম (২০০৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষিতে একই ধরনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পুনর্বাসন কর্মসূচির অভাবের কারণে অনেকে ঋণ নিয়ে টর্নেডোর ক্ষতি মোকাবিলার কৌশল নিয়েছিল।

কোভিড-১৯ দ্বারা তৈরি হওয়া দুর্দশার মধ্যে অভিবাসী পরিবারগুলি ঋণের জন্য স্থানীয় উৎসগুলি ছাড়াও, তাঁদের সামাজিক নেটওয়ার্কের ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভর করে। এদের মধ্যে ছিল সম্প্রসারিত পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু এবং প্রতিবেশীরা। টাঙ্গাইল জেলার একজন অভিবাসীর স্ত্রী সোফিয়া বলেন, 'আমার চাচাতো ভাইয়েরা যদি না এগিয়ে আসত তাহলে এই কঠিন সময়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। বিনা দ্বিধায় আমি আমার ভাইদের কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিলাম এবং আমি কমপক্ষে তিনবার তাঁদের থেকে কর্জ করেছিলাম'।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আয়ের ওপর নির্ভরতা: পরিবারে অতিরিক্ত উপার্জনকারী সদস্য থাকা মানে অভিবাসীদের পরিবারের জন্য ভরসা করার জায়গা পাওয়া। এই গবেষণার আওতাভুক্ত ১৮ শতাংশ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আয়ের ওপর নির্ভর করে। যেসব পরিবার থেকে অর্থ ধার করা হয়েছিল তাঁদের সদস্যরা এখনও আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত ছিলেন এবং কোভিড-১৯ এর সময় তারা নিয়মিত বেতন পেতে থাকেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আয় এইভাবে এই পরিবারগুলিকে রেমিট্যান্সের আংশিক এবং সম্পূর্ণ স্থগিতের কারণে আয়ের ক্ষতির মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরব থেকে আসা অভিবাসী

রায়হান গত তিন মাস ধরে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারেননি। কর্মস্থল সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার কারণে তিনি নিয়োগকর্তার কাছ থেকে বেতন পাননি। এটা তার পরিবারের জন্য আর্থিক দুর্ভোগ তৈরী হয়েছিল। কারণ রেমিট্যান্সই ছিল ওই পরিবারের মোট আয়ের প্রায় অর্ধেক। তা সত্ত্বেও, পরিবারটি কোনোভাবে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল এজন্য যে, রায়হানের ছেলে (বারেক) স্থানীয় একটি এনজিও'র বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন। বারেকের আয় কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি কারণ তিনি একটি দাতা সংস্থার অর্থায়িত প্রকল্পের নিযুক্ত ছিলেন। তাই বারেকের আয় মহামারী চলাকালীন রায়হানের পরিবারের জন্য উল্লেখযোগ্য সহায়তা নিয়ে এসেছিল।

আনুষ্ঠানিক সহায়তা প্রাপ্তি: কোভিড-১৯ জনিত সংকটের প্রতিক্রিয়ায়, বাংলাদেশ সরকার দুর্বল জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। এ ধরনের খাদ্য সহায়তার মধ্যে প্রায়শই মূল খাদ্য তথা ভাত, আলু এবং তেলের মতো আপাত অপচনশীল সামগ্রী থাকে। অনুমান করা হয়েছিল যে সরকার প্রায় ৫০ মিলিয়ন মানুষের জন্য খাদ্য ভর্তুকি দিয়েছে এবং ৫ মিলিয়ন দরিদ্র পরিবার মোবাইল ব্যাংকিং মারফত ২৫০০ টাকা করে পেয়েছে। যাইহোক, এই ত্রাণ সবার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। প্রধান খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ধান সংগ্রহে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই লক্ষ্যে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন সহায়তার আদলে কৃষকদের কাছ থেকে চড়া দামে চাল কিনেছে। এই উদ্যোগটি সবজি, মাছ বা হাঁস-মুরগি চাষীদের জন্য বাড়ানো হয়নি। এছাড়াও অনেক ব্যক্তিগত নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, নোয়াখালী জেলার একজন সংসদ সদস্যের অধীনে তাঁর নির্বাচনী এলাকার হাজার হাজার পরিবার চাল, পেঁয়াজ এবং আলু ছাড়াও স্থানীয় বাজার এবং সংলগ্ন উপকূলীয় মাছ অবতরণ কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত ২-৪ কেজি করে মাছ পেয়েছে (সিজিআইএআর, ২০২০)। এর উদ্দেশ্য ছিল খাদ্যতালিকায় পুষ্টিঘন উপাদানগুলি যোগ করা, এবং যা দুর্বল পরিবারের অপুষ্টি রোধে সাহায্য কওে; যা সাধারণত প্রচলিত খাদ্য সহায়তা প্যাকেজে অনুপস্থিত থাকে। এছাড়াও, স্থানীয় এনজিওগুলির সাথে অংশীদারির মাধ্যমে অনেক দাতব্য সংস্থা দেশের বিভিন্ন স্থানে দরিদ্র পরিবারে খাদ্য প্যাকেজ বিতরণ করে।

চিত্র ৭.৭ দেখায় যে ১৪ শতাংশ অভিবাসী পরিবার সরকারি, বেসরকারি এবং দাতব্য সংস্থার কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছে। যাইহোক, অনেক পরিবার অভিযোগ করেছে যে তারা সরকারের কাছ থেকে সামাজিক সুরক্ষা প্রত্যাশা করেছিল, কিন্তু তারা কোনো সহায়তা পায়নি; যদিও তাঁদের এলাকার অনেক পরিবারকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের পরিবার কেন নগদ অর্থ বা খাদ্য সহায়তার জন্য নির্বাচিত হয়নি সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিল না। অভিবাসী পরিবারগুলি ধরে নিয়েছিল যে ত্রাণ বিতরণকারীরা ভাবতে পারে যে তারা তাঁদের পরিবারের অভিবাসী সদস্যদের কাছ থেকে রেমিট্যান্স পেয়েছে, তাই তাঁদের ত্রাণ সহায়তার দরকার নেই। একজন অভিবাসী শ্রমিকের বাবা আবু বকর বলেন, 'কেউ আমাদের পাত্তা দেয়নি; এমনকি সামাজিক মর্যাদা হারানোর ভয়ে আমরাও অন্যদের কাছে সাহায্য চাইতে পারিনি'।

চিত্র ৭.৭: কোভিড-১৯ এর সময় পারিবারিক আয়ের উৎস

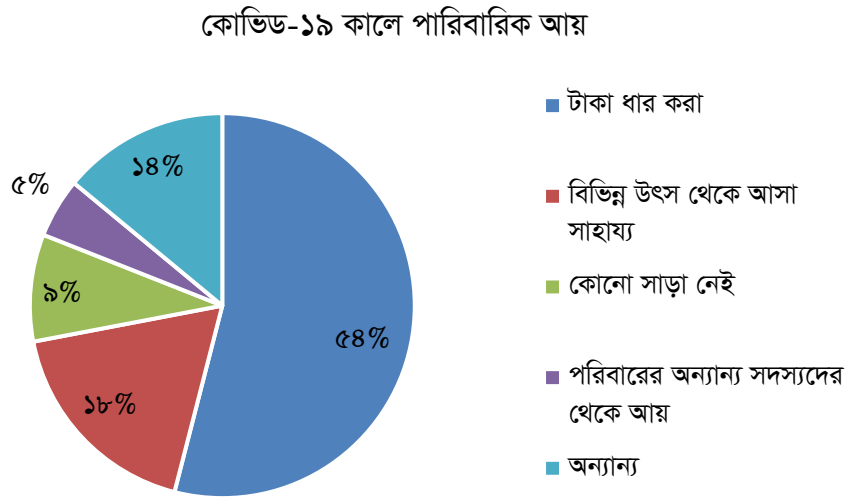

সূত্র: বিসিএসএম ও রামরু জরিপ ২০২০

সঞ্চয় কমে যাওয়া এবং সম্পদ বিক্রয়: রেমিট্যান্স স্থগিতকরণ বিশেষ করে রেমিট্যান্সের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পরিবারগুলির জন্য তীব্র অর্থনৈতিক কষ্ট ডেকে এনেছে। আকস্মিক মৃত্যু এবং বন্যা, ঋণ, যৌতুক প্রভৃতি ধাক্কায় ভোগা পরিবারগুলির জন্য এই অবস্থা আরও খারাপ ছিল। চট্টগ্রাম জেলার একটি পরিবার জানিয়েছে যে পরিবারের তিন অভিবাসী সদস্যের চাকরি চলে যাওয়ায় তারা ১১৬.৬ গ্রাম সোনার গয়না বিক্রি করেছে। রেমিট্যান্স ছিল তাঁদের পারিবারিক আয়ের একমাত্র উৎস। মহামারীর সময় তিন অভিবাসী সদস্যের মধ্যে একজন হঠাৎ করে দেশে ফিরে আসায় পরিবারটিকে বড় ধাক্কা সহ্য করতে হয়। অন্য দুই অভিবাসী কোনোভাবে বিদেশে বেঁচে থাকলেও কোনো রেমিট্যান্স পাঠাননি। রেমিট্যান্সের অভাবে, পরিবার প্রাথমিকভাবে তাঁদের ব্যাংকের সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে। এক মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসাবে বরকে ৫ লাখ টাকা দিতে হওয়ায় তাঁদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে।

আরেক অভিবাসী, টাঙ্গাইল জেলার মাসুদ মিয়া কাতারে নির্মাণ খাতে কাজ করতেন। কোভিড-১৯ এর সময় তাঁকে আটক করা হয় এবং পরে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। তিনি বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিলেন কারণ তাঁর পরিবারের আর কোনো আয়ের উপায় ছিল না। হঠাৎ ফেরার পর জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি একটি স্থানীয় সংস্থার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন। মাসুদ মিয়ার পরিবারের দুর্দশা সেখানেই শেষ হয়নি। দেশে ফেরার এক মাসের মধ্যে তিনি মারা যান। তাঁর স্ত্রী সালমা জানতেন না কীভাবে এই পরিস্থিতিতে সংসার সামলাবেন। কয়েক মাস বেঁচে থাকার জন্য তিনি দুটি গরু বিক্রি করেছিলেন। কিন্তু তিনি জানেন না কীভাবে স্বামীর করা ঋণ পরিশোধ করবেন বা ভবিষ্যতে তাঁর সন্তানদের খাওয়াবেন। কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে রেমিট্যান্স প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে টাঙ্গাইল জেলার কিছু পরিবার তাঁদের গয়না বিক্রি করে দেয়। এদিকে বর্ষার বন্যায় তাঁদের ফসলি জমি তলিয়ে যায়। এই দুর্দশাগুলি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে ঘটা একই ধরনের বিপন্নতাকে প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপ, পল (১৯৯৮) দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের ১৯৯৪-৯৫ এর খরার সময় বিপন্নতা কমাতে মানুষ জিনিসপত্র বিক্রি করেছে। এর মধ্যে ছিল তাঁদের গবাদি পশু ও জমি। জমি বন্ধক রাখাও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ৫: অধ্যায় উপসংহার

বিশ্বের অনেক অংশে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে রেমিট্যান্সের আংশিক বা সম্পূর্ণ স্থগিত হওয়া অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারকে ভুগিয়েছে। এই পটভূমিতে, একটি প্রাথমিক জরিপ এবং সংবাদ প্রতিবেদনসমূহের ওপর ভিত্তি করে এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে রেমিট্যান্সের অনিয়মিত প্রবাহ এবং বিশেষ করে মহামারীর প্রথম তিন মাসে রেমিট্যান্সের অনুপস্থিতি অভিবাসী পরিবারের ওপর গুরুতর চাপ সৃষ্টি করে। প্রবাসীদের রেখে-আসা পরিবারের আয়ের লক্ষ্যণীয় অংশটাই আসে রেমিট্যান্স থেকে। অনেক অভিবাসী পরিবারের জন্য, রেমিট্যান্স ছিল পারিবারিক আয়ের একমাত্র উৎস। তাই, রেমিট্যান্সের প্রবাহ ব্যাহত হলে অভিবাসীদের পরিবারে মারাত্মক আর্থিক কষ্টের সৃষ্টি হয়। এর ফলে এই পরিবারগুলি কোভিড-১৯ দ্বারা উদ্ভূত কঠিন সময় সহ্য করার জন্য বহু ধরনের মোকাবিলা কৌশল নিতে বাধ্য হয়। খেয়াল করার বিষয় হলো, মোকাবিলার এই কৌশলগুলির সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা, আর্থিক সংকট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষিতে অনেক দরিদ্র ও নাজুক অবস্থার পরিবারের ঐতিহাসিক অভিযোজন কৌশল মিলে যায়। মোটা দাগে, অভিবাসী পরিবারের মোকাবিলা কৌশলগুলিকে দুটি প্রধান ধারায় ভাগ করা যেতে পারে: গৃহস্থালির ব্যয় হ্রাস এবং সম্পূরক আয়/আয় বহুমুখীকরণ কৌশল। ব্যাখ্যামূলক মডেল দ্বারা এটিকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পাওে, যার মধ্যে রয়েছে: স্ব-সংহতি, সামাজিক সংহতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংহতির আয়োজন।

মোকাবিলা কৌশল গ্রহণ কোনো রৈখিক আদল অনুসরণ করেনি। অভিবাসী পরিবারগুলি দ্বিতীয় বিকল্পটি বেছে নেওয়ার আগে প্রথম বিকল্প নিঃশেষিত করে। কিছু ক্ষেত্রে, তৃতীয় বা চতুর্থের বদলে তারা আওতার মধ্যেকার পঞ্চম বিকল্প বেছে নেয়। এর পেছনে অনেকগুলি কারণ ছিল যা অত্যন্ত জটিল উপায়ে মিথস্ক্রিয়া করে এবং অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারের মোকাবিলা কৌশলকে একটা অবয়ব দেয়। এর মধ্যে রয়েছে: গন্তব্যের দেশগুলিতে অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের অবস্থা, কোভিড-১৯ এর সময় রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ, গ্রাম বা শহরের বিবেচনায় অভিবাসী পরিবারের অবস্থান, পরিবারের আয়তন, পরিবারের আয়ের উৎস, সম্পদ, সঞ্চয়, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার স্তর, একই সময়ে অন্যান্য চাপ ও ধাক্কার মুখে পড়া, ঋণগ্রস্থতা, পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার লিঙ্গীয় মাত্রা, পরিবারের সামাজিক পুঁজি (সামাজিক যোগাযোগ), প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ ইত্যাদি।

যদিও রেখে-আসা অভিবাসী পরিবারের জন্য মোকাবিলার সাধারণ কৌশল নির্ধারণ করা কঠিন, কিন্তু রেমিট্যান্সের আংশিক এবং সম্পূর্ণ স্থগিতকরণ অভিবাসী পরিবারগুলিকে পরিবারের মাসিক খরচ ও বর্জনযোগ্য খরচ ব্যাপকভাবে কমিয়ে সামঞ্জস্য আনতে বাধ্য করেছিল। তাঁদের এই কৃচ্ছতার গড় অনুপাত ছিল প্রাক কোভিড-১৯ সময়ের তুলনায় ৫৭ শতাংশ।

অভিবাসী পরিবারগুলি পারিবারিক খরচ কমাতে নিজ নিজ সক্রিয়তায় আপন উদ্যোগের কৌশল নেয়। এই কৌশলগুলির মধ্যে অনেকগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আর তা হয়েছিল কোভিড-১৯ এর কারণে রেমিট্যান্স স্থগিতের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে। অতএব, অভিবাসী পরিবারগুলি প্রাথমিকভাবে তাঁদের খাদ্য গ্রহণের সাথে আপস করে, বিশেষ করে মাংস, মাছ ইত্যাদি আকারে প্রোটিন গ্রহণ কমায়; খাদ্য তালিকায় পদের সংখ্যা কমায়। তারা শিশুদের খাবারকে অগ্রাধিকার দেয়। অপরিহার্য নয় এমন খাদ্য-বহির্ভূত সামগ্রীর ব্যয়ও লক্ষ্যণীয়ভাবে কমিয়ে আনে। বাদ দেয় দাতব্য কাজ, উৎসব ও অনুষ্ঠান। অর্থের অভাবে অভিবাসী পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা খোঁজার আচরণও কমে গিয়েছিল। তারা ধরে নিয়েছিল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলি কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের সম্ভাব্য উৎস। বিপরীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও, অভিবাসী পরিবারগুলি আর্থিক কষ্টের মধ্যে সন্তানদের শিক্ষাকে

অগ্রাধিকার দিয়েছিল। তারা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিল যাতে তাঁদের সন্তানেরা প্রাইভেট টিউটর ও কোচিং সেন্টারে যেতে পারে, খাদ্য-চিকিৎসা ও অন্যান্য খরচ কমিয়ে যাতে টিউশন ফি দিতে পারে। গৃহস্থালির খরচ কমাতে অভিবাসী পরিবারের নেওয়া কৌশলের সামাজিক এবং লিঙ্গগত প্রভাব রয়েছে। কিছু কিছু অভিবাসী পরিবার তাঁদের সদস্যদের তাঁদের পিতামাতার সাথে বা নারী সদস্যদের তাঁদের শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে পরিবারের একীকরণ করেছে। আবার মেয়েদের পড়ালেখা চালাতে না পেরে তাঁদের বাল্যবিবাহ দিয়েছে। এই কৌশলগুলি হয়তো আপাতভাবে অভিবাসী পরিবারগুলিকে আর্থিক সংকট মোকাবিলা করতে সাহায্য করেছে, কিন্তু সেসব নারীদের জন্য নতুন নাজুকতা তৈরি করে থাকতে পারে।

রেমিটেন্স থেকে পাওয়া পারিবারিক আয়ের সম্পূর্ণ এবং আংশিক ক্ষতি অনেক অভিবাসী পরিবারকে আয়ের বহুমুখীকরণের কৌশল অবলম্বনে বাধ্য করে যা মূলত তাঁদের সংহতি-ভিত্তিক প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত। এর দ্বারা বোঝা যায় যে অভিবাসী পরিবারগুলি দুঃসময়ে তাঁদের সামাজিক নেটওয়ার্ক বিশেষ করে সম্প্রসারিত পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার কতরে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা নিজেদের এবং যাদের কাছে সাহায্য আশা করে তাঁদের সঙ্গে সংহতি বাড়ায়। অন্য ক্ষেত্রে তাঁদের শুভানুধ্যায়ীরা এগিয়ে আসে এবং উদার সহযোগিতা প্রদান করে। এসব সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে: পরিবারের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, শিক্ষা এবং পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা পূরণের জন্য অর্থ ধার দেওয়া; আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শুকনো খাবার পাওয়া, অসুস্থ পরিবারের সদস্যদের সাথে হাসপাতালে যাওয়া ইত্যাদি।

কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে রেমিট্যান্সের শূন্যতা পূরণ করতে পরিবারগুলি প্রথমেই আয় নিশ্চিত রাখতে চেয়েছে। এর জন্য তারা তাঁদের নিজস্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি কৌশলগুলির সংমিশ্রণও ঘটায়। এর মধ্যে ছিল প্রধানত স্থানীয় উৎস থেকে ঋণ করা, যেমন ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা, এবং কিছু ক্ষেত্রে সরকার, বেসরকারি এবং দাতব্য সংস্থার কাছ থেকে নগদ এবং খাদ্য সহায়তা উভয়ই গ্রহণ করা। যাইহোক, সরকারী ত্রাণ ও সহায়তা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার না পাওয়ায় অভিবাসী পরিবারের মধ্যে চরম হতাশা ছিল। অভিবাসী পরিবারগুলির বেশিরভাগকেই সরকার পরিচালিত সুরক্ষা ও সহায়তা কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়নি; কারণ স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণ/সহায়তা বিতরণকারীদের মধ্যে এই বিতর্কিত ধারণা ছিল যে, অভিবাসী পরিবারগুলি তাঁদের অভিবাসী সদস্যদের থেকে রেমিট্যান্স পাবে। তাছাড়া অভিবাসী পরিবার সরকারের কাছে সহায়তা চাইতে দ্বিধান্বিত ছিল। তারা মনে করেছিল যে এটি তাঁদের সামাজিক অবস্থানের অবনতি ঘটাবে। এগুলি ছাড়াও, রেখে-যাওয়া অভিবাসী পরিবারগুলি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আয়ের ওপর নির্ভর করে। এটা তাঁদের আর্থিক যন্ত্রণা থেকে সাময়িক পরিত্রাণও দেয়। যাহোক, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিবাসীদের পরিবারের সদস্য কোভিড-১৯ দ্বারা উদ্ভূত অভূতপূর্ব ও কঠিন সময়ে বেঁচে থাকার জন্য তাঁদের বিদ্যমান সঞ্চয় ভাঙ্গা এবং জমি ও গয়নার মতো সম্পদ বিক্রি করতেও বাধ্য হয়েছিল। অনেক পরিবারই কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধাক্কা ও চাপের কারণে নেতিবাচক মোকাবিলা কৌশল নিতে বাধ্য হয়েছিল। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে পরিবারের কারো মৃত্যু, পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, ঋণগ্রস্ততা, বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যৌতুক এবং অভিবাসীদের কারো কারো স্থায়ীভাবে দেশে ফিরে আসার ফলে আয়ের ক্ষতি।

অষ্টম অধ্যায়

সহিষ্ণুতার সাধনা: কোভিড-১৯ এর মধ্যে অভিবাসন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা পুনর্বিবেচনা

আনাস আনসার, মেরিনা সুলতানা এবং রঞ্জিত চন্দ্র দাস

গবেষণাগুলি ভালভাবেই দেখিয়ে দেয় যে প্রতিটি জরুরি পরিস্থিতিতে লিঙ্গ-বৈষম্য ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বাড়ে (শর্মা ও বোরাহ, ২০২০; ডেকার প্রমুখ, ২০২১; পেলোস্কি প্রমুখ, ২০১৩; মুখার্জি, ২০০৭)। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব আগের এ গবেষণালব্ধ ফলাফলকে নিশ্চিত করে। বর্তমান মহামারী পরিস্থিতিতে নারীদের সুরক্ষা ও মৌলিক পরিষেবার ঘাটতিসহ বেশ কিছু অসমতা ও বিপন্নতা আরো বেড়েছে। চলমান কোভিড-১৯ মহামারী বর্তমান বৈশ্বিক বৈষম্যকে আরো উন্মোচিত ও গভীর করেছে। এই সংকট অনেকভাবেই লিঙ্গভিত্তিক। বেরিয়ে আসা তথ্য থেকে বোঝা যায়, মহামারী বিশ্বব্যাপী গার্হস্থ্য এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাকে তীব্র করে তুলেছে (ইউএন উইমেন, ২০২০)। বর্তমান পরিস্থিতিতে, বেশ কিছু নীতিগত পদক্ষেপ নারীদের বিশেষ প্রয়োজনগুলি বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হওয়ায় নারীরা আলাদা করে বিপন্ন হয়েছে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি অনেক সমাজে তারা সাংস্কৃতিক নিষেধাজ্ঞার মুখেও পড়েছে।

এই ধরনের একপেশে কাঠামোর মধ্যে অভিবাসনের অবস্থানের পরস্পরছেদ আরও বেশি সমস্যাজনক। বাড়িতে সহায়-সম্বলের টানাটানির মধ্যে, রেমিট্যান্সের নামক অবলম্বনের অভাব এবং আকস্মিক লকডাউনের কারণে হঠাৎ করে চলাচলের বিধিনিষেধে কড়াকড়ির মধ্যে অভিবাসী পরিবারের অনেক নারী পারিবারিক সহিংস পরিস্থিতিতে আটকা পড়ে থাকতে পারে। একইভাবে, বিদেশে অনেক নারী অভিবাসী শ্রমিক অনিশ্চিত জীবনযাপন করছে। বাছবিচারহীনভাবে যাদের দেশে ফিরতে বাধ্য করা হয়, দেশে আসার পর তারা মারাত্মক দুর্দশা ও সামাজিক কলংকায়নের অভিজ্ঞতা পেয়েছে। সুতরাং, একদিকে মহামারী গন্তব্য দেশগুলিতে ইতিমধ্যে শোষণমূলক পরিস্থিতিতে গৃহকর্মী হিসাবে কর্মরত বেশিরভাগ নারীর মর্যাদা ও অনিশ্চয়তার অভাবকে সামনে এনেছে। অন্যদিকে, জোর করে ফেরত পাঠানো পুরুষ অভিবাসীর প্রত্যাবর্তন ও বেকারত্বের পরিস্থিতি পরিবারের স্ত্রীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং এমনকি ব্যক্তিগত নাজুকতাকেও উশকে দিয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে অভিবাসী নারী এবং দেশে থাকা অভিবাসী পরিবারের নারীদের ওপর কোভিড-১৯ এর অসম প্রভাব পড়ার পরও পরিস্থিতি মোকাবিলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি-পদক্ষেপগুলিতে লিঙ্গ-সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার অভাব দেখা যায় (ইউএন উইমেন, ২০২০; কেয়ার, ২০২০)। অতএব, অভিবাসনের প্রেক্ষাপটে

কোভিড-১৯ এর বিভিন্ন অভিঘাতের যে আন্তঃপ্রভাব নারীদের ওপর পড়ে, নীতি ও চর্চার পরিবর্তনের জন্য তা লিপিবদ্ধ করা খুবই দরকার।

মহামারী ও অভিবাসীদের অনুভূত বিপন্নতার মধ্যে সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে, এই অধ্যায়টিতে বাংলাদেশী অভিবাসী নারী, প্রত্যাবাসিত নারী এবং পুরুষ অভিবাসীদের রেখে-যাওয়া স্ত্রীদের অনিশ্চয়তা ও দুর্বলতার প্রশ্ন পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। যদিও উপসাগরীয় দেশগুলিতে অভিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে কম মজুরি ও শোষণমূলক অর্থনীতির ওপর একরকম ঠেকনা দিয়ে আছে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাঁদের এই নির্ভরতা বহুগুণ বেড়েছে। এই গবেষণায় তাঁদের অনিশ্চয়তার কথাই বলা হয়েছে যারা অনিশ্চয়তা অনুভব করে। এবং এইভাবে অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতা তাঁদের জগত-জীবনের সঙ্গে জড়িয়েই থাকে (ওয়েট, ২০০৯)। শ্রমের নব্য-উদারতাবাদী বিশ্বায়নে অনিরাপদ কর্মসংস্থান এবং মালিক-শ্রমিকের ক্ষমতা-বৈষম্য প্রশমনের ব্যবস্থার অভাবের সাথে হাতে হাত ধরে চলে অনিশ্চয়তা। অনিশ্চয়তা যেমন একটি শর্ত তেমনি এক বিবৃত বাস্তবতা। মুনাফাচালিত পন্থায় অভিবাসী, বিশেষ করে নারী ও নবাগতদের দেখা হয় কঠোর পরিশ্রমী, অধিকতর অনুগত ও নির্ভরযোগ্য এবং কোনো বিকল্পের অভাবে দীর্ঘ সময় কাজ করার জন্য প্রস্তুত হিসেবে। নিয়োগদাতাঁদের কাছে এটা হলো মুনাফা সর্বোচ্চকরণের আদর্শ অবস্থা (ম্যাকেনজি ও ফোর্ড, ২০০৯)। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও তার সঙ্গে জড়িত কর্মজগতের রূপান্তরের মধ্যে সংযোগ কর্মক্ষেত্রে এই ধরনের শোষণ ব্যাখ্যার মূল কাঠামো তৈরি করে দেয় (লুইস প্রমুখ, ২০১৫: ৫৮১)। এর সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোয় কাফালা পদ্ধতির কারণে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ও উৎপাদনী শক্তির ক্ষয়; এই অধ্যায়ের পরের দিকে যার পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই ব্যাখ্যা-কাঠামোর আওতায় এই অধ্যায় পরীক্ষা করে দেখেছে, কীভাবে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সংকট বিদ্যমান লিঙ্গভেদকে আরো বাড়িয়ে তোলে। একইসঙ্গে তা নারী অভিবাসী ও অভিবাসী পরিবারের নারীদের ওপর বিষম প্রভাব রাখার মাধ্যমে নতুন লিঙ্গ-ভিত্তিক বাস্তবতা সৃষ্টি করে। বর্তমান পরিস্থিতি কীভাবে অভিবাসী পরিবারে এবং জবরদস্তিমূলক বৈশ্বিক অভিবাসন ব্যবস্থায় নারীদের (অ)দৃশ্যমান নির্ভরতা আরো বাড়িয়ে তুলছে, এখানে তা উন্মোচন করা হয়েছে। অধ্যায়টি জানাচ্ছে যে, অভিবাসন বলয়ে থাকা নারীদের ওপর কোভিড-১৯ অসম প্রভাব ফেলেছে। এর মধ্যে কেবল লিঙ্গীয় সহিংসতা এবং অন্যান্য শারীরিক নির্যাতনই নেই, অর্থনৈতিক কষ্ট, স্বাস্থ্যের অবনতি, সামাজিক কলংক এবং সবচেয়ে যা বড় তা হলো অনিশ্চয়তা, অসহায়ত্ব এবং অদৃষ্টপূর্ব পরিস্থিতির লাগাতার ভয়। তাৎক্ষণিক প্রভাবের আলোচনা অতিক্রম করে এই অধ্যায় খুবই দরকারি জায়গা দেখতে চেষ্টা করেছে যে, শ্রমের বিশ্বায়ন এবং লিঙ্গভিত্তিক, মুনাফা-চালিত, শোষণমূলক ও অমার্যাদাকর অভিবাসনের ধরন কীভাবে বাংলাদেশের অভিবাসন প্রেক্ষাপটে নারীদের অসমতা ও বিপন্নতার দিগন্ত আরো প্রসারিত করেছে।

উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি: বাংলাদেশ থেকে উপসাগরীয় ও অন্যান্য এশীয় দেশগুলিতে অভিবাসিত এবং বাংলাদেশে অভিবাসী পরিবারের নারীদের ওপর কোভিড-১৯ জনিত বিবিধ অভিঘাত কমানোর নীতি প্রণয়ন ও চর্চাকে আরো সবল করা যায়, তা-ই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে: (ক) নারীদের ওপর কোভিড-১৯ এর অভিঘাতের সঙ্গে জড়িত শারীরিক, মানসিক ও জনস্বাস্থ্যগত ঝুঁকি নথিভুক্ত করা, (খ) বাংলাদেশের অভিবাসন প্রেক্ষাপটে কোভিড-১৯ এর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী লিঙ্গীয় অভিঘাত চিহ্নিত করা, (গ) মহামারীর অভিঘাত প্রশমিত করার ক্রিয়াকর্ম ও কৌশল চিহ্নিত করা এবং কোভিড-১৯ উত্তর পরিস্থিতিতে নারীদের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের টেকসই ব্যবস্থাপনার সহায়ক নির্দেশিকা প্রস্তাব করা।

বইয়ের বাকি অংশের থেকে এই অধ্যায়ে একটি ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে মূলত সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার গুণগত পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা হয়েছে। এই গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি দ্বি-স্তরিক। এই গবেষণার যে ধরন তার জন্য রচনা বিশ্লেষণ এবং বিশদ-গভীর সাক্ষাৎকারের মধ্যে সমন্বয় করা প্রয়োজন যা গুণগত গবেষণায় একটি সাধারণ বিষয়। ক্রেসওয়েল (২০১২) যুক্তি দিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য গবেষণার যুক্তিগুলিকে ন্যায্যতা দেয়। নথি বিশ্লেষণ এবং বিশদ সাক্ষাৎকার উভয়ই যে মূল গবেষণা প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করতে চায় তা হলো, কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য সংকট সেসব নারী অভিবাসী ও দেশে অনিশ্চিত অবস্থায় রয়ে যাওয়া নারীদের ওপর কী প্রভাব ফেলেছে, যারা লিঙ্গীয় ঝুঁকির মধ্যে থাকলেও কেবল যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার নয়।

বিশ্লেষণটি তিনটি ভিন্ন উৎসের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে: পরোক্ষ সূত্রে পাওয়া বিবরণ, কেস স্টাডি এবং সবশেষে মূল তথ্যদাতাঁদের সাক্ষাৎকার, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রতিবাদী কর্মী, এনজিও কর্মী, গবেষক ও নীতিনির্ধারকেরা। বিসিএসএম প্ল্যাটফর্ম এবং এর সদস্য সংগঠনগুলির মাধ্যমে মোট ৪২টি কেস স্টাডি সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে, ১২ জন বর্তমান অভিবাসীর সাক্ষ্য তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে অথবা বিদেশ থেকে সাহায্য চেয়ে এনজিওদের কাছে করা ফোন নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে করা হয়েছিল। এছাড়াও, বিসিএসএম-এর তৃণমূল অংশীদার এনজিওগুলির মাধ্যমে প্রত্যাবাসিত নারী অভিবাসী এবং পুরুষ অভিবাসী পরিবারের স্ত্রীদের গ্রুপের জন্য ১৫টি করে কেস স্টাডি পরিচালিত হয়েছিল। সাক্ষাৎকার পরিচালনার সময় এবং পরে সমস্ত নৈতিক মান অনুসরণ করা হয়েছে। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য এবং ইতিবাচক নীতি প্রণয়নে এর নির্দিষ্ট ব্যবহার সম্পর্কে উত্তরদাতাঁদের অবহিত করা হয়েছিল। নাম প্রকাশ না করার স্বার্থে কাগজে উল্লেখের সময় উত্তরদাতাঁদের আসল নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। এই বিশদ সাক্ষাৎকার ও কেস স্টাডিগুলি আমাদের প্রসঙ্গ-বিষয় (theme) অনুযায়ী প্রতীকায়িত করা হয়েছিল এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছিল। পরবর্তীতে, যুক্তি উপস্থাপনের জন্য পরোক্ষ উৎস থেকে সংগৃহীত নথি ও সংবাদগুলি সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত অনুসন্ধানের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছিল।

এই অধ্যায়ে চারটি বিভাগ রয়েছে। প্রথমত, এটি আন্তর্জাতিক অভিবাসনের লিঙ্গগত মাত্রা এবং সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশী নারীদের অবস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। তারপর অভিবাসন-বিন্যাসে নারীদের ওপর কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব সম্পর্কে বিদ্যমান প্রতিবেদন, গবেষণামূলক কাজ এবং অন্যান্য প্রামাণ্য বিবরণ পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিভাগে গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়া নারীদের ওপর পড়া প্রভাবগুলি নথিভুক্ত করা হয়। শেষ বিভাগে শ্রমের বিশ্বায়নের সঙ্গে অভিবাসীদের নেতিবাচকভাবে জড়িয়ে থাকার সম্পর্ককে যুক্ত করে একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আন্তর্জাতিক অভিবাসনের মানবীকরণ এবং বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক অভিবাসনের বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে আমাদের সমীক্ষাকে স্থাপন করার জন্য, সামনে হাজির হওয়া আন্তর্জাতিক অভিবাসনের আরো স্তরায়িত ও লিঙ্গভিত্তিক গতিশীলতার সাথে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে ঘটা সামাজিক রূপান্তর দেখা দরকার। বহুলভাবে উল্লেখিত 'আন্তর্জাতিক অভিবাসনের মানবীকরণ' (পাইপার, ২০০৮: ১২৮৭) লিঙ্গ প্রশ্ন এবং পুরুষ ও নারী অভিবাসীদের অভিজ্ঞতার পার্থক্যগুলি অভিবাসন ও এর প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। শ্রমের লিঙ্গভেদ এবং গার্হস্থ্য ও পরিচর্যা কাজের মানবীকরণ বলতে এটাও বোঝায় যে, নারী অভিবাসীদের আইনগত অধিকার থাকলেও পুরুষ অভিবাসীদের

অধিকারের চেয়ে সেসব প্রয়োগের সম্ভাবনা কম। এর কারণ হলো, অদক্ষ নারী অভিবাসীরা তাঁদের পুরুষ সমকক্ষদের তুলনায় বিচ্ছিন্ন এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তারা কম সচেতন। মোটকথা, লিঙ্গ-বিধি (gender norms) এবং বাজার অর্থনীতির পরস্পর-ছেদ নারী অভিবাসীদের জন্য তিন ধরনের পরিণতি নিয়ে এসেছে: (ক) তারা অদক্ষ, কম মূল্যায়িত এবং কম বেতনের খাতে কেন্দ্রীভূত, প্রায়শই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে নিযুক্ত; (খ) দক্ষ ও অদক্ষ অভিবাসীরা প্রায়শই লিঙ্গীয় ও জাতিগত বৈষম্যের যুগল শিকার হন এবং বেতনভুক্ত কাজের পাশাপাশি অবৈতনিক গার্হস্থ্য ও ধাত্রীমূলক দায়িত্বের ত্রিমুখী চাপে থাকেন; এবং (গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে না পারার কারণে, নারী অভিবাসীদের প্রায়ই পুরুষ অভিবাসীদের তুলনায় তাঁদের সম্মিলিত স্বার্থকে এগিয়ে নিতে বেশি সংগ্রাম করতে হয় (ও'নেইল ও ডোমিঙ্গো, ২০১৬)।

এই লিঙ্গ ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, তাই, 'আমাদের মনোযোগকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অথবা সাংসারিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত বিকাশ ও সম্পর্কের বদলের ওপর অভিবাসনের প্রভাব মূল্যায়নে এবং তার মাধ্যমে অভিবাসনের সামাজিক মাত্রার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ককেও নতুন করে বোঝার সুযোগ করে দেয়' (পাইপার, ২০০৮: ১২৮৯)।

অনুরূপ বৈশ্বিক প্রবণতার অনুসরণে, বৈশ্বিক অর্থনীতির পুনর্গঠন বাংলাদেশ থেকে স্বল্পমেয়াদী চুক্তিতে নারী শ্রমিকের অভিবাসন বৃদ্ধি করেছে। সরকারী পরিসংখ্যানগুলিতে, স্বাধীন শ্রম অভিবাসী হিসেবে নারীদের দৃশ্যমানতা বেশি। বিপরীতে তাঁদের দেখানো হয় পুরুষ অভিবাসী অংশীদারদের 'সঙ্গীনী স্ত্রী' হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালে, মোট ১০৪,৭৮৬ জন নারী শ্রমিক বাংলাদেশ থেকে কাজ করতে গিয়েছিলেন। ২০১৯ সালে নারী অভিবাসন আগের বছরের তুলনায় ৩.০৪ শতাংশ বেড়েছিল। আরএমএমআরইউ-এর দেওয়া তথ্য অনুসারে, নারী শ্রমিকদের গড় বয়স ছিল ২৭ বছর, ৭০ শতাংশ বিবাহিত, এবং ৩০ শতাংশ তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা (আরএমএমআরইউ, মাইগ্রেশন ট্রেন্ডস রিপোর্ট, ২০২০)।

বাংলাদেশ থেকে ক্রমবর্ধমান হারে নারীদের অভিবাসন গন্তব্য দেশগুলির শ্রম বাজারের লিঙ্গগত মাত্রা ব্যাখ্যা করে। অত্যন্ত নারী-নির্ভর খাতে (স্বাস্থ্যসেবা, গার্হস্থ্য সহায়তা ও ম্যানুফ্যাকচারিং) চাকরির জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি এবং মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের মতো সমৃদ্ধ এশীয় দেশগুলিতে নারীদের বৃহত্তর অভিবাসন উৎসাহিত হয়। বাংলাদেশী নারী অভিবাসীরা প্রাথমিকভাবে নিচু পদের চাকরিতে নিযুক্ত হন, যেমন সেবা কাজ ও গৃহকর্ম। বেশিরভাগ সময়ই কম বেতন ও অতিরিক্ত কাজ দ্বারা এসব চাকরিকে চিহ্নিত করা যায়। এগুলি এমন ধরনের কাজ যা সাংস্কৃতিকভাবে অবমূল্যায়িত এবং যার সামাজিক-আইনি স্বীকৃতিও সীমিত (সিদ্দিকী ও আনাস, ২০২০; রশিদ, ২০১৩; সিদ্দিকী, ২০০১)। লিঙ্গ ভেদে মজুরির ক্রমাগত ব্যবধানও একটি লক্ষ্যণীয় সমস্যা। অনেক অভিবাসী নারী কম বেতনে মাত্রাতিরিক্ত বেশি অনিশ্চিত, অনিরাপদ এবং অনানুষ্ঠানিক কাজ করে (পাইপার, ২০০৮; হেনেব্রি ও পেট্রোজিয়েলো, ২০১৯)। নারীদের কর্মক্ষেত্রে সহিংসতার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং প্রায়ই তাঁদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পেতে অসুবিধায় পড়তে হয়; তাঁদের সামাজিক সুরক্ষাও থাকে কম (পাবলিক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৮)।

অভিবাসনের লিঙ্গগত ফলাফল শুধুমাত্র বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য দেশত্যাগকারী নারীদেরই বিষয় নয়, বরং 'আন্তর্জাতিকভাবে বিভক্ত পরিবারে'র থেকে যাওয়া নারী-পুরুষদের জটিল অভিজ্ঞতাও এর অন্তর্গত; যেখানে দম্পতিদের একজন হয়তো বিদেশে কর্মরত, অন্যজন থেকে-যাওয়া পরিবারের দেখাশোনা করে (পাইপার,

২০০৮)। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অভিবাসন গবেষকদের জন্যও এটি অনুসন্ধানের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে (সিদ্দিকী ও আনাস, ২০২০; সিদ্দিকী ও মাহমুদ, ২০১৫; রশিদ, ২০১৩)।

ইতিমধ্যে এই জটিল পরিবেশে, মহামারী দ্বারা সৃষ্ট অসমতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ কোভিড-১৯ মহামারী প্রেক্ষাপটে নারীদের দশা আরও খারাপ করেছে। এ বিষয়ে উঠে আসা লেখালেখি যেমন বোঝায় যে অভিবাসী নারীরা মহামারীর ফলস্বরূপ চাকরি হারানো এবং অর্থনৈতিক মন্দা থেকে কম সুরক্ষিত (ফলি ও পাইপার, ২০২০)। ২০১৯ সালের হিসাবে নিজ দেশের বাইরে বসবাস ও কর্মরত আনুমানিক ২৭২ মিলিয়ন অভিবাসীদের মধ্যে অর্ধেকই হলো নারী (আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রতিবেদন, ২০১৯)।

এই নারীদের মধ্যে অভিবাসী শ্রমিক ছিল আনুমানিক ৬৬.৬ মিলিয়ন। কাজের ধরন, জীবনযাত্রার অবস্থা, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, ভাষার প্রতিবন্ধকতা এবং সেকারণে আইনী ও সামাজিক প্রতিকারের সুযোগের অভাব নারীদের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাসহ অন্যান্য ধরনের শারীরিক নির্যাতনেরও মুখোমুখি করে।

অনুচ্ছেদ ৩: কোভিড-১৯ এর মধ্যে নারীদের অভিজ্ঞতার ওপর সাম্প্রতিক গবেষণামূলক কাজ

একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ইতিমধ্যে কোভিড-১৯ এর পটভূমিতে বিশ্বব্যাপী ঘটে চলা যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (এসজিবিভি) বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। ইউএন উইমেনের মতে, আগের ১২ মাসে বিশ্বব্যাপী ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ২৪৩ মিলিয়ন নারী যৌন এবং/অথবা শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছে (ইউএন উইমেন, ২০২০)। এ বিষয়ক লেখালেখির ক্রমবর্ধমান প্রবাহ তুলে ধরেছে যে কোভিড-১৯ এর বিস্তারের পর থেকে এই সহিংসতা তীব্রতর হয়েছে। ইউএন উইমেন প্রতিবেদন গার্হস্থ্য সহিংসতার ঊর্ধ্বগতিও দেখায় এবং এমন একটি আদলের ওপর জোর দেয় যা বিশ্বব্যাপী উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ধরনের দেশেই লক্ষ্য করা যায় (ইউএন উইমেন, ২০২০)।

উপসাগর এবং অন্যান্য আরব দেশে নারী অভিবাসী গৃহকর্মীদের ওপর আলোকপাত করে, আওন (২০২০) এবং ওইসিডি রিপোর্ট (২০২০) নাতিদীর্ঘভাবে কোভিড-১৯ এর মধ্যে কাফালা ব্যবস্থায় নারী অভিবাসী গৃহকর্মীদের প্রতি লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি) উচ্চতর ঝুঁকি বিষয়ে আলোচনা করে। তিনি ব্যাখ্যা করেন কীভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে মালিকদের ওপর শ্রমিকদের আইনি ও কাঠামোগত নির্ভরতা তাঁদের দরকষাকষির ক্ষমতা আরও কমিয়ে দেয়।

যাইহোক, এটি কোনো নতুন প্রবণতা নয়। মহামারী বা অনুরূপ ঘটনার সময় গার্হস্থ্য সহিংসতা ও নির্যাতনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ার অনেক প্রমাণ রয়েছে (শর্মা এবং বোরাহ, ২০২০)। ডেকার প্রমুখ (২০১৩) নারী নির্যাতনের ওপর এইচআইভি মহামারীর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন। মুখার্জি (২০০৭) এইডস মহামারীর সাথে কাঠামোগত সহিংসতা ও দারিদ্র্যের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন; পেলোস্কি প্রমুখ (২০১৩) দেখিয়েছেন, কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের এইডস মহামারী বিভিন্ন জাতিগত ও লিঙ্গীয় গোষ্ঠীকে সামাজিক অসুবিধার দিকে ঠেলে দিয়েছিল, যার পরিণতি ছিল সহিংসতা। ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের ওপর আলোকপাত করে ইউএনএইডস (২০০৮) নারী ও কিশোরীদের ওপর এই বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব এবং বিশ্বজুড়ে লিঙ্গীয় সমতার সামনে তা যেসব চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে সে সম্পর্কেও প্রতিবেদন দিয়েছে।

তা সত্ত্বেও, কোভিড-১৯ মহামারী ও নারীর প্রতি সহিংসতার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক লেখালেখিতে বাংলাদেশকে কেস স্টাডি হিসাবে ব্যবহার করে, মহামারীর লিঙ্গগত প্রভাবগুলি কীভাবে উপলব্ধি করা যায় সেদিকে মনোনিবেশ করা হয়নি। এই অনুসন্ধানটিই আমরা করতে চাই এবং এই ধরনের প্রভাবের পেছনের কারণগুলি উন্মোচন করে আমরা আমাদের গবেষণার মাধ্যমে অবদান রাখতে চাই।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ অভিবাসন ও উন্নয়নের মধ্যে সংযোগহীনতা/বিচ্ছিন্নতা

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার অভিজ্ঞতা এবং অভিবাসী নারীদের অন্যান্য চ্যালেঞ্জঃ অভিবাসনের লিঙ্গীয় ও বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্যের বেশ কিছু কুপ্রভাব নারী-শ্রম বাজারের অভিজ্ঞতা, তাঁদের আইনী অবস্থান ও অধিকারের ওপর রয়েছে। করোনা মহামারীর মধ্যে তা আরও দৃশ্যমান ও প্রবল হয়ে উঠেছে। উত্তরদাতাঁদের বয়ান অনুযায়ী, শোষণের ধরন ছিল দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর কর্মঘণ্টা, চাকরি থেকে নির্বিচারে বরখাস্ত এবং জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন, স্বদেশে সামাজিক কলংকায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাব, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অভাব, ঝুঁকির মধ্যে ফেলা, কম মজুরি, আবাসনের বেহাল অবস্থা, চুক্তি বাতিল করা এবং প্রতারণা ও দাসত্ব। নিচের অংশে বর্তমান এবং প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের পাশাপাশি পুরুষ অভিবাসীদের রেখে-যাওয়া স্ত্রীদের বিশেষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : বর্তমান নারী অভিবাসীদের ওপর প্রভাব

কাজের চাপ এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বৃদ্ধিঃ নারী অভিবাসী গৃহকর্মীরা সাধারণত তাঁদের নিয়োগকর্তাদের বাড়িতেই থাকেন। ঘর-দোর পরিষ্কার, রান্না, ধোয়াধুয়ি এবং শিশু ও পরিবারের বয়স্কদের দেখাশোনা করেন। যেহেতু এই শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষার অভাব রয়েছে, তাই তাঁদের প্রতিদিন কত ঘন্টা কাজ করতে বলা যেতে পারে তার কোন সীমা নেই। তারা অসুস্থতার সময় কিংবা বাৎসরিক ছুটি নেওয়ার অধিকারী নন। মহামারীর মধ্যে কর্মস্থলে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের উপস্থিতির কারণে তাঁদের কাজের চাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। বেশিরভাগ উত্তরদাতাঁদের বাড়ী পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করার বাড়তি দায়িত্ব নিতে হয়েছিল, যার ফলে তাঁদের দেহে পোড়া, ফুসকুড়ি বা অন্যান্য আঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল। সাক্ষাৎকার নেওয়া ১২ জন বর্তমান অভিবাসীর মধ্যে পাঁচজন প্রতিদিন প্রায় ১৮ ঘণ্টা করে এবং আরও তিনজন প্রতিদিন ১৫ ঘণ্টা করে কাজ করছেন। শুধুমাত্র একজন উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তাঁকে দিনে ১০ ঘন্টা করে কাজ করতে হয়েছে এবং করোনা পরিস্থিতিতে তাঁর কাজের সময়সূচী খুব একটা বদলায়নি। কারণ আগেভাগেই তাঁকে এক বৃদ্ধ দম্পতির দেখাশোনা করার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পাশাপাশি বাড়তি কর্মী নিয়োগে নিয়োগকর্তাদের অসামর্থ্যের কারণে রমজানের সময়ে অনেক নারী গৃহকর্মীর কাজের চাপ স্বাভাবিকের সময়ে চাইতে তিনগুণ বেড়ে যায়।

সৌদি আরবে থাকা অভিবাসী জরিনার কাহিনী

দুই কন্যা সন্তানের মা স্বামীহীনা জরিনা(৩৫) ২০০৭ সালে ৩০,০০০ টাকা খরচ করে সৌদি আরবে অভিবাসী হন। সেখানে তিনি মাত্র ১২ হাজার টাকা বেতনে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ পান। কয়েক বছর যাবত এভাবে চলতে থাকে। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের পর তিনি চাকরি হারান এবং তিন মাসের বিরতির পর তিনি একজন বাংলাদেশী অভিবাসীর বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ভিত্তিতে গৃহকর্মীর চাকরি নেন। নতুন চাকরি নেওয়ার পরপরই জরিনা তাঁর প্রাক্তন নিয়োগকর্তার হাতে শারীরিক বলাৎকার ও নির্যাতনের কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। জরিনা যেহেতু কাজ করতে পারছিল না, তাই নতুন নিয়োগকর্তা তাঁর পরিবারের কাছ থেকে চিকিৎসার কথা বলে ৫০ হাজার টাকা নেন এবং তাঁর কাছ থেকে একটি স্বর্ণের চেইন নিয়ে নেন। এর পরে, ওই নিয়োগকর্তা জরিনাকে তার

সমস্ত কাগজপত্রসহ রাস্তায় রেখে যান। সৌদি পুলিশ জরিনাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে তিনি ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আংশিক বেতন বা কোনো বেতন না-দেওয়া: অনেক নারী অভিবাসীদের মূল দুশ্চিন্তা ছিল বেতন কমে যাওয়া এবং দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে না পারা। প্রায় সকল উত্তরদাতারই দেশে অন্তত তিনজন নির্ভরশীল আত্মীয় আছে। এবং তাঁরা দেশে টাকা পাঠাতে না পারায় তারা গুরুতর চাপে পড়ে যায়। অনেকেই খুবই চিন্তিত ছিল যে, পরিবারের সদস্যরা না জানি কীভাবে সংসার চালাচ্ছে। আটজন উত্তরদাতা মে-জুলাই মাসে, ঈদ উৎসবের সময় দেশে টাকা পাঠাতে পারেনি। শামীমা বানু (৩৭) দুঃখের সঙ্গে বলেন, ২০১৬ সালে কাজের জন্য বিদেশে আসার পর এই প্রথমবার বাচ্চাদের জন্য নতুন জামা কেনার জন্য টাকা পাঠাতে পারিনি। সাক্ষাৎকার দেওয়া ১২ জন বর্তমান অভিবাসীর মধ্যে চারজন এপ্রিল থেকে পাওনা বেতন পাননি; তাঁদের মধ্যে তিনজন মাত্র আংশিক বেতন পেয়েছেন। মহামারীর ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের শীর্ষে রয়েছে লেবাননে যাওয়া নারী অভিবাসীরা। লেবাননের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও লেবাননি মুদ্রার অবমূল্যায়নের খেসারত তাঁদের দিতে হচ্ছে। এপ্রিল থেকে বেতন না পাওয়া চারজন উত্তরদাতার মধ্যে তিনজন লেবাননের বৈরুতে কাজ করছেন। বেতন নিয়ে লাগাতার দুশ্চিন্তা শুধু তাঁদের পরিবারের আয় হারানোর প্রতিফলন নয়, এটা অভিবাসী শ্রমিকদের অনুভূতি ও মানসিক চাপকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

রাষ্ট্র ঘোষিত জরুরি পরিষেবা থেকে বর্জন এবং চলাচলের নিষেধাজ্ঞা: ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ও বিধিনিষেধের কারণে নারী অভিবাসী শ্রমিকেরা তাঁদের মূল দেশেও ফিরতে পারছিল না, কারণ আন্তর্জাতিক চলাচল চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছিল। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে, দেশে প্রবেশের সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং স্বাস্থ্যসনদের আবশ্যকীয়তা। এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব উত্তরদাতাই এপ্রিল থেকে নিয়োগকর্তার বাড়িতে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। এমনকি কাউকে কাউকে কর্মক্ষেত্র থেকে বের হতে দেওয়া হয়নি।

এছাড়াও, চলাচলের ওপর এই বিধিনিষেধের কারণে অনেক অভিবাসী কর্মী কিছু দেশে প্রদত্ত কোভিড-১৯ সহায়তা থেকেও বঞ্চিত হয়। কারাবাস তাঁদের আরও অনেক সামাজিক পরিষেবা ও রাষ্ট্র ঘোষিত সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে সামাজিক সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজগুলি পেতেও তারা ব্যর্থ হয়। এই গবেষণায় সাক্ষাৎকার দেওয়া শ্রমিকদের কেউই তাঁদের কাজের সাথে সম্পর্কিত অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সামাজিক কর্মী কিংবা বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়নি। তদুপরি, অভিবাসন ও কর্মসংস্থান বিষয়ক আইনের কারণে তৈরি হওয়া কাঠামোগত বাধাগুলি তো বহাল রয়েছেই, যা অনেক অভিবাসী, বিশেষত অভিবাসী নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার বাইরে রাখে।

যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা: উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে কোভিড-১৯ মহামারীর আগে থেকেই অভিবাসী নারীদের ওপর যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা জারি ছিল। মহামারীর সময় নিয়োগকর্তার পরিবারের পুরুষ সদস্যরাও বাড়িতে থাকতে বাধ্য হওয়ায় অভিবাসী নারীরা এ ধরনের সহিংসতার সামনে আরো নাজুক হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে আরব দেশগুলিতে লকডাউনের সময় অভিবাসী নারী গৃহকর্মীদের নির্যাতনের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে (অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০২০; বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন, ২০২০)। এই প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, গৃহকর্মীরা অতিরিক্ত কাজের চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। যেমন, ২০০৮ সালে, লেবাননে প্রতি সপ্তাহে একজন করে অভিবাসী নারী গৃহকর্মীর মৃত্যু ঘটছিল। আত্মহত্যা এবং পালানোর চেষ্টা ছিল তাঁদের মৃত্যুর প্রধান কারণ (হিউম্যান রাইটস

ওয়াচ, ২০০৮)। বর্তমানে, কোভিড-১৯ সৃষ্ট বাড়তি জটিলতার মধ্যে হিসাব করে দেখা গেছে যে, এ ধরনের মৃত্যুর হার দ্বিগুণ হয়েছে (বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন, ২০২০)।

প্রায় সব উত্তরদাতাই শারীরিক নির্যাতন, এবং যৌন নির্যাতনসহ কোনো না কোনো ধরনের এসজিবিভি'র অভিজ্ঞতা পেয়েছেন। তাঁদের প্রতি নারী-বিদ্বেষী ও জাতিবিদ্বেষী মন্তব্যের অভিযোগও রয়েছে। ১২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬ জন মহামারী চলাকালে মালিকের পরিবারের নারী সদস্যদের দ্বারা তো বটেই, এমনকি পুরুষ নিয়োগকর্তা ও তাঁদের ছেলেদের দ্বারা অন্তত দুবারের বেশি মারধরের শিকার হন। আলেয়া খাতুন (৪৫) তাঁর দুর্দশার স্মৃতি জানাচ্ছেন:

টয়লেটে একটু বেশি সময় থাকায় রাতের খাবার পরিবেশনে কয়েক মিনিট দেরি করতে হয়েছিল বলে আমি আমার নিয়োগকর্তার ছেলের হাতে মার খেয়েছি। আমি মেম সাহেবের (পরিবারের নারী প্রধান) মার খেতে অভ্যস্ত কিন্তু আমার চেয়ে ছোটো বয়সী তার ছেলের দ্বারা মার খেয়ে মনে হচ্ছিল লজ্জায় আমার আত্মহত্যা করা উচিত। কিন্তু তখন আমি ভেবেছিলাম, যদি আমি তা করি তাহলে আমার পরিবারের কী হবে'?

কাফালা ব্যবস্থা এবং অভিবাসীদের সুরক্ষা প্রাপ্তির মধ্যে নেতিবাচক যোগসাজশ: মধ্যপ্রাচ্যে মালিক ও অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় কাফালা ব্যবস্থা দ্বারা। এটা এমন এক নিবর্তনমূলক পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবস্থা যেখানে অভিবাসীর আইনী অবস্থান তার নিয়োগকর্তার সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। অনেক গবেষকই কাফালা পদ্ধতিকে সহজে শোষণযোগ্য শ্রমশক্তি তৈরির জন্য দায়ি করেন, কেননা এটি মালিক (কাফিল) ও অভিবাসীদের মধ্যে ভারসাম্যহীন ক্ষমতা-সম্পর্ক তৈরি করে (সিদ্দিকী ও আনাস, ২০২০; পান্ডে ২০১৩; মাহদাভি ২০১৩)। আইনী সুরক্ষার অভাব এবং মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা অভিবাসী নারী গৃহকর্মীদের অনেকভাবে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকির মুখে ফেলে (খান, এ. এবং হ্যারফ টাভেল, ২০১১)।

অনুসন্ধান থেকে দেখা যাচ্ছে যে শোষণের অভিজ্ঞতাগুলি নিরন্তর ও চলমান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত হওয়া, অতিরিক্ত কাজ করা, কারাবাস, অন্য পরিবারের দাসত্ব, মারধর এবং যৌন নিপীড়ন। অনেক অভিবাসী নারী শ্রমিকদের জন্য, কোনও আইনি কাঠামো বা সংস্থার দ্বারস্থ হওয়া প্রায় অসম্ভব, কারণ শ্রমিকেরা মালিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের একটানা নজরদারিতে থাকে। ক্রমশ উঠে আসা তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, কোভিড-১৯ (ওইসিডি, ২০২০) এর ফলে কাফালা ব্যবস্থার অধীনে অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। উপসাগরীয় অনেক দেশে লকডাউন এবং কারফিউ পুনর্বহাল করায় অভিবাসী নারী গৃহকর্মীদের মারাত্মক বেকায়দায় ফেলে। এটা তাঁদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার সাথেই কেবল সম্পর্কিত নয়, এতে করে পরিষেবা ব্যবস্থার সুযোগও তারা হারায়। আমাদের গবেষণায় বেশ কয়েকজন উত্তরদাতা দাবি করেছেন যে করোনা ভাইরাসের কিছু উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকর্তা তাঁদের স্বাস্থ্য ক্লিনিকে গিয়ে পরীক্ষা করানোর অনুমতি দেননি। সাধারণত, নিয়োগকর্তা মেডিকেল বিল এবং অন্যান্য চিকিৎসার খরচ দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ। লেবাননে বিনা বেতনে কর্মরত লায়লা আরজুমান (৩৩) দাবি করেন, জুলাই মাসে চাকরি শেষ হওয়ার বিষয়ে তাঁকে জানানো হলেও তাঁর নিয়োগকর্তা তাঁকে বাড়ি ছাড়তে দেননি এবং তাঁকে বিনা বেতনে কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। আরো বেশ কয়েকজন নারী অভিবাসী জানিয়েছেন যে নিয়োগকর্তারা তাঁদের পাসপোর্ট আটকে রেখেছেন। ফলে লাঞ্ছণাকর কাজের পরিবেশ থেকে মুক্তি নেওয়ার পথও বন্ধ হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ ছয়: জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসী নারীদের ওপর প্রভাব

নির্বিচারে ফেরত পাঠানোর পরিসংখ্যান: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের (ডব্লিউইউবি) দেওয়া তথ্য অনুসারে, ১ এপ্রিল থেকে ৩ অক্টোবর ২০২০ সালের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক ১৭,১৮২ জন অভিবাসী নারী শ্রমিক বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তাঁদের মধ্যে সৌদি আরব থেকে ৬,০২৫ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ৩,২৬৯ জন, লেবানন থেকে ১,৮৮৭ জন, জর্ডান থেকে ১,৭৮৯ জন, কাতার থেকে ১,৩৬২ জন এবং ওমান থেকে ১,২৪১ জন (ভূঁইয়া, ২০২০) দেশে ফেরেন। কোভিড-১৯ এর অভিঘাত কঠিনভাবে পড়েছিল উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে থাকা অভিবাসী নারীদের ওপর। তাঁদের অনেকেই চাকরি হারিয়েছেন এবং বিনা বেতনে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। এই শ্রমিকদের অনেকে প্রত্যাবর্তনের আগে বিভিন্ন ধরনের লাঞ্ছণার শিকার হয়েছেন, এবং দেশে ফেরার পরও সেসব চলতে থেকেছে।

তাঁদের মধ্যে কতজনকে বিতাড়ন করা হয়েছিল এবং কতজন স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো তথ্য নেই। কিন্তু এই গবেষণা যাদের নিয়ে পরিচালিত হয় তাঁদের কেউই স্বেচ্ছায় ফিরে আসেনি; বরং স্বদেশগামী বিমানে ওঠা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প তাঁদের ছিল না।

অতিরিক্ত পরিশ্রম, বেতনহীনতা এবং অসহায়ত্ব: প্রত্যাবাসিত অভিবাসী শ্রমিকদের ১৫টি কেস স্টাডির উত্তরদাতাঁদের সকলেই বিভিন্ন ধরনের বাড়তি কাজ করেছেন। আটকাবস্থা ও লকডাউন বিভিন্ন খাতে নিযুক্ত শ্রমশক্তির কাজের চাপ কমিয়ে দিলেও, নারী গৃহকর্মীদের বেলায় পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। বেশ কয়েকজন উত্তরদাতা বলেছেন যে মহামারীর সময়ে নিয়োগকর্তাদের বাড়ির বাসিন্দাদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তাঁদের দৈনিক ২০ ঘন্টার বেশি কাজ করতে হয়েছিল। কাজের অতিরিক্ত ঘন্টার জন্য বেতন পাওয়ার বদলে অনেককে চুক্তিসম্মত বেতনও দেওয়া হয়নি। শিরিন সুলতানা (২৮) জর্ডানে পাঁচ বছর ধরে কাজ করেছেন। তাঁর দাবি হলো, নিয়োগকর্তা তাঁকে বিগত চার মাস ধরে বেতন দেননি। তাঁর পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২০০ মার্কিন ডলার। তিনি আরও জানান:

'আমি আমার নিয়োগকর্তা এবং তার পরিবারের সদস্যদের সব চাহিদা মিটিয়েছি, তবুও তারা আমার মজুরি দেয়নি। প্রতিবার আমি বেতন চাইলে আমাকে মারধর ও নির্যাতন করা হতো'।

ফেরার আগে তাঁদের কাউকে প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করা হয়নি। দশজন উত্তরদাতা খালি হাতে বাড়ি ফিরেছিলেন, আরও পাঁচজন পেয়েছিলেন মজুরির আংশিক অর্থ। দায়িত্বশীল সংস্থার সাথে যোগাযোগ করলে খুব কম ক্ষেত্রেই তাঁরা সহায়তা পান। খুকি আক্তার (৩০) হলেন লেবানন থেকে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো আরেকজন নারী অভিবাসী যিনি কিনা বিনা পারিশ্রমিকে দেশে ফিরে আসেন। আট বছর আগে তিনি ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা (৫৩০ মার্কিন ডলার) খরচ করে অভিবাসী হন। বেতন যখন দেওয়া হতো তখন তাঁর মাসিক মজুরি ছিল ১৫০ মার্কিন ডলার।

'গত দুই বছর যাবত আমাকে নিয়মিত মজুরি দেওয়া হয় নি। এই বছরের জানুয়ারি থেকে, নিয়োগকর্তা আমাকে তার আত্মীয়ের বাড়িতে কাজ করতে বলেছিলেন। এই আট মাসে আমি কোনও মজুরি পাই নি। কখনও কখনও খাওয়ার মতো খাবারও ছিল না আমার', তিনি বলেন।

'যখনই আমি মজুরি চাইতাম, আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হতো', বলেন বিলকিস বানু (৪০)। জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো এই নারী অভিবাসী জর্ডানে ছিলেন। দাবি অনুযায়ী তাঁর মোট না-পাওয়া বেতনের পরিমাণ ৪ হাজার মার্কিন ডলার হবে।

দেশে ফেরার পরে সামাজিক কলংক ও মানসিক সমস্যা: ২০২০ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ সংক্রমণের তথ্য জানার পর সর্বপ্রথম যাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়, তারা হলো ফেরত পাঠানো অভিবাসী শ্রমিক। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ফিরে আসা অভিবাসীদের এলাকাগত অবস্থান চিহ্নিত করা এবং কতজনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল তার হিসাব রাখার সংগ্রাম শেষমেষ তাঁদের 'আবদ্ধ' করার সাময়িক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। এতে করে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। মহামারীর সর্বোচ্চ অবস্থায় জাতীয় গণমাধ্যমগুলি জানায় যে কীভাবে ফিরে আসা অভিবাসীরা তাঁদের সমাজে কলংকায়ন ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। নারী প্রত্যাবর্তনকারীদের বেলায় এটা ইতিমধ্যে তাঁদের অভিবাসী হওয়ার কলঙ্কের সাথে বাড়তি আরেকটা কলংক হয়ে দাঁড়ায়। এহেন কলংক মোকাবিলা করা, বিদেশ থেকে কোভিড-১৯ বহন করে আনার অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই তাঁদের অনেককেই এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে ফেলে দেয়। প্রতিটি নারী অভিবাসীর জন্য বাড়ি ফেরা ভাল সিদ্ধান্ত হলেও, বিশেষ করে মহামারী এবং দেশব্যাপী অঘোষিত লকডাউনের মধ্যে দেশে ফেরার প্রক্রিয়া কখনোই সহজ ছিল না।

মুন্নি বেগম (২৬) তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেছেন এভাবে: 'কুয়েতে চাকরি হারানোর পর আমি ভেবেছিলাম, বাড়ি ফিরে আসাটাই সবচেয়ে ভালো বিকল্প। এমনকি যদি আমি করোনার কারণে মারা যাই, তাহলে অন্তত আমি আমার পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়দের সাথে শেষ কয়েক দিন কাটাতে পারব। কিন্তু দেশে ফিরে যাওয়া, যাকে আমি একটি সহজ প্রক্রিয়া বলে মনে করতাম, বিমানবন্দরে নামার পর তা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়'। ফেরার সময়ের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে হংকং থেকে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো নারী অভিবাসী গীতা চাকমা (৩২) বলেছেন যে তাঁকে এক মাসেরও বেশি সময় বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল।

গীতা চাকমার কাহিনী

খাগড়াছড়ি জেলার গীতা চাকমা (৩২) হংকংয়ে একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন। কোভিড-১৯ মহামারী হংকংয়ের অর্থনীতিতে আঘাত হানলে তাঁর নিয়োগকর্তাকে দোকান বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। নিয়োগকর্তা তাঁকে চীনে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি এই সংকটময় সময়ে বাংলাদেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। পৌঁছানোর পর তিনি বিমানবন্দরের কাছে হজ ক্যাম্পে পর্যাপ্ত খাবার ও ঘুমের ব্যবস্থা ছাড়াই কোয়ারেন্টাইনে থাকেন। ১৪ দিন পর নিজ শহরে পৌঁছালে প্রতিবেশীরা অভিযোগ করা শুরু করে যে, পাড়ায় তিনি সাথে করে ভাইরাস নিয়ে এসেছেন। তাঁর বাড়ির সামনে একটি লাল পতাকা রাখা হয়। দ্বিতীয় রাতে, প্রতিবেশীরা তাঁর বাড়ির কাছে জড়ো হতে শুরু করে এবং বাড়ি ভাংচুরের সম্ভাব্য হুমকির ভয়ে তাঁর বাবা পুলিশ ও স্থানীয় নেতাঁদের কাছে সাহায্য চান। মধ্যরাতে পুলিশ এসে তাঁকে বাড়ি থেকে উদ্ধার করে। তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল এবং বারবার করোনা পরীক্ষা এবং অতিরিক্ত অন্যান্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছিল। দশ দিন পর, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবুও বেশিরভাগ সময়ই তিনি ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন। তিনি সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি যে যাদের তিনি এক বড় পরিবারের অংশ বলে ভাবতেন সেই প্রতিবেশীরা তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করবে।

উত্তরদাতাঁদের মতে, নিজেদের অনটনগ্রস্থ পরিবারগুলিকে টেনে তুলতে দেশ ছাড়লেও, হতাশা ও ব্যর্থতার অনুভূতি নিয়ে তারা ফিরে আসেন আরো অপমানিত হওয়ার জন্য। প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই এই মানসিক ধাক্কা, বিভিন্ন মাত্রায় মানসিক যন্ত্রণা তৈরি করে, বিশেষ করে যাদের সামাজিক সহায়তা নেটওয়ার্ক আরো দুর্বল হয়ে যায়। ১৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে পাঁচজনকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি এবং সাতটি ক্ষেত্রে প্রতিবেশীরা তাঁদের 'বাড়ি ফেরার' বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় অভিযোগ করেছিল, যা পুলিশী হয়রানি ও ঘৃণার উশকানির কারণ হয়েছিল।

আইনি অভিযোগ ও ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তির সুযোগের অভাব: প্রত্যাবাসিত নারী অভিবাসীদের জন্য অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো প্রত্যাবর্তনের সময় তথ্য ও ন্যায়বিচার পাওয়া। যেহেতু মাসব্যাপী লকডাউনের সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অভিবাসন সংস্থার নিয়মিত সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তাই প্রত্যাবাসনকারী অভিবাসীদের পক্ষে গন্তব্য দেশে নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে বা যে এজেন্সি মারফত তাঁরা বিদেশে গিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

অভিবাসীদের মধ্যে মজুরি চুরি বা বকেয়া মজুরি যথাযথ ভাবে না দেওয়া এবং চাকুরি শেষে প্রাপ্য সুবিধাগুলি না পাওয়াসহ অন্যান্য অধিকার হারানোর ঘটনা ব্যাপক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই ধরনের চুরি অজানাই থেকে গেছে। পরিষেবা সংস্থার জটিল কাঠামো, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জবাবদিহির অভাব, এবং ব্যক্তিগত ও কাঠামোগত বাধার (যেমন ভাষার অসুবিধা, পারিবারিক সহায়তার অভাব, পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতি, গণপরিবহনে ব্যাঘাত, আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা) কারণে ঢাকায় এসে অভিযোগ দাখিল করতে পারেনি বলে উত্তরদাতারা জানিয়েছেন। অভিবাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ এবং জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান দপ্তর (ডেমো) এবং তৃণমূলের অন্যান্য পরিষেবা সংস্থার এখতিয়ারের অভাবকেও অভিযোগের প্রতিকার চাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা: জানানো নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ১৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬ জনই জানান যে তাঁরা অন্তরীণ থাকার সময়ে তাঁদের মালিকদের হাতে শারীরিক ও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। দেশে ফিরে বিমানবন্দরে তিনজন উত্তরদাতারও এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। মুন্নি বেগম (২৬) জানাচ্ছেন:

'আমাদের ফ্লাইট যখন ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করে তখন গভীর রাত। আমি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলাম যে আমি সকাল পর্যন্ত বিমানবন্দরের ভিতরে থাকতে পারি কিনা। করোনা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তাঁরা সঙ্গেসঙ্গেই না করে দিয়েছিলেন। আমি তাই একা আমার লাগেজ নিয়ে বিমানবন্দরের বাইরের দিকে বসে ছিলাম। কয়েক ঘন্টা পরে, একজন নিরাপত্তারক্ষী আমার কাছে এসে পাশে বসলেন। তিনি ফিসফিস করে বললেন যে বিমানবন্দরের কাছে তাঁর থাকার জায়গা আছে। দেখলাম তার আরো দুই সহকর্মী আমার অবস্থা দেখে একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমি কিছু বললাম না এবং বিমানবন্দরের অন্য দিকে চলে গেলাম।'

আগমনের পর নারী প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকাসহ তাঁদের প্রত্যাবর্তনের বেহাল ধরনের কারণে তাঁদের লাঞ্ছণা ও শোষণের মুখে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই গবেষণার প্রায় সকল উত্তরদাতাঁদের বাংলাদেশে আসার পর হজ ক্যাম্পে কোয়ারেন্টাইনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, এবং তাঁদের অনেকের জন্য, ক্যাম্পের ভেতরের পরিস্থিতি তাঁদের নিয়োগকর্তার বাড়ির অবস্থার মতোই ছিল। সৌদি আরব থেকে জোরপূর্বক ফেরত-পাঠানো ময়না খাতুন (২৯) ব্যাখ্যা করেছেন:

‘আমি কর্তৃপক্ষের কাছে দশবারের বেশি জিজ্ঞাসা করেছি যে আমাদের টয়লেটের ফ্লাশ কাজ করছে না। অনেকবার বলার পর তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে উত্তর দিয়েছিল যে, আমরা যেখানে থাকতাম এবং যেখানে যাব তার তুলনায় সেখানকার (ক্যাম্পের) অবস্থা নাকি পাঁচ তারকা হোটেলের সমান। আমার নিজেদের দেশের মানুষের কাছে এই কথা শোনা আমার জন্য মারাত্মক ছিল। সেখানে (বিদেশে) আমাদের কোনো সম্মান নেই এবং এখানটাও (বাংলাদেশ) তার ব্যতিক্রম নয়’।

নির্বিচারে বিতাড়ন এবং অনেক দিক দিয়ে অভিবাসীদের অনাকাঙ্খিত প্রত্যাবর্তন তাঁদের পরিবারের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক সহিংসতার জন্ম দিয়েছিল। বেশ কয়েকজন উত্তরদাতা মনে করেছিলেন যে লকডাউন পরবর্তী দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁরা পরিবারের কাছে বোঝা হয়ে উঠেছেন।

মানসিক যত্ন: নির্বিচারে প্রত্যাবর্তনকারী নারী অভিবাসীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর অভিঘাত ফেলেছে। তাঁদের অধিকাংশই ইতিমধ্যে বহুস্তরের ট্রমার শিকার হয়েছে। মহামারী বিধিনিষেধগুলি তাঁদের বিদ্যমান মানসিক দুরবস্থার সঙ্গে মিশে খারাপ স্মৃতিগুলি মনে করিয়ে দেওয়া এবং জরুরি সামাজিক সমর্থন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ট্রমার আরো একটি স্তরের জন্ম দেয়। চলমান সংকট এবং সহায়তা ব্যবস্থার অভাব তাঁদের জীবন পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা আটকে দিয়েছে। অনেকে এমনও বলেছেন যে, এটি তাঁদের অবাঞ্ছিত স্থানে ‘বন্দী’ করে ফেলেছে। নার্গিস আক্তার (৩৫) উল্লেখ করেন:

‘আমার মনে হচ্ছে আমি করোনার কারণে কারাগারের ভিতরে আছি। যেন আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। একদিকে আমি আমার চাকরি হারিয়েছি, অন্যদিকে, আমাকে অবাঞ্ছিত অতিথি হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে! আমি মুষড়ে পড়েছি। আমি আমার জীবনকে ঘৃণা করি। মাঝে মাঝে এমন দিনও আসে যখন আমি কারও সাথে কথা বলি না, আমি কারো সঙ্গে দেখা করতে চাই না। কারণ তারা আমার অভিবাসন এবং দৃশ্যত তা যে চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পতিত হলো, ঘুরে-ফিরে সেসব কথাই বলে’।

প্রায় সব উত্তরদাতাই মনে করেন, এত চেষ্টার মাধ্যমে কাজের সন্ধানে বিদেশে যাওয়া এবং খালি হাতে ফিরে আসার এই সংকটের চেয়ে খারাপ কিছু তাঁদের জীবনে ঘটতে পারে না।

আর্থিক ও পারিবারিক চাপ: অনেক জোরপূর্বক ফেরত-পাঠানো নারী অভিবাসীদের এই সহায়-সম্পদহীন অবস্থা, সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের বাইরে থাকা এবং আয়ের উপায় হারানো তাঁদের অর্থনৈতিক দুর্দশা আরো বাড়িয়ে দেয়। বিদ্যমান সামাজিক কলংকায়ন প্রায়ই তাঁদের জন্য আর্থিক ও সামাজিক উভয়ভাবে গুছিয়ে ওঠাকে অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। তুহিনা খাতুন (২৮) বলেছেন:

‘আমি জানি না মানুষ কী ভাবছে, কিন্তু আমি তো শুধু কারো বাড়িতে কাজ করছিলাম। তবু অনেকে আর কিছু না দেখে কেবল দেখে যে আমি যেন একটি সস্তা, পরিত্যাগযোগ্য এবং নিম্নমানের কাজে জড়িত ছিলাম। এটা আমাকে কাবু করে ফেলে, আমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মানুষের এইসব পূর্ব-ধারণার বোঝা নিয়ে আমি কীভাবে এবং কোথায় আবার জীবন শুরু করতে যাব? আমি অসহায়, কিন্তু একমাত্র যে বিকল্প আমি দেখি সেটা হলো, যদি আদৌ সম্ভব হয় তাহলে শিগগিরই একদিন আবার বিদেশে চলে যাওয়া’।

শান্তি চাকমা (৩৫) বলেন, ‘আমি মনে করি আমি আমার পরিবারের একজন অর্থ উপার্জনকারী। এই সংকট আমার জন্য জীবন শেখার অভিজ্ঞতা বলে মনে হচ্ছে। যাদের আমি সবসময় আমার রক্তের (পরিবারের ঘনিষ্ঠ

সদস্য) বলে অনুভব করতাম, তারা শুধু আমার পাঠানো (বাংলাদেশে) টাকার সুবিধাভোগী। আমি এখানে সত্যিই স্বাগত নই'।

তিনজন উত্তরদাতা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে ক্ষুদ্র ঋণের জন্য আবেদন করেছিলেন, কিন্তু মে মাস থেকে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন।

অনুচ্ছেদ ৭: অভিবাসীদের পরিবারের নারীদের ওপর প্রভাব

যদিও তাদের স্ত্রীদের অভিবাসনের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট বর্তমান ও ফিরে আসা নারী অভিবাসীদের তুলনায় ভিন্ন, তবুও কোভিড-১৯ পরিস্থিতি তাঁদের জীবনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। উত্তরদাতারা আমাদের গবেষণায় যা প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সেসব বয়ান থেকে অনেকগুলি ইস্যু জোরালোভাবে উঠে আসে। যেমন অতিরিক্ত সেবামূলক কাজ করা, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি, একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যদের হাতে শারীরিক নির্যাতন, সংসার চালানোর ক্ষেত্রে আর্থিক চাপ, শ্বশুরবাড়ির লোকদের শাসন; শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিরাপত্তাহীনতা এবং সংকটের এই সময়ে একা থাকার মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদি।

কাজের চাপ এবং অসহায়ত্ব বৃদ্ধি: স্কুল, অফিস, ব্যবসা এবং অন্যান্য সরকারি ও সামাজিক পরিষেবা বন্ধের ফলে, কোভিড-১৯ অভিবাসী পুরুষের রেখে যাওয়া স্ত্রীদের কাজের বোঝা বেড়ে যায়। ১৫ জন উত্তরদাতার সকলেই বাড়তি গৃহস্থালি এবং সেবামূলক কাজের চাপের কথা বলেছেন। মহামারী এবং বাধ্যতামূলক ঘরে-থাকার বাস্তবতা অনেক নারীর ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে, কেননা তাঁদের পরিবারের প্রায় সব সদস্যের যত্ন নিতে হয়েছিল। যদিও পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে গৃহস্থালি দায়িত্ব পালনে লিঙ্গের মাত্রা পরিবর্তিত হচ্ছে (সিদ্দিকী এবং আনাস, ২০২০), তবুও, এই গবেষণায় সাক্ষাৎকারদানকারীদের অভিজ্ঞতা এমনই ছিল। বেশ কয়েকজন উত্তরদাতা বলেছেন যে দিনে তাঁদের আঠারো ঘন্টারও বেশি কাজ করতে হয়েছিল। কারণ পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই সবসময় বাড়িতে থাকত। কেবল তাঁদের জন্য রান্না করা কিংবা পয়-পরিষ্কারের কাজই করতে হয়নি, পরিবারের বয়স্ক ও অসুস্থ সদস্যদের সেবা-যত্নও করতে হয়েছিল। পাঁচজন উত্তরদাতাকে শ্বশুর-শ্বাশুড়িসহ পরিবারের বয়স্কদের যত্ন নিতে হয়েছিল। শুকরানা (৪০) ব্যাখ্যা করেছেন যে মহামারী কীভাবে পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছিল:

'আমি আমার শাশুড়ীকে হাসপাতালে নিতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু শহরের কোনো হাসপাতাল তাঁকে নিতে চায়নি। অবশেষে, একজন ডাক্তার তাঁকে তাঁর ক্লিনিকে দেখতে রাজি হলেন, যেখানে স্বাভাবিকের চেয়ে তিনগুণ বেশি ফি দিতে হয়। তাঁর জন্য হাসপাতালের শয্যার দরকার ছিল, দরকার ছিল ঠিকঠাক নার্সিং এবং চিকিৎসার। কিন্তু তাঁকে বাড়িতেই রাখতে হয়। তিনি ছাড়া বাড়ির একমাত্র নারী আমি হওয়ায় তাঁর সকল সেবা-যত্নের ভার আমার কাঁধে এসে পড়ে'।

সংসারের দৈনন্দিন দায়-দায়িত্বের ওপরে এই অসুস্থ মানুষের সেবাযত্ন করা এবং পরিবারের পুরুষদের কাছ থেকে সাহায্যের অভাব অনেক ফেলে-আসা স্ত্রীদের চরম দুর্দশাগ্রস্থ ও কাহিল করে ফেলে।

আর্থিক সংকট এবং জীবনধারণের উপায়ের ব্যবস্থা কমে আসা: রেমিট্যান্স প্রবাহের হঠাৎ পতন এবং গন্তব্য দেশগুলিতে অনেক পুরুষ অভিবাসীর কর্মহীনতা তাঁদের রেখে-আসা স্ত্রীদের গুরুতর আর্থিক অনিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক চাপের মুখে ফেলে। আমাদের গবেষণায় জড়িত বেশ কয়েকজন উত্তরদাতা বিদেশ থেকে রেমিট্যান্সের

প্রবাহ কমে আসায় জীবনধারণের উপায়ের অভাবের মধ্যে পড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে শ্রম বাজারে প্রবেশের সুযোগের অভাব এবং চলা-ফেরার বিধিনিষেধ। দেশে-থাকা অধিকাংশ অভিবাসীদের স্ত্রীদের সামনে জীবনধারণের উপায় মানে রেমিট্যান্সের পাশাপাশি স্থানীয় বিনিয়োগ কিংবা চাষাবাদ থেকে অনিয়মিত আয়ের জোগান। কিন্তু কোভিড-১৯ এই দুই অর্থনৈতিক প্রণালীর কার্যকারিতায় বাধা হয়ে আসে।

শিল্পী বেগমের কাহিনী

শিল্পী বেগম (২৭) ২০১৯ সালে তাঁর বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনের সাহায্য এবং স্থানীয় এনজিওর থেকে ঋণ নিয়ে স্বামী মেহেদী হাসানকে বিদেশে পাঠান। তাঁদের দুই মেয়ে এবং এক ছেলে আছে। তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর স্বামী সৌদি আরব থেকে টাকা পাঠাবে, যা দিয়ে শ্বশুর-শ্বাশুড়িসহ ৫ জনের পরিবার চালাতে পারবে। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন পূরণ হবার নয়। মেহেদী যে খণ্ডকালীন কাজ পায় তা দিয়ে সৌদি আরবে তার জীবনযাত্রা চালানোই কঠিন, দেশে আর পাঠাবে কী। এক বছর পরেও রেমিট্যান্স পাওয়া দূরে থাক, শিল্পীকে সংসার চালানো এবং ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার খরচ চালাতে তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে হয়। ওদিকে আত্মীয়-স্বজন ও এনজিও থেকে ঋণ পরিশোধের নিরন্তর চাপ। মহামারী এলে সৌদি আরবে তার স্বামীর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায় এবং তার স্বামী বেকার হয়ে পড়ে। সে যখন স্বামীকে ফোন করে, প্রতিবারই সে তার সঙ্গে চিৎকার করে। গত মাসে সে তাকে বলে আর ফোন না করতে। শিল্পী এখন জানে না এই মহামারীর মধ্যে কীভাবে সে আর্থিক চাপ সামলাবে এবং কার কাছে সাহায্য চাইবে।

গার্হস্থ্য সহিংসতা: বাধ্যতামূলক সহাবস্থান, দুমড়ে যাওয়া জীবনযাত্রা এবং আর্থিক কষ্ট রেখে-আসা স্ত্রীদের ওপর গার্হস্থ্য সহিংসতা বাড়িয়ে তোলে। পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে বেশি সময় কাটানোর সঙ্গে সহিংসতার সরাসরি সম্পর্ক থাকতে দেখা যায়। একে মানব মনস্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বলে ভাবা যেতে পারে (বুথ ২০১৭; নফজিগার এবং কুর্টজ ২০০৫)। গবেষকেরা এও বলছেন যে, নিম্ন আয়ের সঙ্গে গার্হস্থ্য সহিংসতার সম্পর্ক রয়েছে (পেপরাহ ও কুমসন, ২০১৭)।

কিছু পরিবারে আগে থেকে চলা নিগ্রহের বাস্তবতা কোভিড-১৯ মহামারীতে আরো বেড়েছে। যেমন, নিলুফার ইয়াসমিনের (৩৫) স্বামী ২০১২ সাল থেকে বাহরাইনে কর্মরত ছিল। স্বামীর পাঠানো রেমিট্যান্স নিয়ে শ্বশুরপক্ষের সঙ্গে সবসময়ই সমস্যা ছিল। করোনা পরিস্থিতির পর থেকে, তিনি আর নিয়মিতভাবে রেমিট্যান্স পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁর শ্বশুরবাড়ির কেউই সেটা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। তারা অভিযোগ করে যে, তিনি হয় ওই টাকা পাচ্ছেন নয়তো তাঁর বাবার বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অনেক সময়ই মৌখিক অভিযোগ শারীরিক অত্যাচারে পরিণত হয় বলে তিনি জানান।

রামরুর সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে আরো উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান উঠে এসেছে। সেখানে অভিবাসী পরিবারের ১০০টি সহিংসতার ঘটনা নথিবদ্ধ করা হয়। অভিবাসী স্বামীদের অবিধিবদ্ধ হঠাৎ প্রত্যাবর্তন অর্থনৈতিক চাপের সঙ্গে জড়িত হয়ে অনেক নারীকেই শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের মুখোমুখি করে। এটা শুধুমাত্র ফিরে আসা স্বামীদের দ্বারা নয় বরং বৃহৎ পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেও ঘটে। রামরুর গবেষণায় ধর্ষণ, নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন, যৌন হয়রানির ঘটনাগুলি রিপোর্ট করা হয়েছিল এবং এই গবেষণাপত্রের বিশদ

সাক্ষাৎকারের সময়ও এটি উঠে এসেছে। মালদ্বীপে কর্মরত এক ব্যক্তির স্ত্রীকে ছেলেকে জিম্মি করে ধর্ষণ করে তাঁরই এক প্রতিবেশী। মেয়েটির পরিবার অপরাধীকে ধরে বসলে সে ক্ষমা চায়। কিন্তু পরে ধর্ষণের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে দেয়। তখন থেকে মেয়েটি তাঁর সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে বসবাস করছে।

এছাড়াও, করোনা প্রতিরোধে অত্যধিক মনোযোগী থাকায় পারিবারিক সহিংসতাসহ অন্য অনেক অভিযোগের বিরুদ্ধে সরকারি সংস্থাগুলির অনেক নিয়মিত কার্যক্রমও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অভিযোগ প্রতিকারের পথ এভাবে বন্ধ হয়ে থাকাও ছিল এই গবেষণার দ্বারা চিহ্নিত আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এমন একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ঘটেছে যেখানে একজন প্রত্যাবাসিত পুরুষ অভিবাসী তাঁর মা ও বোনের সাহায্যে আপন স্ত্রীর হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। রেমিট্যান্সের জন্য পরিবারটি মেয়েটির স্বামী ও দেবরের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কাতারে লকডাউনের পর, তাঁদের দুজনেরই চাকরি চলে গিয়েছিল এবং তারা বাংলাদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। এই ধরনের অনেক সহিংসতা চলাচলে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে, বন্ধ দরজার পেছনে সংঘটিত হয় বলে ভুক্তভোগীদের পালানোর বা সাহায্য চাওয়ার উপায় থাকে না।

মানসিক চাপ এবং আত্মহত্যার চেষ্টা: শুধুমাত্র শারীরিক এবং যৌন সহিংসতাই নয়, মহামারী সৃষ্ট মানসিক চাপের কারণেও নারীদের জীবনে মারাত্মক পরিণতি নেমে আসে। বেশ কয়েকটি ঘটনা পাওয়া গেছে যেখানে স্বামীর বেকারত্ব থেকে তৈরি হওয়া ক্রমাগত চাপের সঙ্গে জড়িত উদ্বেগ এবং শ্বশুরবাড়ির দ্বারা মানসিক নির্যাতন রেখে-আসা স্ত্রীদের আত্মহত্যার চেষ্টার দিকে ঠেলে দেয়।

আয়েশা আক্তারের কাহিনী

আয়েশা আক্তার (৩১) ২০১০ সালে টাঙ্গাইল জেলার মামুন মিয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আয়েশার বাবা-মা জামাই মামুন মিয়ার দুবাই অভিবাসনের সুবিধার্থে দুই লাখ টাকা ঋণ হিসেবে দেন এই আশা নিয়ে যে, তাঁদের মেয়ের ভবিষ্যত ভাল হবে। ২০১২ সালে আয়েশা তাঁদের একমাত্র সন্তান, একটি কন্যার জন্ম দেন। ২০১৩ সাল থেকে তিনি তার শ্বশুরবাড়িতে বাস করা শুরু করেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ির পরিবারের ছয় জন সদস্যই দুবাই থেকে আসা রেমিট্যান্সের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। যাইহোক, ২০১৫ সাল থেকে মামুন দুবাইতে চাকরি নিয়ে সংগ্রাম করছিলেন এবং আর নিয়মিত টাকা পাঠাতে পারছিলেন না। দুবাইতে ছেলের আপাত ব্যর্থতার জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আয়েশাকে দায়ী করে নির্যাতন চালাতে থাকে। মেয়ের অবস্থা দেখে, আয়েশার বাবা-মা আবারও মামুনকে সাহায্য হিসেবে অতিরিক্ত ছয় লাখ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মামুন এবার ইউরোপে আরও ভাল সম্ভাবনার জন্য গ্রিসে চলে যান। কিন্তু মামুন সেখানেও ভাল কিছু করতে পারেনি। এই আর্থিক সংকট স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টানাপড়েনের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। ২০২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, করোনা পরিস্থিতির কারণে মামুন গ্রিসের এথেন্সে যে সাময়িক চাকরিটি করছিল, তাও হারান। সে রাতে তিনি আয়েশাকে ফোন করেন এবং হঠাৎ অভিযোগ করতে শুরু করেন যে আয়েশার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে তাঁর জীবন কীভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। যেন বিদেশে সমস্ত ব্যর্থতার জন্য তার জীবনে আয়েশার আগমনই দায়ী। একদিকে পিতামাতার বাড়িতে বোঝা হয়ে থাকা, অন্যদিকে বিদেশ থেকে স্বামীর ক্রমাগত চাপ ওই রাতেই আয়েশাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়।

সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থার অভাব এবং মহামারীর মধ্যে বুদ্ধি-পরামর্শের অনুপস্থিতি পেছনে ফেলে-যাওয়া স্ত্রীদের মধ্যে তীব্র মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, এই ধরনের অনেক ঘটনারই কোনো সংবাদ বা রেকর্ড থাকে না। কেননা খুব ঘনিষ্ঠ কারো সঙ্গে ছাড়া এই ধরনের বিষয় বাইরে কারো সঙ্গে আলাপের পরিণতি হয় আরো গঞ্জনা।

অনুচ্ছেদ ৮ : অভিবাসীরা কি পরিত্যক্ত?

বিশ্বায়ন ও অভিবাসী শ্রমের অনিশ্চয়তার মধ্যে সম্পর্ক: লিঙ্গ-সচেতন দৃষ্টিতে এই গবেষণাটি বাংলাদেশের নারী ও পুরুষ অভিবাসীদের রেখে-আসা স্ত্রীদের ওপর চলমান মহামারীর প্রভাব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছে। এর অনুসন্ধানগুলি এ বিষয়ক ক্রমবর্ধমান লেখালেখির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মনে করে যে, অভিবাসীদের ওপর মহামারীর প্রভাব খুব কমই লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হয়। কারণ সমাজ এবং শ্রম বাজার লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নয় (ফোলে এবং পাইপার, ২০২০: ৯)

মহামারী অনেক ভাবেই বিদেশে কর্মী নিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং সেখানে তাঁদের বসবাসের বাস্তবতায় আগে থাকা ত্রুটিগুলিই প্রকাশ করেছে এবং সাম্প্রতিক দশকগুলিতে লিঙ্গসমতার ক্ষেত্রে এই চিত্র বড় ধাক্কা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এই সমীক্ষা যা দেখায় তা নারী অভিবাসী শ্রমিকদের নাজুক অবস্থার নতুন কোনো চিত্রায়ন নয়। বরং গন্তব্য দেশ থেকে শ্রমিকদের নির্বিচারভাবে ফেরত পাঠানো, তাঁদের বেতন-তছরুপ এবং বিদেশে ও দেশে শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের ওপর আলোকপাত করে আমরা দেখিয়েছি যে, জরুরী অবস্থা মোকাবিলায় ইতিমধ্যে নাজুক অভিবাসন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও অপ্রস্তুত। অভিবাসীই হোক বা হোক পেছনে রেখে যাওয়া স্ত্রী-কুল, নারীদেরই মহামারীর ধকল বেশি সইতে হয়। উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো নারী অভিবাসীদের ক্ষেত্রে, কাফালা ব্যবস্থার অধীনে নিয়োগকর্তাদের প্রয়োগ করা চরম ক্ষমতা ও আধিপত্য ওইসব নারীদের বিপন্নতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। উপসাগরীয় দেশগুলির জাতীয় শ্রম আইন (অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৯) থেকে নারী অভিবাসীদের বাদ দেওয়ার কারণে তাঁদের কল্যাণ ও মৌলিক মানবাধিকার কতটুকু সুরক্ষা পাবে, তা নিয়োগকর্তাদের মহানুভবতার ওপর নির্ভর করে (হুদা ২০০৬)। গার্হস্থ্য কাজে রত অভিবাসী নারী শ্রমিকদের জন্য আইনি সুরক্ষার অভাবের কারণে অধিকার কর্তনেরও কোনো জবাবদিহি হয় না।

নারী অভিবাসীদের নির্বিচারে প্রত্যাবর্তন অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় একটা শূন্যতা এবং এই প্রক্রিয়ায় জড়িত সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবকেও প্রকাশ করে। যেহেতু অনেক অভিবাসী শ্রমিক বাড়ি ফিরছেন, তাই সরকারের দায়িত্ব হলো যাচাই করে দেখা যে, তাঁরা কি স্বেচ্ছায় ফিরছেন নাকি চুক্তি লঙ্ঘন করে তাঁদের গন্তব্য দেশগুলি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের কাছে এ ধরনের কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো, প্রত্যাবাসনের পূর্বে মজুরি, চাকরির শেষে দেয় সুবিধা এবং অন্যান্য বৈধ অধিকারগুলি পূরণ করা ছাড়া বাংলাদেশে প্রত্যাবাসনকে সহযোগিতা করা উচিত হবে না।

'বাংলাদেশী শ্রমিকরা আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন মেনেই বিদেশে কাজ করতে গেছেন। তাই তাঁদের নির্বিচারে বিতাড়ন করা যাবে না বা তাঁদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। যদি তাঁদের চাকরি নির্বিচারে বাতিল করা হয় তবে তাঁদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।' এমনটাই মনে করেন শরণার্থী ও অভিবাসী চলাচল গবেষণা ইউনিটের (রামরু) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সি আর আবরার।

দেশে থাকা স্ত্রীদের বেলায়, জীবনযাত্রা ও জীবিকা অর্জনের ক্ষমতায় ব্যাঘাত, যার অংশ হিসেবে তাঁদের অভিবাসী স্বামীদের দ্বারা বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহে ব্যাঘাত তাঁদের পরিবারের ওপর চাপ বৃদ্ধি করেছে, যা তাঁদের সহিংসতার মুখেও ফেলে দিয়েছে। নারীদের শারীরিক ও যৌনভাবে দমন করা হয়ে উঠেছে চাকরি হারানো এবং খালি হাতে ফিরে আসা অনেক প্রত্যাবর্তনকারী স্বামীর রাগ ও হতাশা প্রকাশ করার অন্যতম উপায়।

আমাদের অনুসন্ধান দেখায়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীদের ক্ষমতা যে কম, সেই বাস্তবতা মহামারীর প্রাদুর্ভাবের পর মোটেই বদলায়নি। ফলে, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসহ তাঁদের গতানুগতিক চাহিদা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক উদ্বেগগুলি মূলত উপেক্ষিত থেকেছে। উপরন্তু, মহামারীর সময়ে হটলাইন, ক্রাইসিস সেন্টার, আশ্রয়কেন্দ্র, আইনি সহায়তা এবং সুরক্ষা পরিষেবাগুলির মতো অন্যান্য পরিষেবাগুলি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা পরিবারের মধ্যে লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতিতে সাহায্য পাওয়ার কয়েকটি সুযোগও কমিয়ে দিয়েছে। নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ঠেকানোয় যেসব উপায় ছিল তা কোভিড-১৯ এর তাৎক্ষণিক কবল থেকে রক্ষার আয়োজনে ন্যস্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সীমিত সহায়ক-ব্যবস্থা তাই গুরুতর চাপে পড়েছে।

অনুসন্ধানগুলি আরো দেখায় যে গন্তব্য দেশে অভিবাসন ও কর্মসংস্থান আইন থেকে উদ্ভূত অনেক বাধা অভিবাসী শ্রমিক, বিশেষত অভিবাসী নারীদের স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য সামাজিক সহায়তার বিধি-বিধানের বাইরে ফেলে দিয়েছে। এই ধরনের পটভূমিতে, বর্তমান স্বাস্থ্যগত জরুরী অবস্থার মতো বৈশ্বিক সংকটগুলি শ্রম ও মানবাধিকার কর্তনের দ্রুততম সুযোগ হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমে এমন এক পরিস্থিতি বেড়ে চলে যা মারাত্মক কাঠামোগত অসমতা প্রকাশ করে। আইনের এই বৈষম্য এবং বিদ্যমান অন্যান্য বৈষম্যগুলি 'দাসত্বের আধুনিক রূপ' হিসেবে পরিচিত।

যে বিশ্বায়নের যুগে আমরা এখন বসবাস করছি তার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে মৌলিক মানবাধিকারের বিনিময়ে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। এই বৈশ্বিক আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকা অভিবাসী শ্রমিকরা এই ব্যবস্থার খেসারত দিচ্ছে। এটা শুধু তাঁদের প্রাপ্য আইনী সুবিধা ও অধিকারই বাতিল করছে না, বিশ্বায়ন ও উন্নয়নের কাঠামোর মধ্যে তাঁদের অধিকারও অস্বীকার করছে। এইভাবে, মহামারীটি আন্তর্জাতিক অভিবাসন, বিশেষ করে দক্ষিণ-দক্ষিণ অভিবাসন করিডোরে অনেক নীতি পুনর্বিচার ও পুনর্বিবেচনার সুযোগ করে দিয়েছে।

নব্য উদারতাবাদের যুগে আউটসোর্সিং ও অভিবাসন কীভাবে একই বৈশ্বিক উৎপাদনের মজুরি-বৈষম্য-চালিত রূপান্তরের দুটি দিক হয়ে উঠেছে, তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হলো বাংলাদেশ। কিন্তু মহামারীটি এই প্রশ্ন উশকে দেয় যে, কী হবে উন্নয়নের খেসারত এবং এর বিধি-ব্যবস্থা কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক যেখানে শ্রমের প্রতি অবিচার, শ্রম শোষণের বিস্তার হয়ে উঠেছে এই ধরনের উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য নমুনা। নির্বিচারে বরখাস্ত করা, শেষ বেতনের চেক ছাড়াই জোর করে বিতাড়নের সমস্যাটি কেবল কাজ ও শ্রম শোষণের সমস্যা নয়; কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং তার পরিণতি বলে যে, উৎপাদনের বিশ্বায়িত কাঠামোর মধ্যে যে বৈষম্য ও অবিচারের বড় বৃত্ত সক্রিয় ও বিদ্যমান; তার পুনর্গঠন প্রয়োজন।

মহামারীটি বিশেষভাবে দেখায় যে, অভিবাসী শ্রমিক বিশেষ করে নারীরা আমাদের সমাজের অপরিহার্য কাজগুলি করে থাকে। তবুও, এই শ্রমিকদের মোটামুটি সকল মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং রাখা হয় অপরিহার্য পরিষেবাগুলি থেকে দূরে। ভাবা দরকার, কী এবং কে 'অপরিহার্য' কর্মী হিসেবে বিবেচিত হবে। যদিও এই 'অপরিহার্য' বৈশিষ্ট্যকে রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা ও জরুরত দিয়ে ঢেকে ফেলা হয় (ফোলি ও পাইপার, ২০২০)। যদিও কেউ কেউ কোভিড-১৯ সৃষ্ট বিপর্যয়কে আরও সমান এবং রূপান্তরকামী লিঙ্গ সম্পর্ক তৈরি করার সুযোগ

হিসাবে ঘোষণা করেছেন, অন্যরা দেখাচ্ছেন যে এটি বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া না হলে অভিবাসী নারীরা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং অনিশ্চিত অভিবাসন অবস্থায় পতিত হবে (ম্যাকআইলওয়েন, ২০২০)।

কোভিড-১৯ এর প্রতিক্রিয়ার বেলায় ভাইরাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে দেশগুলির গৃহীত পদক্ষেপে যাতে পদ্ধতিগতভাবে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা এবং অভিবাসী শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকে, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আর তা হতে হবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির চেতনায় ('কাউকে পেছনে ফেলবেন না') এবং নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসনের জন্য গ্লোবাল কম্প্যাক্টের আলোকে (ফোলি ও পাইপার, ২০২০)।

অধ্যায় উপসংহার

প্রতিটি জরুরী পরিস্থিতির মতো, কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য সংকট বিদ্যমান স্বাস্থ্য এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সাথে সাংঘার্ষিক। এর অর্থ হল যে বিশ্বজুড়ে মানুষ এখন একই ঝড়ের মুখোমুখি হচ্ছে, যদিও তাঁদের নৌকাগুলি আলাদা। বাংলাদেশ থেকে অভিবাসনের পরিপ্রেক্ষিতে, এই অধ্যায়ে বর্তমান ও জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো নারী অভিবাসী এবং পুরুষ অভিবাসীদের স্ত্রীদের ওপর মহামারীর লক্ষ্যণীয় লিঙ্গগত প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, অভিবাসনের ক্ষেত্রে নারীদের ওপর কোভিড-১৯ এর অসম প্রভাব পড়েছে, যার মধ্যে কেবল লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং অন্যান্য শারীরিক নির্যাতনই নয়, অর্থনৈতিক কষ্ট, স্বাস্থ্যের অবনতি, কলঙ্ক আরোপ এবং সব চাইতে বড় ঘটনা হলো অনিশ্চয়তা, অসহায়ত্ব এবং ক্রমাগত ভয়। বেকারত্ব এবং বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক পরিণতির ওপর আলোকপাত করে এটি বাংলাদেশ সরকার এবং বৈশ্বিক অংশীজন; উভয় তরফের কাছেই কীভাবে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় ক্ষেত্রে নারী অভিবাসীদের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত ও প্রসারিত করা যায় এবং অভিবাসনের প্রেক্ষাপটে নারীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনার মতো সুপারিশ পেশ করে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, মূলত অর্থনীতি, জীবিকা, গৃহস্থালি ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি বর্তমান মহামারীর মতো জরুরী পরিস্থিতিতে পুরুষ ও নারীদের স্বতন্ত্র লিঙ্গীয় অবস্থান সম্পর্কে বোঝাপড়ার অভাবের কারণে ইতিমধ্যেই সূচিত সাধারণ প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে কিছু লক্ষ্যণীয় ফাঁক রয়ে গেছে। এই ফাঁকগুলি দূর করার জন্য, এই অধ্যায়ে উপস্থিত হওয়া সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে যার সমাধান হওয়া দরকার। পাশাপাশি এই বিশেষ জরুরী অবস্থার জন্য তাৎক্ষণিক এবং কার্যকর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিকশিত করতে হবে এমন দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগুলিও হাজির করা হয়েছে। এটি আরও জোর দিয়ে বলে যে, কোভিড-১৯ সংকট অভিবাসন প্রেক্ষাপটের আওতায় লিঙ্গীয় সমতার জন্য একটি জলবিভাজিকা মুহূর্ত এবং অর্থনীতি ও সমাজে নারীর ভূমিকা পুনর্বিবেচনার এক সুযোগ। এটা অনেক ভাবেই আমাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার একটি মূল্যায়ন, যা দেখায় যে আমাদের অগ্রাধিকারগুলি উল্টো করে দাঁড় করানো এবং পেছনমুখী। দেশে ও বিদেশে, শ্রমের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষায় এবং উপার্জন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হলো এমন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না-যাওয়া যার মানে হলো বিদ্যমান বৈষম্যেরই ধারাবাহিকতা। অভিবাসনের ফাটল ধরা বিশ্বায়ন থেকে শিক্ষা নেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। আর তা হতে পারে কাজের ভিন্নতর ধরন এবং কাউকে পেছনে ফেলে না যাওয়ার নতুন আরম্ভের মাধ্যমে।

অধ্যায় ১০

সারমর্ম, উপসংহার এবং সুপারিশ

তাসনিম সিদ্দিকী

এই গবেষণায় কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালে নারী ও পুরুষ উভয় ধরনের বাংলাদেশী অভিবাসীদের পাশাপাশি তাঁদের রেখে-যাওয়া পরিবারের দুর্দশা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার লক্ষ্য হলো সংকটকালে বিভিন্ন গন্তব্য দেশে কর্মরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের সাহায্য করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নীতি ও কৌশল প্রণয়নে নীতিনির্ধারকদের সপ্রমাণ সাহায্য করা।

অনুচ্ছেদ ১: সারমর্ম

গবেষণার প্রধান প্রশ্নগুলি শনাক্ত করা, অনুসরণ করার জন্য ধারণাগত কাঠামো প্রণয়ন এবং গবেষণার প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধানের জন্য আবশ্যকীয় পদ্ধতি বিকশিত করার মাধ্যমে বইটি শুরু হয়। গবেষণার প্রশ্নগুলি গন্তব্য ও মূল দেশে অভিবাসী ও তাঁদের পরিবারের কোভিড-১৯ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। গন্তব্য দেশে অভিবাসীদের অবস্থা বোঝার বেলায় প্রধান সূচকগুলি ছিল: সংক্রমণের সংস্পর্শে আসা, চিকিৎসার প্রাপ্যতা, চাকরি ও আয়ের অবস্থা, আয়ত্তাধীন সামাজিক সুরক্ষার ধরন, অভিবাসীদের নিরাপত্তায়নের মাত্রা এবং সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজের লভ্যতা। জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সূচকগুলির মধ্যে রয়েছে: প্রত্যাবাসনের পর চাকরি ও আয়ের পরিস্থিতি, বাংলাদেশে অভিবাসীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুনর্ভুক্তির জন্য সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ। রেখে-যাওয়া পরিবারের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়: পারিবারিক আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরতা, রেমিট্যান্স ব্যবহারের সুযোগ, রেমিট্যান্সের অভাবে জীবিকা বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ এবং সরকারি প্রণোদনা কর্মসূচির লভ্যতা।

দ্বিতীয় অধ্যায় কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বৃহত্তর অভিবাসনের দৃশ্যপট তুলে ধরে। এটি দেখায়, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ২,৩৩০ জনেরও বেশি বাংলাদেশি মারা গেছেন। কোভিড-১৯ সময়কালে, প্রায় ৪০০,০০০ অভিবাসী বাংলাদেশে ফিরে এসেছে (বেশিরভাগই জোরপূর্বক)। বড় আকারের ফেরার ঢেউ শুরু হয়েছিল ২০২০ সালের অক্টোবর থেকে। এমনকি এখনও (এই

প্রতিবেদন লেখার সময়) প্রতিদিন ২,৫০০ এরও বেশি কর্মী ফিরছেন। স্বাভাবিক বছরে, গড়ে ৭০০,০০০ শ্রমিক কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অভিবাসন করে। কোভিড-১৯ এর আগে, ২০২০-এর প্রথম আড়াই মাসে মোট ১৮১,২৮০ জন শ্রমিক কাজের জন্য বিদেশে পাড়ি জমান। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের পর, প্রথম ছয় মাসে বহির্মুখী অভিবাসন সম্পূর্ণভাবে থমকে যায়। জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মাত্র ৩৬,৪১৩ জন কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে অভিবাসন করতে সক্ষম হয়েছিল। কোভিড-১৯ এর কারণে আগের বছরের তুলনায় এই বছর (২০২০) অভিবাসন প্রবাহ প্রায় ৬৯ শতাংশ কমে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়টি জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসী এবং রেখে-আসা পরিবারের বর্তমান অভিবাসীদের পরিচিতি দেয়। এটি দেখায় যে ১০০ জন জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের মধ্যে নারী ছিল মাত্র ২ জন। বিভিন্ন গন্তব্য দেশে বর্তমান অভিবাসীদের রেখে-যাওয়া ১০০ পরিবারের ক্ষেত্রে, পুরুষ অভিবাসী ছিল ৭৪ জন এবং নারী ছিল ২৬ জন। এই পুরুষ ও নারী অভিবাসীরা ২১টি জেলা থেকে এসেছে এবং তারা চলে গেছে ১৭ টি দেশে। ৭২ শতাংশে গেছে উপসাগরীয় এবং অন্যান্য আরব দেশে। ১৭২ জন জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো এবং বর্তমান পুরুষ অভিবাসীদের গড় বয়স ৩৬ বছর এবং নারী অভিবাসীদের গড় বয়স ৩২ বছর। ফেরত পাঠানো এবং বর্তমান অভিবাসীদের উভয়ের পরিবারের সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৫.৬ ও ৫.৫। এসব পরিবারের গড় মাসিক আয় ছিল ১৭,৮৫৫ টাকা করে (২১০ মার্কিন ডলার)। ২০২০ সালের মে থেকে জুলাই পর্যন্ত তা নেমে আসে মাসিক ৭,৩০০ টাকায় (৮৬ মার্কিন ডলার)।

চতুর্থ অধ্যায় প্রকাশ করে যে, কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার সময় বাংলাদেশী পুরুষ অভিবাসীরা স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়েছিল। অভিবাসীদের জন্য খাদ্য নিশ্চিত না করে লকডাউন জারি করা তাঁদের আরও বেশি ঝুঁকিতে ফেলেছিল, কারণ তখন তাঁদের অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজের উপায় খোঁজ করতে হয়েছিল। এতে করে তাঁরা স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ে যান। তাঁদের বাসস্থানগুলিতে নির্ধারিত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাও ছিল কঠিন।

বিভিন্ন শ্রম গ্রহণকারী দেশ ঘোষণা করেছিল যে আইনগত অবস্থা নির্বিশেষে সকল অভিবাসীদের জন্য কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে। বাস্তবে, অনিয়মিত অবস্থায় থাকা অভিবাসীরা গ্রেপ্তার, আটক এবং পরবর্তীতে বিতাড়নের ভয়ে কোভিড-১৯ পরীক্ষা এবং অন্যান্য পরিষেবা গ্রহণ করেনি।

জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো এবং বর্তমান অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারগুলি বড় ধরনের মানসিক আঘাত ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। যাইহোক, পুরুষ ও নারী অভিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগের উৎসগুলি লক্ষ্যণীয়ভাবে আলাদা। পুরুষ অভিবাসীরা চাকরি হারানো, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া, মূলধন হারানো ইত্যাদি আশঙ্কা নিয়ে বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। আবাসিক নারী অভিবাসী শ্রমিকদের উদ্বেগ ছিল কাজের চাপ লক্ষ্যণীয়ভাবে বাড়ার কারণে শারীরিক কষ্ট, বিলম্বিত বা আংশিক বেতনের জন্য দেশে-থাকা পরিবার চালানোর অক্ষমতাজাত। অনাবাসিক নারী শ্রমিক এবং যারা সাফাইকাজে এবং কারখানার শ্রমিক হিসাবে ছিলেন, তাঁরা পুরুষ সহকর্মীদের মতোই চাকরি হারানো থেকে উদ্ভূত অনিশ্চয়তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। আবাসিক বা অনাবাসিক যা-ই হোক, নারী অভিবাসীরা সবাই উদ্বেগাকুল থাকায় পরিবারের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের মাত্রা লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে গিয়েছিল। আগে প্রায় সব নারী অভিবাসী প্রতিদিন পরিবারের সঙ্গে কথা বলতেন। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের পরে, অনেকেই ১০ দিনে একবারও যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। যোগাযোগ কমে যাওয়ার প্রভাব নারী অভিবাসীদের রেখে-আসা শিশুদের ওপর পড়ে। যাইহোক, পুরুষ অভিবাসীদের কেউই যোগাযোগের অভাব বা কম যোগাযোগকে উদ্বেগের কারণ হিসেবে বিবেচনা করেননি।

কোভিড-১৯ এর সময় পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৪০ শতাংশ চাকরি ধরে রাখতে সক্ষম হন। আবাসিক নারী গৃহকর্মীরা অবশ্য চাকরি হারাননি। অতীতের অন্যান্য সংকটময় পরিস্থিতির মতো, গন্তব্য দেশগুলি তাঁদের দেশে কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলার অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে অভিবাসীদের বলপূর্বক বিতাড়নের পথ বেছে নিয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা; অনিয়মিত অভিবাসীদের গ্রেফতার, আটক ও বিতাড়ন; যারা ভিসার অতিরিক্ত সময় থেকেছে তাঁদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা; এবং দোষী সাব্যস্ত ও কারাবন্দী অভিবাসীদের ক্ষমা করা ছিল এমন কিছু প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভিবাসীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের কেউই দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে কারাবন্দী গোষ্ঠীর অংশ ছিল না। সাক্ষাৎকার নেওয়া অভিবাসীদের গুদাম, রাস্তা, রাস্তার পাশের খাবারের দোকান ইত্যাদি থেকে তুলে অন্তরীণ করা হয়েছিল। কয়েকজন ছাড়া প্রায় সব সাক্ষাৎকারদাতা আটক থাকার সময় অমানবিক আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন। গড়ে তারা ২০ দিন করে আটক ছিলেন। আটককেন্দ্রে ঘুমানোর ব্যবস্থা, টয়লেট ও গোসলের সুযোগ ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। এই সময়ে তাঁদের অধিকাংশকেই এক কাপড়ে থাকতে হতো।

প্রত্যাবর্তনের আকস্মিক চরিত্রের কারণে, অনেক অভিবাসী তাঁদের কঠোর উপার্জনের একটি অংশ গন্তব্য দেশে রেখে আসতে বাধ্য হন। ৬৭ শতাংশ অভিবাসী তাঁদের বেতন/মজুরির একটি অংশ রেখে আসেন, ৬২ শতাংশ রেখে আসেন তাঁদের কিছু সম্পদ, জিনিসপত্র ও উপকরণ। গ্রেফতার করার সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি তাঁদের সঙ্গে থাকা স্থানীয় মুদ্রা, মোবাইল, ঘড়ি ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করেছিল। ফেরত পাঠানোর সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেসব সম্পদ ফেরত পাননি ১৯ শতাংশ অভিবাসী। ৭ শতাংশ অভিবাসীকে ভিসার বার্ষিক নবায়নের জন্য দালাল বা এজেন্টদের দেওয়া যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ছেড়ে আসতে হয়। কয়েকজন তাঁদের কষ্টে থাকা বন্ধুদের টাকা ধার দিয়েছিল। এগুলি পুনরুদ্ধার করার কোনো উপায় নেই।

এই অধ্যায়টি তুলে ধরেছে যে বিশ্বায়নের এই যুগে, শ্রম-গ্রহীতা দেশগুলিতে এখনও এমন পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই যা অভিবাসীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি রোধ করতে পারে। কিছু দেশ নিয়ম করেই অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সুরক্ষার বাইরে রেখেছে, চাকরির চুক্তিকে পাত্তা না দিয়ে তাঁদের প্রাপ্য মজুরি এবং অন্যান্য প্রাপনীয় অধিকারগুলি পরিশোধ করা ছাড়াই বিতাড়ন করেছে। এই সংকটের সময় আন্তর্জাতিক মান এবং পালনীয় নির্দেশিকাগুলি গন্তব্য দেশগুলিতে অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করায় কাজে আসেনি; কারণ বেশিরভাগ গন্তব্য দেশ সেসব চুক্তি স্বাক্ষর করেনি।

পঞ্চম অধ্যায় কোভিড-১৯ কালে গন্তব্যদেশ ও বাংলাদেশে উভয় স্থানেই বাংলাদেশী অভিবাসীদের নিরাপত্তায়নের শিকার হওয়া তুলে ধরে। এটি অভিবাসী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি নিম্নস্তরের মানব নিরাপত্তা দেওয়ার মাধ্যমে নিরাপত্তায়নের মারাত্মক পরিণতিও দেখায়। গন্তব্য দেশগুলির গণমাধ্যম, নিয়োগকর্তা, বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ইত্যাদি অভিবাসীদের কোভিড-১৯ এর অন্যতম অতি-সংক্রমণকারী হিসাবে চিত্রিত করেছে। অভিবাসীদের দেখানো হয়েছিল লকডাউনের কঠোর নির্দেশনা অমান্যকারী হিসেবে। খাদ্য সংগ্রহের জন্য অভিবাসীদের মরিয়া চেষ্টাগুলিকে গন্তব্য দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তাহীন করে তোলার কাজ বলে ফলাও করে দেখানো হয়। কোভিড-১৯ এর সময় স্বাস্থ্য নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টিকারী হিসেবে অভিবাসীদের চিত্রায়নকারী সংবাদ প্রতিবেদন গন্তব্য দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষকে চার লাখেরও বেশি বাংলাদেশি কর্মীদের ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্তের মদদ হিসেবে কাজ করেছে।

দুর্ভাগ্যবশত, গন্তব্যের দেশ ছেড়ে আসার পরও অভিবাসীদের নিরাপত্তায়ন বন্ধ হয়নি। স্বদেশেও তাঁদের নিরাপত্তায়নেরমূলক বক্তৃতা-বিবৃতির তরঙ্গের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বিমানবন্দরে সরকারী কর্মকর্তারা অভিবাসীদের ব্যাপক সন্দেহ নিয়ে পরিষেবা দিচ্ছিলেন। সরকারি কর্মচারীদের চোখে-মুখে এটা স্পষ্ট ছিল যে, অভিবাসীদের প্রত্যাবর্তন দেশকে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে, যেহেতু তাঁরা সাথে করে ভাইরাস নিয়ে আসছেন বলে সন্দেহ করা হয়েছিল।

অভিবাসীরা যখন তাঁদের গ্রামে ফিরে আসেন, স্থানীয় সমাজ তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করে না। প্রাথমিক পর্যায়ে, তাঁদের মৌখিকভাবে গালাগালি করা হয়েছিল এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্থানীয় বাজারে প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক মাস পরে, স্থানীয় সমাজের মনোভাব কিছুটা হলেও বদলায়। জুন থেকে আসা অভিবাসীরা তাঁদের পূর্বসূরিদের মতো জনতার একইরকম অসহিষ্ণুতার মুখে পড়েননি।

কিছু ক্ষেত্রে, অভিবাসীরা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আচরণ নিয়ে তীব্রভাবে সমস্যায় পড়েছিলেন। কিছু অভিবাসীর পরিবারের সদস্যরা মৌখিক অথবা শারীরিক ভঙ্গির মাধ্যমে তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তবে তা মূলত আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে। তা সত্ত্বেও অভিবাসীরা অনুভব করেছেন, ফেরত পাঠানোর সময় তাঁরা যে মানসিক আঘাতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা তা বুঝতে পারেননি।

কোভিড-১৯ অভিবাসীদের মানব নিরাপত্তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। চাকরি ও আয়ের অভাব ছিল অভিবাসী পরিবারের মানব নিরাপত্তাহীনতার প্রধান উৎস। বেশিরভাগ অভিবাসীদের জন্য দৈনন্দিন জীবনধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য অর্থ ধার করা ছিল তাঁদের প্রধান উপায়। খাদ্য গ্রহণের পরিমাণের পাশাপাশি, স্কুলগামী শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারেও আপস করা হয়েছিল। অভিবাসী পরিবারের একটি অংশ গৃহশিক্ষক রাখা বন্ধ করে দেয়। পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষত বয়স্ক সদস্যদের সেবা ও চিকিৎসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কারো কারো জন্য ওষুধ কেনাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল চ্যালেঞ্জের বিষয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পুনর্ভুক্তি (reintegration) ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অভিবাসীরা সেই পর্যায়ে ঋণ নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি। কারণ, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ব্যবসার জন্য অনুকুল পরিবেশ ছিল না।

এই অধ্যায়টি দেখায় যে অভিবাসীরা গন্তব্যের দেশগুলির সবচেয়ে কণ্ঠস্বরহীন গোষ্ঠী ছিল এবং তাঁদের নিরাপত্তায়ন করাও ছিল বেশ সহজ। অভিবাসীদের সফল নিরাপত্তায়নের মাধ্যমে অভিবাসী বিরোধী নীতি বাস্তবায়িত হয়। নিরাপত্তায়নের পরে বৈশ্বিক উন্নয়ন অংশীদার কিংবা শ্রমিকের মূল দেশগুলির জন্য অভিবাসীদের বেআইনিভাবে বিতাড়ন ঠেকানো কঠিন হয়ে যায়। ফেরত পাঠানো অভিবাসী এবং রেমিট্যান্স না-পাওয়া প্রবাসী পরিবারের রেখে-আসা সদস্যদের মানব নিরাপত্তাহীনতা বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গন্তব্যস্থলে এবং যে কোনো সংকটের সময়ে অভিবাসীদের প্রত্যাবর্তনের পর কীভাবে তাঁদের সহায়তা করা যায় সে বিষয়ে একটি জাতীয় কৌশল থাকার শক্তিশালী যৌক্তিকতা হাজির করেছিল কোভিড-১৯ এর বিস্তার।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে কোভিড-১৯ কালে বাংলাদেশে রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবাহ থেকে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করেছে। বিসিএসএম ও আরএমএমআরইউ জরিপের মাইক্রো ডেটা দেখায় যে রেমিট্যান্স না পাওয়ার কারণে বিপুল সংখ্যক পরিবার কঠিন সময় পার করছে। বিসিএসএম ও রামরুর জরিপেও দেখায় যে কোভিড-১৯ এর

প্রাদুর্ভাবের পর থেকে গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় পর্যন্ত ৬১ শতাংশ পরিবার কোনো রেমিট্যান্স পায়নি। বাকি পরিবারগুলি গড়ে তিন মাস সময়ে ৫৩,৫০০ টাকা (৬৩০ মার্কিন ডলার) পেয়েছে।

যেসব পরিবার কোভিড-১৯ এর সময় রেমিট্যান্স পাচ্ছিল না তারা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় ছিল। ৫৭ শতাংশ পরিবার রেমিট্যান্সের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ১৮ শতাংশ পরিবারের আয়ের তিন-চতুর্থাংশ রেমিট্যান্স থেকে আসে। অন্যদিকে ১৪ শতাংশ পরিবারের আয়ের অর্ধেকটা আসে রেমিট্যান্স থেকে। প্রত্যাবাসিত অভিবাসী পরিবার এবং বর্তমান অভিবাসীদের রেখে-যাওয়া পরিবারের সদস্যরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, এই অধ্যায়ে সেসবও তুলে ধরা হয়েছে। প্রতি বেলায় মোটামুটি খাবারের ব্যবস্থা করাই এসব পরিবারের কারো কারো জন্য সমস্যাকর হয়ে পড়ে। তাঁদের অনেকেই ঋণ করে বেঁচে ছিলেন।

অধ্যায়টি আরো দেখায় যে, কোভিড-১৯ এর সময় রেমিট্যান্সের লক্ষ্যণীয় লৈঙ্গিক মোচড় (twist) রয়েছে। আগ্রহ জাগানো বিষয় হলো, মাত্র ৬৯ শতাংশ নারী অভিবাসীর পরিবার রেমিট্যান্স পেয়েছে যেখানে পুরুষ অভিবাসী পরিবারের মাত্র ৩০ শতাংশ তা পেয়েছে। এটি বিশ্বায়িত বিশ্বে অভিবাসনের জটিলতার প্রতিফলন। শ্রম অভিবাসনের প্রেক্ষাপটে সাধারণভাবে নারী অভিবাসীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি শোষিত হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কোভিড-১৯ এর সময় নারী গৃহকর্মীরা তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় আয় হারানোর ঝুঁকিতে কম ছিলেন।

চাকরি হারানো এবং কর্মস্থল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্বব্যাংক এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) পূর্বাভাস দিয়েছিল যে ২০২০ সালে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পাবে। ২০২০ সালের মে মাসে বিশ্বব্যাংকের অনুমান ছিল, যে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ আগের বছরের চেয়ে ২২ শতাংশ কম হবে। আর এডিবি পূর্বাভাসর ছিল, তা আগের বছরের তুলনায় ২৮ শতাংশ কম হবে। যাইহোক, আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্সের ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ দেখা গেছে। ২০২০ সালে এটি ২০১৯-এর তুলনায় ১৮.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (১৮.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। আবার, আগস্ট থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত রেমিট্যান্স বেড়েছে ৩১ শতাংশ। ২০২০ সালের ক্যালেন্ডারে বছরে বাংলাদেশি অভিবাসীরা ২১.৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাঠিয়েছে।

এই জটিলতাগুলি এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই বাস্তবতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে অনেক জটিলতার কারণে রেমিট্যান্স বাড়ছে। জাতীয় পর্যায়ে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির অর্থ এই নয় যে সকল অভিবাসী রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে। আসলে, অনেক অভিবাসী রেমিট্যান্স না পাঠানোয় তাঁদের পরিবার ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হয়েছিল। রেমিট্যান্স বৃদ্ধির কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল: কোভিড-১৯ এর পরে চাকরির অনিশ্চয়তার কারণে আরো স্থিতিশীল কর্মীরা তাঁদের সঞ্চয় ফেরত পাঠাচ্ছে; নির্বাসনের ভয়ে শ্রমিকরা সমস্ত সঞ্চয় ফেরত পাঠাচ্ছে; বিপুল পরিমাণে নির্বিচারে প্রত্যাবর্তনের অর্থ এই যে, অভিবাসীরা গন্তব্যের দেশগুলিতে তাঁদের যা কিছু সম্পদ আছে তা ফিরিয়ে আনতে পারে; এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দিক থেকে রেমিট্যান্স প্রেরকদের জন্য দুই শতাংশ আর্থিক প্রণোদনা এবং শীর্ষ রেমিট্যান্সগ্রহীতা কয়েকটি ব্যাংকের ১ শতাংশ অতিরিক্ত প্রণোদনা রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য সরকারী চ্যানেলগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আরেকটি উল্লেখনীয় ঘটনা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলগুলির মাধ্যমে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে; তা হুন্ডির কারবারের সাথে সম্পর্কিত। কোভিড-১৯ এর মধ্যে ব্যবসা খাতের অনেক গোষ্ঠীর হুন্ডির সাহায্য দরকার হয়নি। রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলি ওয়ার্ক পারমিট কেনার টাকা হুন্ডির মাধ্যমে পরিশোধ করে থাকে। স্বাভাবিক পরিস্থিতি থাকলে ২০২০ সালে মোটামুটি ৭ লাখ শ্রমিক অভিবাসী হতো, কার্যত সেখানে অভিবাসন করতে পেরেছে মাত্র ২ লাখ ১৭ হাজার ৬৬৯ জন। এর অর্থ ওই

বছরে অনেক কম সংখ্যক ভিসা কিনতে হয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে আরো অন্তত ৪৮২,৩৩১ টি ভিসা কিনতে হুন্ডির মাধ্যমে অনেক বেশি টাকা পাচার হতো। কিছু আমদানিকারক, উৎপাদক কর এড়াতে হুন্ডির ওপর নির্ভরশীল হয় এবং তারা আমদানিতে আন্ডার ইনভয়েস করে। সোনা এবং অন্যান্য চোরাচালানীরাও হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন করে। হজ্বের সময় হাজিদের থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করায় হুন্ডি ব্যবহৃত হয় (কিন্তু ২০২০ সালে হজ্ব অনুষ্ঠিত হয়নি)। তাই আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পথে বাইরে থেকে যে সম্পদ বাংলাদেশে ঢুকে থাকে, কোভিড-১৯ এর কারণে তা বৈধ পথে আসে। রেমিট্যান্স প্রবাহের ওপর বিভিন্ন সংস্থার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যেসব মডেলিংয়ের ওপর ভিত্তি করে করা হয়, তা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ব্যস্টিক বাস্তবতা (micro level realities) বিবেচনায় আনতে পারে না। এ কারণেই দেশে রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবাহের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক অভিবাসী পরিবারের রেমিট্যান্স না পাওয়ার মধ্যে ব্যাখ্যার অভাব রয়ে যাচ্ছে।

অধ্যায় ৭ রেমিট্যান্সের আংশিক বা সম্পূর্ণ স্থগিতাবস্থা মোকাবিলায় রেখে-আসা অভিবাসী পরিবারের দ্বারা ব্যবহৃত মোকাবিলা পদ্ধতি এবং কৌশলগুলি অনুসন্ধান করে। এই কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে নিজস্ব তৎপরতা বা স্ব-সংহতি, সামাজিক সংহতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংহতির আয়োজন। স্ব-সংহতি হলো খরচের অভ্যাস গুটিয়ে আনা, পণ্য ও সেবা কমিয়ে আনা, তুলনামূলক দামি খাবার কম খাওয়া ইত্যাদি। সামাজিক সংহতি হলো বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছ থেকে সহায়তা। প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি মানে রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ ও বাজারের সহায়তা। এই অধ্যায় এটাও দেখায় যে মোকাবিলা কৌশল কোনো একরৈখিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেনি। উপরুন্তু প্রক্রিয়াটি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং কিছু কৌশলের পাল্টা-ফল হিসেবে সামাজিক জটিলতা থাকতে দেখা গেছে।

প্রত্যাবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার একটি ঋণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অভিবাসীরা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিনিয়োগ ঋণ ৪ শতাংশ সুদে নিতে আগ্রহী নয়। জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের একটি অংশ ভেবেছিল, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি অতিক্রান্ত হয়নি এবং ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করার জন্য পরিবেশ যথেষ্ট স্থিতিশীল নয়। অন্য কেউ কেউ ভেবেছিল, তাঁদের উদ্যোক্তা হওয়ার দক্ষতা নেই।

সাধারণত যেকোনো জরুরী পরিস্থিতিতে লিঙ্গ বৈষম্য এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বাড়ে; তা সে পরিস্থিতি অর্থনৈতিক সংকট হোক বা যুদ্ধ-সংঘাত কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব হোক। অষ্টম অধ্যায়ে এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোভিড-১৯ এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এটি দেখায় যে, বর্তমান স্বাস্থ্য সংকট আগে থেকেই বিদ্যমান লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য উন্মোচন এবং তা আরো গভীর করেছে। বেরিয়ে আসা পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয়, মহামারীটি বিশ্বব্যাপী গার্হস্থ্য এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাকে তীব্র করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বর্তমান ও প্রত্যাবর্তিত নারী অভিবাসীদের পাশাপাশি পুরুষ অভিবাসীদের রেখে-যাওয়া স্ত্রীদের ওপর কোভিড-১৯ এর লিঙ্গগত ফলাফল অধ্যয়ন করা হয়েছিল। অধ্যায়টি দেখায় যে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সংকট বিদ্যমান লিঙ্গভিত্তিক অসমতা এবং সহিংসতাকে আরো বিস্তৃত করেছে। এটি বৈষম্য এবং নির্যাতনের নতুন রূপ তৈরি করেছে যা অভিবাসী পরিবারের নারীদের ওপর, অর্থাৎ অভিবাসী নারী কিংবা রেখে-যাওয়া স্ত্রীদের ওপর অসম অনুপাতে অভিঘাত ফেলেছে।

অনুচ্ছেদ ২: প্রধান উপসংহারসমূহ

● অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নৈতিক বিশ্বায়নের নিয়ম ও মানদণ্ড কী হবে তা এখনো উদ্ভূত হয়নি। আন্তর্জাতিক মান এবং নিয়মসঙ্গত নির্দেশিকা রাজনৈতিক, পরিবেশগত, আর্থিক বা স্বাস্থ্য দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরি সময়ে অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে অক্ষম।

● নিজ দেশ এবং গন্তব্য দেশগুলি কোভিড-১৯কে দ্বিপাক্ষিকভাবে গ্রহণ করেছে; তবে বহুপাক্ষিক উদ্যোগের ফলে অভিবাসীদের অধিকারের আরো বেশি সুরক্ষা আসতে পারে।

● সংকটের সময় অভিবাসী শ্রমিকদের অভিযোগ নথিভুক্ত করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

● সংকটের সময় রেমিট্যান্স প্রবাহের জটিলতা এখনো পুরোপুরি বোধগম্য হয়নি।

● আদি এবং গন্তব্য উভয় দেশই অভিবাসী শ্রমিকদের মানব নিরাপত্তাকে খাটো করেছে।

● নির্বিচারে ফেরত পাঠানো অভিবাসীসহ সকল প্রকার প্রত্যাবর্তনকারীদের চাহিদাকে আমলে নিয়ে জাতীয় পুনর্গঠন কৌশল প্রণয়ন এখনও অনুপস্থিত।

● সংকটের সময় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায় এবং নারীরা (অভিবাসী কিংবা রেখে যাওয়া স্ত্রী হিসেবে) শারীরিক ও মানসিক চাপ ও নির্যাতন উভয়েরই অভিজ্ঞতা পেয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩: সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের জন্য

● কোভিড-১৯ মহামারীর সময় প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের তথ্য তৈরির চর্চা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে বার্ষিকভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিবাসন বিভাগ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় তথ্যের জোগান চালিয়ে যেতে হবে।

● বাংলাদেশ সরকারকে গন্তব্য দেশ থেকে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানোর প্রতিটি ঘটনার মূল্যায়নের জন্য একটি সাধারণ নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। দেখতে হবে যে শ্রমিকদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছিল কিনা এবং জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তিতদের বেলায় সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করা হিয়েছিল কিনা। এই ধরনের তথ্য দিয়ে সরকার ও নাগরিক সমাজ ক্ষতিপূরণ এবং যথাযথ মজুরি প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচারণা চালাতে পারবে।

● কর্মীদের প্রত্যাবাসনের আগে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের দ্বারা দরকারি অধ্যাবসায় নিয়ে নিবন্ধন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা প্রয়োজন। যদি বকেয়া মজুরি এবং অন্যান্য পাওনা বাকি থাকে, তবে মিশনগুলি অভিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নিতে পারে এবং পরবর্তীকালে তাঁদের দাবির নিষ্পত্তি করতে পারে।

● ২০১৪ সালে লিবিয়া থেকে বাংলাদেশী অভিবাসীদের প্রত্যাবর্তনের পর, সরকার অভিবাসীদের এককালীন নগদ অনুদান প্রদান করে। চলমান সংকটেও ফেরত পাঠানো দুস্থ অভিবাসীদের জন্য নগদ অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি ঘটেনি। সংকটের সময় রেমিট্যান্সের অভাবে তাঁদের বিপন্নতা মোকাবিলার জন্য রেখে-আসা অভিবাসী পরিবারগুলিকেও এককালীন নগদ অনুদান প্রদান করা অপরিহার্য ছিল। এই ধরনের নগদ অনুদান প্রদানের বিধানগুলিকে জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদানে সরকারের ভবিষ্যৎ নির্দেশিকার অংশ করে নেওয়া উচিত।

● সংকটের সময় অভিবাসীদের স্ব-সংহতিমূলক বর্তমান চর্চার পাশাপাশি, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার প্রক্রিয়াও বিকশিত করতে হবে। দুস্থ অভিবাসী পরিবারগুলিকে কার্যকরভাবে সরকারি সহায়তা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে করে তারা তাঁদের ঝুঁকি নিরসন করতে পারে।

● জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের জন্য সরকারের নেওয়া ৭০০ কোটি টাকার পুনর্ভুক্তি কর্মসূচি সফল করতে একে ঋণ ও প্রশিক্ষণদানকারী এনজিও এবং বেসরকারি খাতের ব্যবসায়িক পরামর্শদান পরিষেবাগুলির সাথে উদ্ভাবনী অংশীদারিত্বে জড়িত করা প্রয়োজন। অন্য কথায়, শুধুমাত্র ঋণ পাওয়ার বন্দোবস্ত অভিবাসীদের ঋণ নিতে উৎসাহিত করবে না।

● অভিবাসনকে নিরাপত্তায়ন না করার দিকে গণমাধ্যমকে সংবেদনশীল করা উচিত। অভিবাসনকে বি-নিরাপত্তায়নের স্বার্থে সরকারকে সরকারকে বৈশ্বিক ফোরামেও প্রচারণা চালানো হবে।

● শারীরিক, মানসিক বা যৌনভাবে নির্যাতিত ফেরত-পাঠানো নারী অভিবাসীদের পুনর্ভুক্তির জন্য একটি সুস্পষ্ট, সমন্বিত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি-পরিকল্পনা প্রয়োজন। সরকার এবং নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই কোভিড-১৯ মোকাবিলা পরিকল্পনার মধ্যে নারীদের প্রতি সহিংসতা মোকাবিলার জন্য জরুরি পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। এবং সামাজিক দূরত্বের ব্যবস্থাগুলির মধ্যে কীভাবে সেগুলি সহজলভ্য করা যায় তার উপায়গুলি চিহ্নিত করতে হবে।

● অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এমন সময়ে চালু করা হয়েছে যখন অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে-সঙ্গে আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের নাজুক দশা জনসাধারণের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে অভিবাসী পরিবারের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এই দলিলের সমস্ত বিভাগগুলিকে অবশ্যই অভিবাসী শ্রমিক এবং তাঁদের রেখে-যাওয়া পরিবারের সদস্যদের প্রতি অন্তর্ভুক্তিমূলক করা উচিত।

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ এবং গবেষণা সংস্থাগুলির জন্য

● বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক সংকটের সময় অভিবাসী শ্রমিকদের প্রত্যাবাসন বন্ধ করার পক্ষে গন্তব্য দেশগুলিকে রাজি করাতে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলিকে বহুপক্ষীয় সংস্থাগুলির ওপর চাপ বজায় রাখা উচিত।

● নাগরিক সমাজের সংগঠন এবং তাঁদের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নেটওয়ার্কগুলিকে গন্তব্য দেশগুলির কাছে যথাযথ মজুরি এবং জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের অন্যান্য অধিকারগুলির মেটানোর দাবি অব্যাহত রাখা উচিত। জিএফএমডি, আবুধাবি সংলাপ এবং কলম্বো প্রক্রিয়ার সময়ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংস্থাগুলির এই দাবি তোলা উচিত।

● নাগরিক সমাজকে অভিবাসনের নিরাপত্তায়নের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক এবং জাতীয়ভাবে প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া দরকার। অভিবাসী শ্রমিকদের নিজস্ব সমিতি বিকশিত করার মাধ্যমে বিভিন্ন ফোরামে অভিবাসীদের আওয়াজ নিশ্চিত করা উচিত।

● বর্ধিত রেমিট্যান্স প্রবাহের সাথে বিপুল সংখ্যক পরিবারে রেমিট্যান্স প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে বৈপরীত্য বোঝার জন্য বিশদ গবেষণা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য

● শ্রম গ্রহণ ও প্রেরণকারী সকল দেশের জন্য অবশ্য পালনীয় জরুরী সুরক্ষা নির্দেশিকা বাস্তবায়নে বহুপক্ষীয় সংস্থাগুলির সচেষ্ট হওয়া উচিত। জরুরী নির্দেশিকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক মন্দা, আর্থিক সংকট, স্বাস্থ্য বিপর্যয় ইত্যাদিসহ সব ধরনের সংকট ধারণ করার মতো বিধি থাকা উচিত।

● এসডিজি ৩-এর প্রতি অঙ্গীকার পূরণে গন্তব্য দেশগুলির স্বাস্থ্যনীতিতে পরিষেবা গ্রহণে অভিবাসীদের সমান প্রবেশাধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে সংহত করতে হবে।

● অভিবাসী শ্রমিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক মাননির্ধারণী নির্দেশিকাগুলির অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন এটা বুঝতে যে কেন সংকটের সময়ে এই দলিলগুলি অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হলো ।

লেখক ও গবেষকদের পরিচিতি

সম্বয়কারী প্রধান লেখক

তাসনিম সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার। তিনি বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র ২০২১, বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০০৬-এর খসড়া প্রণয়নে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের খসড়া প্রস্তুতকারী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড জার্নাল অব মাইগ্রেশন স্টাডিজ-এর গ্লোবাল এডিটরিয়াল বোর্ডেরও সদস্য। তিনি জেনেভাভিত্তিক দুর্যোগে স্থানচ্যুতি বিষয়ক প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য।

প্রধান লেখকবৃন্দ

আনাস আনসার বর্তমানে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে বন সেন্টার ফর ডিপেন্ডেন্সি অ্যান্ড স্লেভারি স্টাডিজের গবেষণা সহযোগী, সেখানে তিনি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এ পিএইচডি করছেন। আনাসের দুটি মাস্টার্স ডিগ্রি রয়েছে, একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে এবং আরেকটি ইয়ারসমাস মুন্ডাস ফেলোশিপের অধীনে যৌথ মাস্টার্স ডিগ্রি। তিনি অভিবাসন, শরণার্থী ও উন্নয়ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন এবং বিশ্বব্যাপী অ্যাডভোকেসিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

ফরিদা ইয়াসমিন একজন পেশাদার মানবাধিকারকর্মী এবং বিওএমএসএ-এর পরিচালক (প্রোগ্রাম)। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএসএস এবং আইন থেকে স্নাতক (এলএলবি) ডিগ্রি নিয়েছেন। ২০০০ সাল থেকে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পেশাগত সদস্য। ফরিদার মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার বিষয়ে ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি স্থানীয় সরকার, অভিবাসন, এবং আইনি সহায়তা নিয়ে কাজ করছেন, যার মধ্যে রয়েছে মধ্যস্থতা ।

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সিকদার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের অ্যাডজাংক্ট ফ্যাকাল্টি এবং রামরুর অ্যাডজাংক্ট সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করছেন। তিনি লিডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন এবং তাঁর রচনা নামকরা জার্নালে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ড. শিকদার সিঙ্গাপুরের নানিয়াং টেকনোলোজিকাল ইউনিভার্সিটি থেকে এনটিএস-এশিয়া রিসার্চ ফেলোশিপ পেয়েছিলেন।

মোতাসিম বিল্লাহ রামরুর অ্যাডজাংক্ট সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করছেন। তিনি যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন বিষয়ে এমএসসি করেছেন। তাঁর উৎকর্ষতার মধ্যে রয়েছে ফলাফল-ভিত্তিক বৃহত্তর উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন। এডওয়ার্ড এলগার ও স্প্রিঙ্গার থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচনা। বিল্লাহ ২০১২ সালে যুক্তরাজ্য সরকারের একজন শেভেনিং ফেলো ছিলেন। ২০১৩ সালে তিনি ওয়াশিংটন ডিসির জলবায়ু বাস্তবতা প্রকল্পের জলবায়ু নেতা ছিলেন।

সেলিম রেজা বাংলাদেশের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের সহকারী অধ্যাপক। তিনি অস্ট্রেলিয়ার ফ্লিন্ডার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। তিনি রামরুতে কর্মরত ছিলেন এবং

যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক মাইগ্রেটিং আউট অফ প্রভার্টি রিসার্চ প্রোগ্রাম কনসোর্টিয়াম সমন্বয় করেছিলেন। ড. রেজার কাজের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রম অভিবাসন, রেমিট্যান্স, দারিদ্র্য, শ্রমিক নিয়োগ পদ্ধতি এবং কাজের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। তিনি রাউটলেজ, ইউকে থেকে প্রকাশিত *দ্য কনস্ট্রাকশন প্রিকারিয়েট* বইটির লেখক।

সৈয়দা রোজানা রশিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এবং রামরুর নির্বাহী কমিটির সহকারী সিনিয়র ফেলো এবং কোষাধ্যক্ষ। এর আগে তিনি রামরুর প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। জোরপূর্বক অভিবাসন বিষয়ে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণার্থী অধ্যয়ন কেন্দ্র থেকে যুক্তরাজ্য সরকারের শেভেনিং বৃত্তি নিয়ে এমএসসি সম্পন্ন করেন এবং মাইগ্রেশন স্টাডিজে পিএইচডি সম্পন্ন করেন যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

সহ-লেখকবৃন্দ

আবদুস সবুর ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশনের (ওয়াইপিএসএ) নিরাপদ শ্রম প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। অধিকারভিত্তিক কর্মপন্থা, সুশাসন এবং ন্যায়বিচার ও অভিবাসনের লভ্যতা বিষয়ে বারো বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। সবুর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল ও পরিবেশ অধ্যয়নে বিএসসি (সম্মান) ও এমএস এবং আরেকটি মাস্টার্স করেছেন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজিতে।

আশরাকা সালীম রামরুর সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণ বিষয়ে এমএসএস এবং বিএসএস সম্পন্ন করেছেন। গুণগত সাক্ষাৎকার গ্রহণে তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। ডেটা ম্যানেজমেন্টে তাঁর রয়েছে ১০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা।

ফারিয়া ইফফাত মিম আইন ও সালিশ কেন্দ্রে (আসক) একজন তদন্তকারী হিসেবে কাজ করছেন। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি সম্পন্ন করেছেন। তিনি আসক-এ অভিবাসীদের মামলা পরিচালনা করেন। তিনি ঢাকা জজ কোর্টেরও একজন শিক্ষানবীশও।

হোসাইন মোহাম্মদ ফজলে জাহিদ রামরুতে ফায়ার লেবার মাইগ্রেশন প্রজেক্টে সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার (লিগ্যাল সাপোর্ট) হিসেবে কাজ করছেন। মাইগ্রেশন নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্র্যান্টস (বিসিএসএম)-এর সচিবালয়ও পরিচালনা করেন তিনি। তিনি ক্রিমিনোলজি এবং ক্রিমিনাল জাস্টিসে এলএল.বি, এলএল.এম এবং এমএসএস সম্পন্ন করেছেন। জাহিদ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের পেশাগত সদস্যপদও পেয়েছেন।

জাসিয়া খাতুন ডব্লিউএআরবিই ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের পরিচালক। তিনি তাঁর এমএসএস সম্পন্ন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে এবং মাস্টার্স অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (এমডিএস) করেছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ২০০৮ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিং এবং অ্যাডভোকেসি চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি অভিবাসী শ্রমিক, ফেরত পাঠানো অভিবাসী এবং অভিবাসীদের রেখে-যাওয়া পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন।

মেরিনা সুলতানা রামরুর পরিচালক (প্রোগ্রাম)। তিনি সফলভাবে অভিবাসীদের জন্য স্থানীয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা চালু করেছেন। তিনি বেশ কয়েকটি কমিউনিটিভিত্তিক সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান এবং শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত প্রমাণভিত্তিক পলিসি অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করেছেন। তাঁর দক্ষতার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় স্তরের সিবিও/এনজিও-র সঙ্গে অংশীদারি গড়ে তোলা। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যা (কীটতত্ত্ব) বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন।

মো. পারভেজ আলম রামরুর সিনিয়র তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ কর্মকর্তা। তিনি আরএমএমআরইউ-এর ক্ষেত্র-গবেষণা বাস্তবায়নে বিভিন্ন অনলাইন জরিপ কৌশল প্রয়োগ করেন। তিনি একজন মানবাধিকারকর্মী এবং ফোরাম-এশিয়ার সাথে আরএমএমআরইউ-এর অংশীদারি সমন্বয়ের দায়িত্বটি তাঁর। আলম বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

মোহাম্মদ ইনজামুল হক রামরুর একজন সিনিয়র রিসার্চ কমিউনিকেশন অফিসার। সুইজারল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল স্টাডিজ জার্নালে প্রকাশের জন্য নির্বাচিত শ্রম অধিকার বিষয়ক একটি নিবন্ধের তিনি সহ-লেখক। তিনি ২০২১ সালে প্রকাশিতব্য বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সহিংস চরমপন্থা বিষয়ক বইয়েরও লেখক। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএল.বি এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএল.এম সম্পন্ন করেছেন।

নাজমুল আহসান অর্চিতা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক। উন্নয়ন খাতে তাঁর ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। অভিবাসন ও উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় তিনি দক্ষ। তিনি বাংলাদেশ অভিবাসী অধিকার ফোরামের (বিওএএফ) প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্র নিরাপদ অভিবাসন ও অভিবাসীদের অধিকার, সুশাসন ও খাদ্য নিরাপত্তা। তিনি বরিশালের বিএম কলেজ থেকে সমাজবিজ্ঞানে এমএসএস সম্পন্ন করেন।

নুসরাত মাহমুদ রামরুতে সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। নুসরাত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রি এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণায় সহায়তা করেছেন। তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে মানবাধিকার, মানবিক আইন এবং শরণার্থী ও অভিবাসী আইন।

রাবেয়া নাসরিন রামরুতে সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে বিএসএস এবং এমএসএস সম্পন্ন করেছেন। তিনি *জাস্টিস অ্যাট দ্য ডোরস্টেপস: মিডিয়েশন অন মাইগ্রেশন ফ্রডুলেন্স* বইয়ের সহযোগী গবেষক ছিলেন। ২০১৭ থেকে ২০২০ পর্যন্ত আরএমএমআরইউ-র বার্ষিক অভিবাসন প্রবণতা প্রতিবেদনের সহ-লেখক ছিলেন তিনি।

রণজিৎ চন্দ্র দাস 'বাস্তব' এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এর কর্মসূচী প্রধান। উন্নয়ন খাতে তাঁর রয়েছে ৩০ বছরেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা এবং অভিবাসন খাতে তিনি ১৩ বছর ধরে পেশাগতভাবে জড়িত। তিনি তারগাঙ্গোর নির্বাহী সদস্যও। তিনি এফআইবিএ এশিয়ার নির্বাহী সদস্য। রণজিৎ চন্দ্র সক্রিয়ভাবে অভিবাসী শ্রমিক এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মর্যাদার পক্ষে প্রচারাভিযানে নিয়োজিত।

সায়রা আফরিন বর্তমানে রামরুর গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মরত। তিনি ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। তিনি ২০টি জেলায় দারিদ্র্য ও স্থানীয় উন্নয়নে (আইএমপিডি)

অভিবাসনের প্রভাব সম্পর্কিত আরএমএমআরইউ পরিচালিত সাম্প্রতিক গবেষণা প্রকল্পের মাঠকর্ম পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন।

সরোয়াত বিনতে ইসলাম মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের 'শালীন ও নিরাপদ কাজ' প্রকল্পের কর্মসূচী সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছিলেন। বর্তমানে হেলভেটাস বাংলাদেশের সাথে অভিবাসন বিষয়ে কাজ করছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএল.এম সম্পন্ন করেছেন এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতিতে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। তিনি অনিয়মিত শ্রম অভিবাসন প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

তাহমিদ আকাশ পেশায় একজন আইনজীবী এবং তিনি যশোরে আইন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। তাঁর রয়েছে আইন খাতের নয় বছরের বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩ এবং মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণও পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি রোহিঙ্গা ইস্যুতে কাজ করছেন।

ইয়ার মাহবুব চৌধুরী 'বাসুক'-এর প্রবাসী জনগোষ্ঠী ও উন্নয়ন বিষয়ক উপ-পরিচালক। তাঁর রয়েছে উন্নয়ন খাতে লিঙ্গ সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং অভিবাসন বিষয়ে ১৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা। তিনি কম্পিউটার সায়েন্সে বিএসসি সম্পন্ন করেন।

সংযোজন ১

আরএমএমআরইউ-র কোভিড-১ এর ওপর প্রথম সিম্পোজিয়াম

'বিশ্বায়নের অন্যরূপ '; ২২ জুন, ২০২০

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) সহায়তায় রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) কোভিড-১৯ এবং বিল্ড ব্যাক বেটার সিরিজের অধীনে কোভিড-১৯ ও অভিবাসন বিষয়ে প্রথম ই-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। ই-সিম্পোজিয়ামের শিরোনাম ছিল 'বিশ্বায়নের অন্য চেহারা: বাংলাদেশি অভিবাসীদের জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন ও তাঁদের পাওনা বকেয়া বেতন'। কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাব কীভাবে অভিবাসী শ্রমশক্তির বিশেষ বিপন্নতাকে উন্মোচিত করেছে, আলোচনাটি তার ওপর আলোকপাত করে। রামরু এমজেএফ এর সহায়তায় পরিচালিত এসইইএম প্রকল্পের অধীনে গবেষণা পরিচালনা করে এবং মহামারী বিস্তারের পর ফেরত পাঠানো পঞ্চাশজন অভিবাসীর সাক্ষাৎকার নেয়। গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে নীতিনির্ধারক এবং এ বিষয়ে চর্চারতদের অবহিত করার জন্য এই ই-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়েছিল।

গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন ড. তাসনিম সিদ্দিকী। জনাব ইসরাফিল আলম, এমপি (চেয়ার, পার্লামেন্টারি ককাস অন মাইগ্রেশন), মিসেস শিরিন আক্তার, এমপি, মিসেস অ্যারোমা দত্ত, এমপি, ড. আহমেদ মুনিরুস সালেহীন, সচিব, এমওইডব্লিউওই, জনাব মো. নজরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক, এমওএফএ, মিস শাহীন আনাম (নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন) এবং জনাব উইলিয়াম গয়েস (সমন্বয়কারী, মাইগ্র্যান্ট ফোরাম ইন এশিয়া) ছিলেন বিশিষ্ট প্যানেলিস্ট আলোচক। তাঁরা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নীতি-চাহিদা বিষয়ে আলোকপাত করেন।

সংযোজন ২

বিসিএসএম ও রামরুর কোভিড-১ বিষয়ে পঞ্চম সিম্পোজিয়াম

দেশে রেখে-আসা পরিবারের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব

২৭ জুলাই ২০২০

বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্র্যান্টস (বিসিএসএম), *রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট* (রামরু) এবং *প্রকাশ* যৌথভাবে কোভিড-১৯ এবং বিল্ড ব্যাক বেটার সিরিজের অধীনে কোভিড-১৯ ও অভিবাসন বিষয়ে পঞ্চম ই-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল নীতিনির্ধারক, সিভিল সোসাইটি ও অংশীজনদের কাছে বিসিএসএম-এর গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা। বাংলাদেশের বারোটি জেলার ২০০ টি পরিবারের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে গবেষণাটি চালানো হয়েছিল। এই গবেষণায় যে প্রধান গবেষণামূলক প্রশ্নগুলি করা হয়েছিল তা হলো: কোভিড-১৯ এর পরে অভিবাসী পরিবারগুলিতে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রকৃতি ও পরিমাণ, পরিবারের আয়, ব্যয়, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির ওপর মহামারীর প্রভাব। এটি বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর সময় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার প্রেক্ষাপটে অভিবাসীদের রেখে-আসা পরিবারের নারী সদস্যদের অভিজ্ঞতাও অনুসন্ধান করে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, পূর্ণকালীন সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, এই ই-সিম্পোজিয়ামের সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আলী রেজা মজিদ এবং অভিবাসন বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভাপতি, এমপি, ব্যারিস্টার শামীম এইচ পাটোয়ারী ছিলেন সম্মানিত অতিথি।

"Congratulations to BCSM and RMMRU for accomplishing such a great task in such a short time. I commend this book as a real time research for real time problem."

- Hossain Zillur Rahman

Former Advisor of Care Taker Government of Bangladesh and Chair, PPRC

"As the Chairperson of the Parliamentary Caucus, I treat this book as evidence in advocating for the migrants in parliamentary sessions."

- Barrister Shameem Haider Patwary, MP

Chairperson, Bangladesh Parliamentarians' Caucus on Migration & Development, GoB

"It is a magnificent piece of work; I will definitely feed this rich local knowledge into my global advocacy."

- Colin Rajah,

Civil Society Action Committee Coordinator, ICMC

"The book provides a compelling account of what it means to be a migrant during the COVID-19 under current form of globalisation!"

- Ignacio Packer

Executive Director, ICVA and Former GFMD Civil Society Coordinator

"A remarkable achievement - full of practical recommendations to support positive change. This is a must read for policy makers and practitioners alike."

- Gerry Fox

Team Leader, PROKAS, British Council, Bangladesh

978-984-34-9977-6

Bangladesh Civil Society for Migrants

PROKAS
Promoting Knowledge for Accountable Systems

RMMRU